সেরূপ না হইলে বহুলোকের কষ্টের অবধি থাকিবে না। সমগ্র বাংলা দেশকে আমরা একটি সমাজ মনে করি। আমাদের দেশে বহু ধনী ব্যক্তি থাকাতেও ঐ সমাজের এক অংশ কি অভুক্ত থাকিবে? তাহা ছাড়া বহুকাল অনাবৃষ্টি বশতঃ যে ভয়াবহ জলকষ্ট হইয়াছে তাহা সহরবাসীরা অনুমান করিতে পারিবেন না। এই কষ্টের আশু প্রতীকার না করিতে পারিলে নানা সংক্রামক ব্যাধি চারি পাশে ছড়াইয়া পড়িবে। সেই জন্য আমরা নিশ্চিতরূপে আশা করি, আমাদের চিরদানশীল দেশবাসী অর্থ, বস্ত্র, চাউল সাহায্যের দ্বারা দেশের প্রজা-সম্পদ রক্ষা করিবেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ বস্ত্রাদি পাঠাইলে বাধিত হইব।
(১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ পোঃ, হাওড়া, (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা, (৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ১৮১।এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ

বাংলার প্রসিদ্ধ সাধক সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের বংশধর সর্ব্বানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা সামবেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আগামী বার হইতে সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিবেন।

কথাপ্রসঙ্গে

হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মের ঝগড় দেখে তুমি প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ করেছ—কিন্তু ভায়া, "মন্দিরে তার নাইরে মাধব শাঁক ফুকে তুই করলি গোল"—শাঁক ফুকলে হবে কি, মন্দিরে যে মাধব নেই, কথা শুনবে কে? তবে দাস জাতির একটা স্বভাব—তারা তাদের প্রভুদের কথা চাবুকের ভয়ে শোনে; তাই কিছুদিন পূর্ব্বে কননডয়েল একখানা ইস্তাহার বের করেছেন তা থেকে একটা নজির দেশবাসীর সামনে ধরব, যদিও সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয় তবুও যদি কিছু কাজ তা দিয়ে হয়। তিনি বলছেন,—

"Religion has nothing whatever to do with theological beliefs, or forms, or ceremonies, or priest-hoods, or any of the other trappings and adornments which have covered it, that we can no longer see it. It all depends upon two things only, and these are conduct and character. If you are unselfish and kind, then you are of the elect, call yourself what you will."

মতটা খুব উদার। এর মর্ম্ম হল কর্ম্মকাণ্ড টাও কিছু নয় যথার্থ ধর্ম্ম হল চরিত্র। নিঃস্বার্থপরতা ও দয়া যে চরিত্রে যত বেশী সে তত ধার্ম্মিক। মালা, জপ, তেলক, ঘণ্টা, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ যতই বাহারে বা জাঁদরেল গোছের হোক কিন্তু চরিত্রে যদি ত্যাগ ও দয়া প্রকাশ না পায় ত সেটা বৃথা পয়সা ও সময় নষ্ট। তাই কেউ

কেউ বলছেন যে, কর্ম্মকাণ্ড নিয়েই যত গোল দেখা যাচ্ছে, এখন ওটাকে তুলে দাও। ঢাক বাজান আর মসজিদ যদি ধর্ম্মে না থাকত, তা হলে হিন্দু মুসলমানে লড়াই কথনই বাধত না, কিংবা প্রতিমা পূজো যদি না থাকত, তা হলে কি এই ব্রাহ্ম হিন্দুতে দলাদলি কথনও হতে পারত? এখন ওগুলো একেবারে ছেঁটে সমাজ থেকে বাদ দাও। কননডয়েল অতি সুন্দর কথা বলেছেন, "Must we not use our God-given reason in its interpretation?"—অর্থাৎ ভগবান যখন আমাদের যুক্তি দিয়েছেন তখন শাস্ত্র আমরা নিজের যুক্তি ছাড়া অপরের যুক্তি দিয়ে পোড়ব কেন?

কিন্তু ভায়া, দোষটা ধর্ম্মের নয়, ঢাকেরও নয়, মসজিদেরও নয়, প্রতিমারও নয়। কোনও ধর্ম্মই বলে না জীব-হিংসা করতে—আর বাকিগুলো ত জড়। ঝগড়ার তারা কারণ নয়—উপলক্ষ। কারণ হচ্ছে, অনুদার মন আর তার অসংযত ইন্দ্রিয়। হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানেও যখন ঝগড়া বাধছে তখন বলতে হবে ঝগড়ার কারণ মঠ মসজিদ নয়—অন্য কিছু অর্থাৎ অনুদারতা, আর ঐ চিরন্তন রিপুগুলো। ঐ রিপুগুলোকে সব ধর্ম্মই দমন করবার জন্য বলছে, কিন্তু মানুষ ঐ রিপুগুলোর বশবর্ত্তী হয়ে ধর্ম্ম রক্ষা করতে গিয়ে ঝগড়া করে বসছে। কাম ও কাঞ্চনের জন্য কত ধর্ম্ম-যুদ্ধ হয়ে গ্যাছে—সেখানে উপলক্ষ ধর্ম্ম, কারণ লালসা। দুজনে লালসার পরিতৃপ্তি বা অপমানের শোধ নেবার জন্য লড়াই বাধিয়েছে, তাতে প্রাণ দিয়েছে লক্ষ লক্ষ লোক। হরিদ্বারে দেখেছি বাঁদরের দলে ও কুকুরের দলে লড়াই করে; মানুষে বলে, 'আমাদের পাড়ার লোককে মেরে গেল এর প্রতিশোধ নিতে হবে'—এই যে সব লড়াইয়ের কারণ ধর্ম্ম নয়, অতি আদিমকাল থেকে প্রচলিত আত্মরক্ষা-জাত দল-বোধই কারণ, যা আজকাল জাতীয়তা বলে সভ্য সমাজে পরিচিত। বহুকাল ধরে হিন্দুরা মার খেয়ে আসছিল, আজ তাদের জাতীয়তা বোধ এসেছে, তাতে তারাও আজ Mild Hindu পদবী ত্যাগ করে Aggressive Hindu হয়ে দাঁড়ানয়, স্বজাতি বিজাতি যারা তাদের ঘাড়ে এত কাল চেপে বসেছিলেন তাঁরা এখন

প্রমাদ গণছেন। Sleeping Leviathan জেগে উঠছে। জাগালে—তার জাতীয়তা-বোধ, শুধু ধর্ম্ম নয়। তার ধর্ম্মে কোনও জাতীয়তার বিশেষ স্থান নেই! জগতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যত রকম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে, সব হিন্দুর বৈদিক ধর্ম্মের বিরাট উদরে স্থান পেতে পারে। হিন্দুর ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়—অনাদি অনন্ত সত্যের ওপর। হিন্দু তার ধর্ম্ম প্রমাণ করবার জন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের দোহাই দেয় না, যতটা সে যুক্তি ও প্রত্যক্ষের ওপর জোর দেয়। কৃষ্ণ বা রামকে বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্ম্ম-চিন্তা করতে পারে, কিন্তু খৃষ্ট এবং মহম্মদকে সরিয়ে নিলে খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকে না। তবে হিন্দুর মধ্যে যে ঝগড়া দেখা যায় সেটা ঐ রিপুর জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য, কিন্তু অবুঝের মত একটা ব্যক্তিবিশেষের জন্য যে ঝগড়া এটা সর্ব্ব জাতির মধ্যে সাধারণ। তা বলে সেটাকে আমরা ধর্ম্মের দোষ বলতে পারি না—সেটা হল মানুষের অজ্ঞানতার দোষ। তিনটে ধর্ম্মের সার কথাগুলো যদি আমরা পর পর সাজাই তা হলে বুঝতে পারব, ধর্ম্মে কোনও বিরোধ নেই। যত বিরোধ ঐ ধর্ম্মের সার কথাগুলো বাদ দিয়ে যখন উপায়গুলোকে উদ্দেশ্য বলে ধরে নেই।

প্রথম ধর, বেদান্ত বলছেন সত্য লাভ করতে হলে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হতে হবে,—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (২) ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ (৩) শমাদি ছয়টি সাধন ও (৪) মুমুক্ষুত্ব।

বুদ্ধ বলছেন, চরম শান্তি লাভ করতে হলে আর্য্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ অবলম্বন করতে হবে—(১) সম্যক্ দৃষ্টি (২) সম্যক্ সংকল্প (৩) সম্যক্ বাক্য (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত (৫) সম্যক্ আজীব (৬) সম্যক্ ব্যায়াম (৭) সম্যক্ স্মৃতি (৮) সম্যক্ সমাধি (ইহার অর্থ ২৯শ বর্ষ 'উদ্বোধনে'র ২২৯পৃঃ দেখ)।

য়াহুদী বলছেন,—(১) পুতুল পুজো কর না (২) তাকে নমস্কার কর না (৩) ভগবানের নাম বৃথা নিও না (৪) বাপ মাকে সম্মান কর (৫) দীর্ঘজীবন লাভ করবার চেষ্টা কর (৬) হত্যা করবে না

(৭) ব্যভিচার করবে না (৮) চুরি করবে না (৯) মিথ্যাসাক্ষী দেবে না (১০) অপরের স্ত্রী বা দ্রব্যে লোভ করবে না।

খৃষ্টান ও মুসলমানরাও এগুলো মানেন, অথচ কেন যে য়াহুদীরা তাঁদের কাছে এত ঘৃণ্য তার মীমাংসা তুমি নিজেই কর।

আবার ঐ য়াহুদীদের দশ-শাসনের সঙ্গে বৌদ্ধদের দশ-শাসন তুলনা কর। তাঁরা এই দশটি দুশ্চরিত-কর্ম্ম নিষেধ করছেন,—(১) পাণাতিপাত—প্রাণীহত্যা, (২) আদিন্নাদান—চুরি করা (৩) কামেসু মিচ্ছাচার—মিথ্যাকামাচার (৪) মুসাপাদ—মিথ্যা কথা বলা (৫) পিসুনবাচা—ভেদ বাক্য (৬) ফরুস বাচা—রূঢ় বাক্য (৭) সম্প্-পলাপ—বৃথা বাক্য (৮) অভিজ্ঝা—পরদ্রব্যে লোভ (৯) ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা (১০) মিচ্ছাদিট্‌ঠি—মিথ্যা দৃষ্টি।

আবার এর সঙ্গে পতঞ্জলির—

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ২।৩০ ॥

জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ২।৩১ ॥

এ দুটো সূত্র মিলিয়ে দেখ। (১) অহিংসা, (২) সত্য (৩) চুরি না করা (৪) কাম-বর্জ্জন (৫) বৃথা দান গ্রহণ না করা হচ্ছে "যম"। সকল জাতির, সকল দেশে, সর্ব্ব সময়ে ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালনের চেষ্টা করা উচিত বলে এদের সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলা হয়।

তা ছাড়া জৈন শাস্ত্রে, সাধনের জন্য ১৫৮ প্রকারের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করেছেন। তার মধ্যে পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম-সাধন-প্রণালী বলা হল সে সব তার "মোহনীয় কর্ম্মের" অন্তর্গত "কাষায়" নিরোধের মধ্যে পড়ে যায়। মোটামুটি কাষায় হচ্ছে চার প্রকার (১) ক্রোধ, (২) মান, (৩) মায়া এবং (৪) লোভ। এসব ত্যাগ করতে হবে।

এর পরে জেন্দাবেস্তা, কোরাণ টোরান বই যদি হাতের কাছে থাকত ত দেখিয়ে দিতুম "সব শেয়ালের এক রা।"

এ সব দেখে শুনে এবং ঠাকুরের জীবনে তা মিলিয়ে নিয়ে স্বামিজী বলেছিলেন, দেবত্ব ও পূর্ণত্ব যা অনাদিকাল থেকে আমাদের ভেতর রয়েছে, ঐ দুটোর বিকাশ করার নামই ধর্ম্ম ও শিক্ষা। বাহ্য ও

আন্তর প্রকৃতি জয়ের দ্বারা তা করতে হবে। কর্ম্ম, ভক্তি, চিত্ত-নিরোধ ও জ্ঞান—চারটে রাস্তা। একটা, দুটো, বা সকলগুলো সাধনের জন্য লাগাতে হবে। বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, মন্দির-গির্জ্জে-মস্‌জিদ, বেদ-ত্রিপিটক-বাইবেল-কোরাণ এরা গৌণ সহায় মাত্র।

তাও (Tao)-এর ভাষা আরও সংক্ষেপ। তিনি বলছেন, "A never-ending self-education"—অনন্ত আত্মোৎকর্ষ। এ কথাটা ঠাকুর গ্রাম্য ভাষায় বলতেন, "যথি যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।"

এই যে ধর্ম্মের সাধন রহস্যগুলো বলা গেল এরাই হচ্ছে রাস্তা, এই রাস্তা যাঁরা জানেন তাঁরাই মনোরাজ্যের অধিনায়ক হন। এই রহস্যগুলোই ঘুরে ফিরে নব নব যুগের সৃষ্টি করছে; এরই ওপর রং চং পরন দিয়ে অধ্যাত্ম রাজ্যে নানা সুরে খেলে বেড়াচ্ছে। এই রহস্যবেত্তারা তাই সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান। তাঁদের ধর্ম্মাচরণের দ্বারা অপরের হৃদয়ে আঘাত লাগে না।

কিন্তু সত্য—অনন্ত ভাবময় সে ভাব ভক্তহৃদয়ে অপ্রকাশিত রয়েছে। নানা উপায় অবলম্বনে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়। তাই প্রতিমা, মালা, ক্রুশ, উপাসনা-মন্দির, বেদী দরকার। নইলে কিছুই কিছু নয়। নানককে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কাবার দিকে পা দিয়ে রয়েছ কেন?" তিনি বল্‌লেন, "কোন্ দিকে ভগবান নেই বল, সেই দিকে পা করে শুই।" হাত জোড়ও করতে হয় না, চোখও বুজতে হয় না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই যদি সত্য হয়, তাঁর ইচ্ছাই যদি পূর্ণ হয়, তাঁর ইচ্ছায় যদি ইচ্ছা মিশিয়ে দিয়ে থাক তবে এত কান্নাকাটি, প্রার্থনা কেন? "খাদ নইলে গড়ন হয় না, চাল পুতলে গাছ হয় না", ঠাকুরের সেই মহাবাক্য স্মরণ কর।

আচ্ছা ভায়া, তুমি ত Ten Commandments আওড়ালে, কিন্তু তাতে যে পুতুল পূজো নিষেধ। তাতে পুতুল পূজো নিষেধ আছে বটে, কিন্তু প্রতিমা বা প্রতীকোপাসনার নিষেধ কোথায় পেলে? একটা সিন্ধুকের মত বেদীর ওপর দুধারে দুটো পরী আর মাঝখানে আকাশ এবং Cross টস্ গুলো যদি পুতুল না হয় তবে

প্রতিমাও পুতুল নয়। প্রতিমাগুলো এক একটা মহাভাবের প্রতীক। কতকগুলো আলোছায়া কাগজের ওপর একত্রিত হয়ে তোমার মায়ের ছবি হল; সে রকম আরও কত ছবি রাস্তার ফুটপাতে পড়ে থাকে তুমি মাড়িয়ে চলে যাও, কিন্তু রাস্তায় যদি এমন ছবি পড়ে থাকে যা তোমার মায়ের ভাব মনের মধ্যে তুলে দেয়, সেটাকে তুমি জুতো শুদ্দু পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে পার? চৈতন্য প্রভুর খোল দেখে ভাব হত—এতে কৃষ্ণ নাম হয় বলে। আর কেউ খোল দেখলে বলে, টিকিদাস বাবাজীদের যন্তোর। মনে আছে এক দিন একজোড়া ছোট্ট চটি দেখে তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে—কেন বল দেখি?—সেটা ত চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়!

কিন্তু ভায়া, সেদিন যে দাদামশাই ভয়ানক চটে মটে বল্লেন, ব্রাহ্মর বাড়ি যদি প্রতিমা পূজো হয় তা হলে হিন্দুর বাড়ি কোরবানী হবে না কেন? কথাটা Formal Logic অনুযায়ী ঠিক, কিন্তু প্রতিমা পূজো আর গরু কাটা যদি ব্রাহ্মরাও এক বলে বুকে হাত দিয়ে নিতে পারতেন তা হলে হিন্দুদের ঐ দুষ্ট-ন্যায় দিয়ে ঠকাতে আসতেন না। তবে উত্তর আছে। একটা কচি শিশু যদি কচি হাত দিয়ে তার মার চুল টেনে ধরে ত তার মা উঃ উঃ করবেন কিন্তু মারতে পারবেন না—এ এক রকমের উৎপাত; আর যদি সেই ছেলে বড় হয়ে গলায় ছুরি দিতে আসে তখন তাকে দস্যুর মত শাসন করতে হয়—এও এক রকমের উৎপাত। এই দুটো উৎপাতে যেমন তফাৎ, প্রতিমা পূজো ও গরু কাটাও ঠিক সেই রকম তফাৎ। কতক উৎপাত সহ্য করা যায়। প্রতিমা পূজোর উৎপাত ব্রাহ্মদের যথেষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা আছে। কারণ, তাঁদের বাপ ঠাকুরদাদারা চিরকাল করে গ্যাছেন, পরেও অনেকে করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকেই করবেন। বুড়ো বয়সে ভীমরতি না হলে কোনও হিন্দুসম্প্রদায় গরু কাটা আর প্রতিমা পূজো এক দেখিয়ে লড়তে আসে, না সেকালের নটীরা নেচে পয়সা রোজগার করতো বলে, Modern-বৌঝিরাও তাই করে পয়সা রোজগার কেন করবে না, বলে যুক্তি দেখাতে আসে? আরও বলি

শোন, খৃষ্টান কলওয়ালারা ত তাদের Compoundএর মধ্যে কুলিদের 'রামা হো চীৎকার', 'বট অশথের তলায় শিলা বসিয়ে জল ঢালা' বেশ tolerate করতে পারে, এত বড় ইংরেজের জমিদারিতে ত বেশ পুতুল পূজো অবাধে চলছে, আর তোমরা দুটো ছোঁড়ার উৎপাত সহ্য করতে না পেরে একেবারে কলমের বর্ষা, কাগজের ঢাল নিয়ে কাট্‌মোল্লার মত দাড়ি উড়িয়ে ছুটে এলে ?

অনেক হিন্দুর বাড়িতে অনেক অহিন্দু বাস করে, এবার থেকে কি আইন জারি করা হবে যে, তারা প্রতিমা পূজা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ভগবানের উপাসনা করতে পারবে না ?

অশিক্ষিতেরা ত অসহিষ্ণু ও গোঁড়াই, শিক্ষিতেরাও যে এমন ভয়াবহ প্রতিমা-ভঙ্গকারী মামুদগাজী হতে পারে এটা চিন্তাও করতে পারি না। তুমি বড় হয়েছ তোমার খেলনা ভাল লাগে না, তাই বলে ছেলে পুলের হাতে খেলনা দেখলেই বুড়ো মিনসে তুমি খেপে উঠে বিশৃঙ্খল সমাজে আরও গোলমাল বাধাবে !

সমন্বয়-মূর্ত্তি ভগবান রামকৃষ্ণ এদেশে জন্মেছেন। বেদ, মহিম্নস্তোত্র, গীতা থেকে অনেকবার অনেক সমন্বয়ের শ্লোক লোকের কাছে বার বার ধরা হচ্ছে, কিন্তু তাতে ফল হচ্ছে কি ? শিক্ষিতও যেমন অবুঝ অসহিষ্ণু, অশিক্ষিতও ঠিক তেমনি অবুঝ অসহিষ্ণু। তবে শিক্ষিতদেরই ক্ষমা ঘেন্না করে নেওয়া উচিত। সেইজন্য তাঁদের মাথা যদি ঠাণ্ডা হয় এই মনে করে কতকগুলো বিলীতি বচন উদ্ধার করব; এতে ফল হতে পারে। কারণ, দিশী সেকেলে শাস্ত্রের নাম শুনলে অনেক শিক্ষিতেরই ঝিমুনি আসে বা মাথা ঝন্ ঝন্ করে।

সমন্বয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ ঠাকুরের যেদিন আবির্ভাব হল, স্বামী বিবেকানন্দ বা তাঁর অপর শিষ্যেরা তাঁর বাণী প্রচার করবার পূর্ব্বেই, তাঁর পবিত্র চিন্তা জগৎময় ছড়িয়ে পড়ল। যেখানে সরলতারূপ ক্ষেত্র পেল সেখানেই সেই চিন্তা কার্য্যকরী হয়ে ফুটে উঠল। সত্য কোনও দেশ কাল বা জাতিকে অপেক্ষা করে না, এ কারুর monopoly করবার জিনিষ

নয়। এই সমন্বয়ের বাণী কতদিন পূর্ব্বে এক ম্লেচ্ছ দার্শনিক কি সুন্দর ভাষাতেই না প্রকাশ করেছেন,—

"Take away from each that which is the result of the circumstances under which it was produced, the self-love of the philosopher, his desire to be original, all the particular, accidental, and fortuitous elements due to his nationality and individual character; take away, above all, the numberless misconceptions occasioned by the imperfections of philosophical language,—and you will find, at the bottom of all these theories, one and the same fundamental theme, one and the same philosophy, one and the same system, to the construction of which each philosopher adds his share."

—WEBER.

লোকে অবস্থাচক্রে পড়ে যে কাজ ও চিন্তা করে, আত্মতুষ্টি, মৌলিকতার ভান, ব্যক্তিগত চরিত্র, জাতীয়তা, ভাষার অসম্পূর্ণতা এই সব দুর্ব্বলতাগুলো যদি বাদ দিয়ে ধর্ম্ম বা দর্শন শাস্ত্র পড়া যায় তা হলে দেখতে পাবে সকলেরই মূল উদ্দেশ্য, উপায় ও বিচার একই সত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির দর্শনে সেই চরম সত্য নির্ণয় করবার জন্য কিছু না কিছু সাহায্য করেছেই।

মানুষের সামনে প্রকৃতি অনন্ত রহস্য বিস্তার করে তার চোখে যে ধাঁধা লাগাচ্ছেন, ধর্ম্ম হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাতের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া ওঠে কখন—মানুষ যখন ইন্দ্রিয়ের বাঁধন কেটে মুক্ত হতে চায় অথবা যখন ভয় বা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

আর্থার টমসন বলে আর একজন ম্লেচ্ছ দার্শনিক মনস্তত্বের দিক দিয়ে ধর্ম্মের সমন্বয়টা বড় সুন্দর করে দেখিয়েছেন,—

"It will be understood that the religious activity

will take diverse forms according to temperament. To the practical man at his strain-limit it will be natural to offer sacrifice, or take vows, or raise a stone, or lead a crusade. The man of feeling will naturally pray or sing psalms ; he will pass into meditation or communion ; he will worship the Lord in the beauty of holiness. The predominantly intellectual type, on the other hand will search for truth, for a transcendental answer to the questions that give him no rest. He seeks for a synoptic vision of a cosmology."

মানুষের মনের তিনটে দিক—ইচ্ছা, জ্ঞান আর ক্রিয়া। তার ইচ্ছা থেকেই ভক্তিযোগ, জ্ঞান থেকে জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়া থেকে কর্ম্মযোগ বেরিয়েছে। কেউ যেমন কাউকেও গালাগালি করতে পারে না; ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক ঠিক তেমনি—ঝগড়ার কিছু নেই। ঝগড়ার কারণ অন্য। শিল্প-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেমন ঝগড়া বাধে না, ধর্ম্মেও ঠিক তাই। কারণ হিন্দুর ধর্ম্মকে কোনও শিল্প-বিজ্ঞান অতিক্রম করে যেতে পারে না। শিল্প-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিয়ে যাওয়া, তখন ধর্ম্ম থেকে সেটা তফাৎ কোথায়? গেটের একটা কলি উদ্ধার করে এবার আমাদের বক্তব্য শেষ করব—

"Whoever possesses art and science also has religion,
Whoever has not those two should have religion."

সংঘমিত্রা

তুমি বৌদ্ধ-সংঘ-বন্ধু, 'সংঘমিত্রা' তাই তব নাম ;
হে কুমারী সন্ন্যাসিনী, লহ মুগ্ধ কবির প্রণাম।
ভারতের শেষ প্রান্তে পার হয়ে কন্যা কুমারিকা,
সিংহলের সিন্ধুতটে যেই দিন দিয়েছিলে দেখা,
নারিকেল-বন-ছায়ে, মুকুলিত লবঙ্গ-কাননে,
প্রেমের পতাকা বহি ;—সেই দিন আনন্দিত মনে
ভারত সমুদ্র বুঝি তরঙ্গের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে
গাহিল বন্দনা গীতি। শঙ্খধ্বনি বাতাসে বাতাসে
প্রচারিল তব বার্ত্তা, প্রতিধ্বনি দিকে দিকে তার
গৌতমের বাণীরূপে সিন্ধুপারে লভিল বিস্তার!
সেই দিন স্বর্ণলঙ্কা অকস্মাৎ সিন্ধুগর্ভ হতে
কৌতূহলী হয়ে বুঝি সিংহলের দক্ষিণ সৈকতে
আবির্ভূত হয়েছিল বরিবারে তোমারে কল্যাণি ?
সেদিন প্রভাতালোকে হে ভারত-সম্রাট-নন্দিনি,
দক্ষিণ সমুদ্র দ্বারে দেখেছিলে নূতন মহিমা ;
তোমার নয়নোপরে গৌতমের জ্ঞানের গরিমা
উদ্ভাসিল নবরূপে ; অনাগত কালের কল্যাণ
তোমার মহান্ ব্রতে নবদীপ্তি করি গেল দান।

* *

সম্রাট অশোক—তার মগধের ঐশ্বর্য্যের তলে
তোমারে বন্দিনী করি প্রাসাদের সুবর্ণ শৃঙ্খলে
রাখিল না স্নেহ বশে, আপনার পরিবার মাঝে ;
একি তার নিষ্ঠুরতা ? নহে, নহে,—বৃহতের কাজে

ক্ষুদ্রতারে দিয়ে বলি, বাৎসল্যের মোহ পাসরিয়া
ধর্ম্ম-সংঘ-বুদ্ধ লাগি তব কর্ণে মন্ত্র উচ্চারিয়া
উৎসর্গ করিল তোমা জগতের কল্যাণের তরে !
ঐশ্বর্য্য-বিলাসে কিংবা বিবাহের সম্ভোগ-সায়রে
ডুবিতে দেয়নি তোমা লক্ষ লক্ষ নারীর মতন !
তুমিও তো সংঘমিত্রা, তব দীর্ঘ কুমারী জীবন
পিতার আদর্শ মাঝে নির্ব্বাণের পূর্ণ সাধনায়,
সিংহলের সেবা লাগি কাটাইলে পুণ্য গরিমায় !

*   *

এই তব আত্মত্যাগ সমষ্টির কল্যাণের তরে
রাজার নন্দিনী হয়ে ভিক্ষুণীর মহাব্রত ধরে,
আজন্ম সন্ন্যাসী রূপে সংযমের দৃঢ় আচরণ
নিখিল প্রেমের মাঝে যৌবনের ব্রত উদ্‌যাপন,
তোমারে দিয়েছে মিত্রা, মৃত্যুহীন মহৎ পরাণ
অভিজাত কুমারীর রাজকীয় গৌরব অম্লান !

*   *

সম্রাটের আশীর্ব্বাদ অশোকের প্রবুদ্ধ চেতনা
তোমার যৌবনে দিল, সন্ন্যাসের গভীর প্রেরণা ;
তাই তব কৌমার্য্যের, তাই তব সৌন্দর্য্যের পরে
যে দিব্য লাবণ্য ফুটি উঠেছিল তপস্যার বরে—
তাহার তুলনা কোথা ? ভারতের সম্রাট দুহিতা,
প্রথম বুদ্ধের পদে মগধের অগ্নি নিবেদিতা,
শান্তির দূতিকারূপে তোমার সে ধর্ম্ম অভিযান,
অহিংসায় দিয়ে গেছে শ্রেষ্ঠতর জয়ের সম্মান ।
তরবারি বলে নহে, নহে ক্রুদ্ধ কামান-গর্জ্জনে,
বিভীষিকা রূপে নহে, নহে ধ্বংস প্রলয় ক্রন্দনে ;—
সেবা-প্রেম-মৈত্রী দিয়ে, হৃদয়ের ধর্ম্ম দিয়ে তুমি,
একান্ত আপন করি নিলে দূর বিদেশের ভূমি !

এই নব সেতুবন্ধ, এই তব মহত্তর জয়,
ভারতে সিংহলে দিল বন্ধুতার বন্ধন অক্ষয় !

*　　　*

সুগন্ধ পুষ্পের মত ওই তব কুমারী জীবন,
বুদ্ধের চরণ তলে করি গেলে অর্ঘ্য নিবেদন !
তাই সে স্বার্থক হলো সহস্রের প্রেরণার মাঝে
তাই সে স্বার্থক হলো বৃহত্তর ভারতের কাজে !
সহস্র বৎসর পরে তাই তব জীবন-বারতা,
আমার জীবনে আনে মহত্তর একি ব্যাকুলতা !—
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া যদি পারিতাম একলক্ষ্য পানে,
নিক্ষিপ্ত তীরের মত ছুটে যেতে একের সন্ধানে
বহুর মাঝারে তবে লভিতাম শ্রেষ্ঠ পরিণাম ;
ভবিষ্যৎ কবি তবে পাঠাইত বিমুগ্ধ প্রণাম !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(১৩)

ইংরাজীর অনুবাদ

C/o মিস্ এইচ, মুলার
এয়ারলি লজ, রিজওয়ে গার্ডেনস্
উইম্‌ব্লেডন, ইংলণ্ড
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

* * * জার্ম্মাণীতে প্রফেসর ডয়সনের সঙ্গে আমার দিনগুলি খুব সুন্দর কেটেচে। তার পর দুজনে লণ্ডন আসি; এখন আমরা দুজনেই পরস্পর পরম বন্ধু।

* * * কাজ করবার অনেক কিছুই পড়ে রয়েচে, যথা—তুলসী দাস, কবীর, নানক ও দাক্ষিণাত্যের সাধুবৃন্দের জীবনী, দোঁহা ও গ্রন্থসম্বন্ধে লেখা। কিন্তু তা খুব বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হওয়া চাই; দু চার লাইনে ভাসাভাসা করে সেরে দিলে চলবে না।

পূর্ণ উদ্যমে কাজ করে যাও। সকলে আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৪)

ইংরাজীর অনুবাদ

C/o ই, টি, ষ্টার্ডি, স্কয়ার
৩৯ ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন
২৮শে অক্টোবর, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

* * * কোন্ মাসে ভারতে গিয়ে পৌঁছাব তার এখনও ঠিক নেই। পরে এ সম্বন্ধে লিখচি। গত কল্য কোন বান্ধব সমিতিতে নূতন

স্বামিজী তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বেশ হয়েছিল। আমার খুব ভাল লেগেচে। তাঁর ভেতর ভাল বক্তা হবার শক্তি রয়েচে; এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।

* * * এ পর্য্যন্ত—বইখানা তুমি ছাপালে না। বেশী কাটতির জন্যে বইগুলির দাম ভারতে সস্তা হওয়া দরকার, জনসাধারণের পছন্দমত টাইপগুলিও বড় বড় হওয়া চাই,.......... বইখানার সস্তা সংস্করণ অনায়াসেই বের করতে পার। আগে না ছাপিয়ে একটা মস্ত সুযোগ হারিয়েচ, আমরা—হিন্দুরা এমন কুঁড়ে যে, সুযোগ থাকতে থাকতে কিছুই করব না, যখন করলুম তখন সুযোগ চলে গেচে;—ক্ষতিও হয় তাই। বছরখানেক 'গয়ংগচ্ছ' করে তবে তোমার সেই বইখানা বেরুল। তুমি কি ভেবেছিলে এ দেশের লোকেরা প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করবে? এত দেরী করার ফলে বইখানার বার আনা কাটতি কমে গেল। সেই হ টা একটা গণ্ডমূর্খ, তোমার চাইতেও কুঁড়ে, তার ছাপাও তেমনি কদর্য্য। এমন করে বই ছাপবার কোনই দরকার নেই, দস্তুর মত লোক-ঠকান হচ্চে, যা কখনই করা উচিত নয়। খুব সম্ভবতঃ মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার, মিস্ মুলার, ও মিঃ গুড়ুইনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ভারতে যাব। মিঃ ও মিসেস্ সেভিয়ার সম্ভবতঃ আলমোড়ায় বাস করতে যাচ্চেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যে, আর গুড়ুইন তো হবেন সাধু। অবশ্য সে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরবে। আমাদের বইগুলির জন্যে তার কাছেই আমরা ঋণী। আমার বক্তৃতাগুলি সাংকেতিক প্রণালীতে সে সব লিখে নিয়েচে, তাই থেকেই বই বেরুচ্চে। এই সব বক্তৃতা—যেমন যেমন মনে এসেছিল তেমনি বলে গিয়েছিলুম, ভেবে চিন্তে বা লিখে পড়ে কিছু বলিনি। গুড়ুইনকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। সে একেবারেই মাছ মাংস ছোঁয় না।

ভালবাসা গ্রহণ কর।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

সর্ব্বানন্দ

(১)

প্রথম জন্ম—গোদাবরী

প্রভাত কাল; পূর্ব্ব-গগন ময়ূখমালীর সুবর্ণ কিরণে রঞ্জিত। প্রভাত-সমাগমে বিহঙ্গগণের কলকণ্ঠ বিনিঃসৃত মধুর কাকলীতে দিগ-দিগন্ত মুখরিত, তিমিরময়ী রজনীর ঘন অন্ধকার ক্রমে স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছ-তর হইয়া অনন্তে বিলীন হইতেছে। পুণ্যসলিলা কনকরেখা পূর্ব্ব-স্থলী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া কুলুকুলুনাদে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিতা হইতেছে। মলয়ানিলের মধুর স্পর্শে নিদ্রিতা প্রকৃতিদেবী ধীরে ধীরে জাগরিতা হইতেছেন। এই কনকরেখার মধুর কলকল সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়াই যেন অদূরে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে এক মহাপুরুষ যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। শ্রুতি বিমোহিনী কনকরেখার কলনাদে তাঁহার অণুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি বহুদিনযাবৎ গোদাবরী তীরে এইরূপ ভাবে কঠোর তপশ্চরণে রত আছেন। সহসা একদিন তিনি এক অপূর্ব্ব দৈববাণী শ্রবণ করিলেন,—

বৎস! আমি তোমার তপস্যায় সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। তুমি স্থির হও। শান্তভাবে আমার উপদেশ শ্রবণ কর; তোমার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তুমি কামাখ্যা-ধামে গমন কর, তথায় গভীর নিশিতে মহাপীঠের নিকটবর্ত্তী স্থানে আমার ধ্যানে উপবিষ্ট হইও তখন সেই স্থানে অবশিষ্ট বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। দৈববাণী শ্রবণে ঐ মহাপুরুষ অতীব বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন। অবশেষে কিছুই দেখিতে না পাইয়া, তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। তৎপর সুরধুনীর পূত সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক কামাখ্যাধামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই মহাপুরুষ রাঢ় দেশস্থ নদীয়া জেলাতে পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত

সিংহলদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। ইনি ভোগবিরত ধর্ম্মাত্মা দেবদ্বিজ ভক্ত ও পরম দয়ালু সাধুপুরুষ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ৺কাঞ্চনাচার্য্য ভট্টাচার্য্য।

পূর্ণানন্দের মেহারত্যাগ

গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড তাপে তপ্ত বসন্ত-বিরহ-বিধুর পবনদেব কান্তা-বিরহ-কাতর প্রণয়ীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়াই যেন ভীমবেগে উন্নত বৃক্ষশির অবনত করিয়া স্বকায় মর্ম্মবেদনার কিয়দংশ পরিস্ফুট করিতেছেন। মেহার গ্রামের একপ্রান্তে, একটি ক্ষুদ্র কুটির রমণীয় মণিমুক্তা হীরক খচিত বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত ছিল। অতি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন চতুর্দ্দিকে কানন সমূহ নানাপ্রকার ফল ফুলে শোভিত। দেখিলেই উহা যেন একটি আশ্রম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাতাস পূর্ণ বিকশিত কুসুমরাজির সুষমা গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে।

ঐ কুটিরে পূর্ণচন্দ্র দাস নামে এক বৃদ্ধ এবং তাহার পুত্র বাস করিত। সে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বৎস। আমি এখন তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইব। আর কতকাল এ স্থানে বাস করিব?" পুত্র বলিল, "তা বেশ, আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন আপনি তীর্থপর্য্যটন করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল পূততীর্থ সলিলে পুণ্য সঞ্চয় করুন।

"বাবা। আমার একটি নিবেদন আছে. আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ, অপ্রাপ্তবুদ্ধি তরুণ বয়স্ক সংসারানভিজ্ঞ আপনার অধম সন্তান। এই কুটিলতাময় সংসারের ঘূর্ণিপাকে কি প্রকারে কালযাপন করিব। সেই বিষয়ে আপনার নিকট সদুপদেশ শুনিতে প্রার্থনা করিতেছি।"

পিতা বলিলেন, "বৎস! মানবজীবনে সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত আছে। সংসারের শত সহস্র বিঘ্ন চরণে দলিত করিয়া, সহস্র বিপদে বিক্ষুব্ধ না হইয়া, বিঘ্ন বিপত্তির তীব্র ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে অটল অচল ভক্তি রাখিয়া তাঁহার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাও, তাহা হইলেই তুমি জীবনে উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে। সদা সত্যকথা বলিবে। সত্যের অবমাননা করিও না। সংসারের সকলি ক্ষণভঙ্গুর, অতুল ধনসম্পদ

অসীম ক্ষমতা প্রভৃতি সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কেবলমাত্র কীর্ত্তিই অবিনশ্বর। দরিদ্রের তপ্ত অশ্রু সর্ব্বদা মোচন করিতে চেষ্টা করিও, পরদুঃখ বিমোচন করিতে সর্ব্বদা নিরত থাকিও। আর সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করতঃ সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল সময়ই তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিও।"

"বাবা, আপনি কোন্ তীর্থে গমন করিবেন ?"

পিতা বলিলেন, "আমি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কামাখ্যা-ধামে যাত্রা করিব।"— এই বলিয়া পূর্ণানন্দ তীর্থ পর্য্যটনোদ্দেশ্যে সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

কামাখ্যা-ধাম

পুণ্যসলিল বিশালবক্ষ ব্রহ্মপুত্রনদ, গম্ভীর নিনাদে দ্রুতবেগে সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত হইতেছেন। তত্তীরে বিশাল শৈলশ্রেণী সলিল মুকুরে প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেছে। ঐ শৈলমালার শীর্ষদেশে ৺কামাখ্যা মায়ের মন্দির। শতসহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মায়ের ভক্তগণ এখানে আসিয়া, ভক্তিযুক্তহৃদয়ে কামাখ্যাদেবীর চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন।

বাসুদেব ঠাকুর বহু পার্ব্বত্যস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ ৺কামাখ্যা-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং দেবীর চরণে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

পূর্ণচন্দ্র দাসও বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া কামাখ্যা-ধামে আসিয়া মায়ের শ্রীশ্রীচরণারবিন্দ দর্শনপূর্ব্বক বাসুদেব ঠাকুরমহাশয়ের নিকটে দাসত্বপদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সঞ্চারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। বাসুদেব ঠাকুর মহাশয়, পূর্ণচন্দ্র দাসকে "পুণা দাদা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, উভয়ে সর্ব্বদাই একত্রে আহার বিহারাদি করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা তথায় বাসুদেব ঠাকুর মহাশয় অর্দ্ধরাত্রিতে সুপ্ত অবস্থায়

দেখিতে পাইলেন, গগনতল হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিতেছে। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে এক বিদ্যুল্লতানিভালাবণ্যোজ্জ্বলা, অপূর্ব্ব কিরণমণ্ডিতা একটি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি ক্রমে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বৎস! আমি তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি তোমার পুত্র শম্ভুনাথের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীদেবী দশমহাবিদ্যা মাতাকে সিদ্ধিলাভ করিবে।

তোমার সিদ্ধির স্থান মেহারাখ্য মাতঙ্গাশ্রমে জীনবৃক্ষতলে জানিবে। তথায় একরাত্রির সাধনায় আমাকে এই ঘোর কলিযুগে প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া ঐ মাতৃমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইলেন।

নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, বাসুদেব ঠাকুর একমাত্র সহায় বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণচন্দ্র দাসকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন; এবং তাহাকে বঙ্গদেশস্থ ত্রিপুরাজিলান্তর্গত মেহার গ্রামে গমনের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া কিছু দিন পরে তিনি যোগবলে নশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পূর্ণচন্দ্র দাসও তৎপরে ধীরে ধীরে স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

মেহারে—পূর্ণ

সুধাধবল প্রাসাদের এক সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষে রাজসভা। হর্ম্ম্যতল বহুমূল্য পারস্যদেশীয় কার্পেট বিমণ্ডিত। হর্ম্ম্যপ্রাচীরে লীলাময়ীর প্রকৃতির নানা লীলার আলেখ্য বিমণ্ডিত। স্বর্ণরৌপ্য খচিত কুসুমবল্লরী প্রাচীর গাত্রে সংবদ্ধ। মধ্যে মধ্যে সুবৃহৎ মুকুট সংস্থাপিত। সামন্ত ও মন্ত্রীবর্গের বসিবার জন্য স্বর্ণাসন স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। হর্ম্ম্যের এক প্রান্তে রজতনির্ম্মিত, উচ্চবেদীর উপর মণিমাণিক্য হীরক-মণ্ডিত রত্ন-সিংহাসনে জটাধর-বংশোদ্ভব দাস রাজা সমাসীন। রাজানুষ্ঠ সামন্তবর্গ, সেনাপতি বীরবাহু এবং মন্ত্রী বিচিত্রবুদ্ধি প্রভৃতি নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। নৃপতি রাজ-কার্য্য সম্পাদনে নিরত। দ্বারদেশে ভীমকায় প্রহরী সুরেন্দ্রনাথ উন্মুক্ত অসিহস্তে দণ্ডায়মান। এমন সময় পথশ্রমে ক্লান্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া সভার দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

তিনি আসিয়াই প্রহরীকে বলিলেন,—“আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদুর রাঢ় দেশ হইতে পদব্রজে এখানে আসিয়াছি। আমি রাজদর্শন-প্রার্থী ব্রাহ্মণ শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য।” ইনি বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

প্রহরী বলিল। আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আমি মহারাজকে আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইয়া আসি।—এই বলিয়া প্রহরী মহারাজের নিকট যাইয়া অভিবাদন করিল।

মহারাজ! একজন পথশ্রমে ক্লান্ত ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন।

মহারাজ বলিলেন, “তাঁহাকে আমার সমক্ষে সত্বর লইয়া আইস,” প্রহরী, “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রস্থান করিল এবং ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মণ হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিজ্ঞাপন করিলেন।

মহারাজ! আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদুর রাঢ় দেশস্থ পূর্ব্বস্থলী সিংহলদী গ্রাম হইতে আপনার রাজ্যে বাস করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার রাজধানীতে বাসোপযুক্ত স্থান প্রদানের জন্য অনুমতি করুন।

রাজা। দেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি অপনাকে এই মেহার গ্রামে মাতঙ্গাশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থান অর্পণ করিতেছি। তথায় আপনার বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিব। আপনি ইচ্ছানুযায়ী যথা শান্তিতে এ অধম দাসের রাজ্যে বাস করুন। আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখা যাইতেছে। আপনি দয়াপূর্ব্বক আমার প্রাসাদে স্নান ও আহার করুন।

শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য রাজভবনে আহারাদির কার্য্য শেষ করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার গৃহ নির্ম্মিত হইল। তৎপর দাসরাজা, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যকে নব আলয়ে স্থাপিত করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ রাজপ্রাসাদ হইতে নৃপ-গুরুগৃহে আহারীয় দ্রব্য সকল প্রেরিত হইত। পূর্ণচন্দ্র দাস শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের

গৃহে সেবক পদে নিযুক্ত হইয়া যথারীতি সেবাকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। প্রথম পুত্র আগমাচার্য্য ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয়পুত্র সর্ব্বানন্দ ঠাকুর। সর্ব্বদাই পূর্ণচন্দ্র দাস সর্ব্বানন্দ ঠাকুরকে লইয়া বনমধ্যে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রীড়া করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন। উভয় ভ্রাতাই ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আগমাচার্য্য ভট্টাচার্য্য যথারীতি বিদ্যাভ্যাস করিতেন, কিন্তু সর্ব্বানন্দ ঠাকুর তাহা করিতেন না, তিনি ক্রীড়া প্রভৃতিতে মত্ত হইয়াই যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত করিলেন। এদিকে আগমাচার্য্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় দর্শনশাস্ত্রে প্রভূত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিলেন। তৎপর উভয় ভ্রাতার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে যথাসময়ে উদ্বাহ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, কিছু দিন পর সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার নাম রাখা হইল "শিবনাথ"।

সর্ব্বানন্দ-তিরস্কৃত

বর্ষা শেষ হইয়াছে, আকাশে শুভ্র শারদ মেঘ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। দয়া-নীরব-পল্লীর কোন এক প্রান্তে একটি সুদৃশ্য বাটি, তাহার এক প্রকোষ্ঠে দুইটি যুবতী মহিলা, যুবা পুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, বয়োজ্যেষ্ঠা (আগমাচার্য্য পত্নী) বলিলেন, "আজ আপনার ভ্রাতা বাড়ী নাই, অতএব অদ্য রাজ পরিষদে আপনাকেই যাইতে হইবে।"

সর্ব্বানন্দ। আমি যাইতে পারিব না।

মহিলা। এখন যদি আপনি রাজবাড়ী না যান তবে অদ্য আমাদের অনাহারে থাকিতে হইবে।

সর্ব্বানন্দ অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তা হইলে আমিই যাইব।" তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনই যাইব কি?"

মহিলা। অবিলম্বে গমন করুন, বিলম্বে কাজ নাই।

তৎপর সর্ব্বানন্দ ঠাকুর রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন করিলেন, তিনি

নিরক্ষর ছিলেন। পিতার কনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া অতিশয় আদরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পিতামাতাও তাঁহার লেখাপড়ার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেন নাই।

প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি দাসরাজ মণিমণ্ডিত কনকসিংহাসনে উপবিষ্ট। বন্দিগণ তাঁহাকে মধুর ছন্দে বন্দনা করিতেছে। কল্যাণ-মাধুর্য্যময়ী কবিতাবলী রাজাকে শ্রবণ করাইতেছেন। বিদ্বন্মণ্ডলী সভায় সমাসীন, এমন সময় সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ভ্রাতৃজায়ার অনুরোধে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে আশির্ব্বাদ করিলেন।

রাজা গুরুপুত্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক উপবেশনের জন্য সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন।

রাজপরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের মূর্খতার বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন। তাঁহারা ইহা রাজাকে অবগত করাইবার জন্য, সর্ব্বানন্দ ঠাকুরকে তিথি ও পক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বানন্দ ঠাকুর তাহা জানিতেন না। তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন, "আজ শুক্লপক্ষ পৌর্ণমাসী তিথি," বস্তুতঃ সেইদিন কৃষ্ণ পক্ষ অমাবস্যা তিথি, তাঁহার প্রত্যুত্তরে সকলেই উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন; এই উপহাসে যেন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। মহারাজ গুরুপুত্রের মূর্খতা দর্শনে অবনত মস্তকে নিঃশব্দে রহিলেন। অনন্তর ঠাকুর নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া রাজপরিষদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, "অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, স্বীয় শিক্ষার প্রভাবে অজ্ঞান তিমির বিদূরিত করিয়া জ্ঞানের প্রখর জ্যোতিঃতে বিশ্বজনকে বিমুগ্ধ করিব।"

তালবনে-শিবালয়

অরণ্যমাঝে নিবিড় তালবনে সুউচ্চ তাল বৃক্ষ সমূহ অভ্র ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, নানা প্রকার বনবল্লরী সুবৃহৎ বৃক্ষরাজি বেষ্টন করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছে, বন্য বিহঙ্গমগণ যথেচ্ছানুসারে কুজন করিতেছে। এই বনে এক যুবক একটি তাল বৃক্ষে আরোহণ করিতেছে। ঐ

যুবকের দৃঢ় ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যেন, তিনি কোনও কার্য্যে দৃঢ় সংকল্প হইয়া বৃক্ষাগ্রভাগে উঠিতেছেন। তিনি শম্ভুসুত সর্ব্ববিদ্যাবংশের আদিপুরুষ মহাত্মা ৺সর্ব্বানন্দদেব। তিনি রাজপ্রাসাদে অপমান বোধ করায় বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া তালপত্র সংগ্রহের জন্য তালবৃক্ষে আরোহণ করিতেছেন। অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ভীষণ বিষধর জাতিসর্প তাঁহাকে দংশন করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। তখন তিনি বিচলিত না হইয়া স্বীয় অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে ঐ ভুজঙ্গের ফণা মুষ্টিবদ্ধ করিলেন, এবং তাল বৃক্ষের তীক্ষ্ণ শাখা দ্বারা উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অধোভাগে নিক্ষেপ করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে মহাদেব সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভূত হইয়া যুবককে বলিলেন, "বৎস! বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর, তোমার বিদ্যাশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই।"

যুবক প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "তালপত্র বিনা আমি গাছ হইতে নামিব না।" সন্ন্যাসী তালবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মান, যুবক তালপত্র আহরণ করিয়া নীচে নামিলে পর, ঐ মহাপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার অলৌকিক সাহস দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি এই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া আইস"। অবগাহনের পর সেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অভিলষিত অভীষ্ট মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক দীক্ষিত করিয়া বলিলেন, "বাবা! সর্ব্বানন্দ, তোমার দ্বারা এ জগতের অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে। তুমি অতি সৌভাগ্যবান। এই জীনতরুতলস্থ মাতঙ্গাশ্রমে মাতঙ্গেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তথায় অদ্য নিশার্দ্ধ সময়ে আমার প্রদত্ত মন্ত্রের সাধনা করিয়া, তুমি ভবতারিণী পতিত পাবনী মা জগদম্বার দশমহাবিদ্যারূপ প্রত্যক্ষ মূর্ত্তির দর্শন পাইবে।"—এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

(ক্রমশঃ) সামবেদাচার্য্য শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী

রাজযোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথম পাঠ

স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের অনুশীলন দরকার। সকলেই কিন্তু এক কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হবে। অনুপ্রেরণা ও চিন্তার মূলে কল্পনা।

প্রকৃতির ব্যাখ্যা আমাদের ভেতরেই রয়েছে ; পাথরের পতন বাইরে হোল কিন্তু 'মাধ্যাকর্ষণ' আবিষ্কারের শক্তি আমাদের ভেতরেই ছিল, বাইরে নয়।

অত্যাহারী বা অনাহারী, নিদ্রালু বা নিদ্রাহীন যোগী হতে পারে না।

অজ্ঞান. বিকল্প (চলচিত্ততা), পরশ্রীকাতরতা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি এই কয়টি যোগাভ্যাসের পরম অন্তরায়।

যোগীর পক্ষে এই তিনটি বিশেষ প্রয়োজনীয়,—

প্রথম। দেহ ও মনের পবিত্রতা। সব রকমের মলিনতা যা মনকে নীচে নামিয়ে দেয় যোগী তা পরিত্যাগ করবে।

দ্বিতীয়। ধৈর্য্য। প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য্য দর্শনাদি হবে তারপর সে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটিই হচ্ছে সব চাইতে বিপদের সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই ; ধৈর্য্য থাকলে শেষে সত্যলাভ হবেই।

তৃতীয়। অধ্যবসায়। বিপদ, আপদ, অসুখবিসুখ—সব সময়ে অধ্যবসায়শীল হও ; একটি দিনও সাধন ভজন বাদ দিও না।

সাধন ভজনের সব চেয়ে প্রশস্ত সময় হচ্ছে দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ। সে সময় দেহ ও মন খুব প্রশান্ত থাকে চঞ্চলতা ও অবসাদ কিছুরই তখন প্রাবল্য থাকে না। যদি সে সময় না পার তা হলে ঘুমোতে যাবার আগে ও ঘুমিয়ে ওঠার পর অভ্যাস করবে। দেহ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে অর্থাৎ স্নান করবে।

স্নানের পর বেশ দৃঢ়ভাবে আসনে বসবে অর্থাৎ মনে করবে যেন আমি পাহাড়ের মত অটল, কোন কিছুই আমাকে নড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ডের ওপর জোর না দিয়ে কোমর, ঘাড় ও মাথা ঋজুভাবে রাখবে। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়েই সব প্রক্রিয়া হয়, কাজেই এর ক্ষতি-কারক কোন কিছু যেন না ঘটে।

পায়ের আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে সমস্ত দেহকে স্থির করবে। এই স্থির ভাবটি মনে মনে চিন্তা করা চাই তাতে যদি প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করা দরকার মনে হয় ত তা করবে।

মাথায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে নীচের দিক থেকে শরীরের প্রতি অঙ্গ স্থির করে আনবে যেন কোন অঙ্গও বাদ না যায়। তারপর সমস্ত দেহটিকে স্থির করে রাখবে। সত্য লাভ করবার জন্যে এই দেহ ভগবান তোমায় দিয়েছেন; একে আশ্রয় করেই সংসার সমুদ্রের পরপারে সত্যের রাজ্যে তোমায় যেতে হবে। এইটি করা হয়ে গেলে দুই নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস নেবে তারপর দুই নাক দিয়েই তা ফেলে দেবে। তারপর যতক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে পার নিশ্বাস না নিয়ে থাকবে। এই রকম চারবার করা হয়ে গেলে স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেবে এবং ভগবানের কাছে জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা করবে।

"যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহিমা আমি ধ্যান করি, তিনি আমাদের মনকে প্রবুদ্ধ করুন"—এই মন্ত্রটি দশ পনর বার জপ ও তার অর্থ চিন্তা করবে।

যে সব উপলব্ধি বা দর্শনাদি হবে তা গুরু ছাড়া আর কাকেও বলবে না।

যতটা সম্ভব কম কথা বলবে।

সৎ চিন্তা করবে, আমরা যা চিন্তা করি, তাই হয়ে যাই। সৎ চিন্তা মনের সকল মলিনতা পুড়িয়ে ফেলে।

যোগী ছাড়া আর সকলেই দাস বিশেষ। মুক্তিলাভের জন্য বন্ধনের পর বন্ধন কেটে ফেলতে হবে।

অন্তর্নিহিত সত্তাকে সকলেই জানতে পারে। যদি ভগবান থাকেন

তবে তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে হবে, যদি আত্মা থাকেন তবে তাঁকে দর্শন ও অনুভব করতে হবে।

আত্মবস্তু থাকলে তাঁকে জানবার একমাত্র উপায় দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করা। যোগীরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করেন—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় অথবা জ্ঞান ও কর্ম্ম।

অন্তরিন্দ্রিয় বা মনের স্তর চারটি—

প্রথম। মনঃ বা চিন্তা শক্তি। একে সংযত না করায় এর সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; সংযত করলে তাই আবার অদ্ভুৎশক্তির আধার হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়। বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি (তাকে বোধশক্তিও বলা যায়)।

তৃতীয়। অহঙ্কার বা 'অহং' বুদ্ধি।

চতুর্থ। চিত্ত, এইটিই হল সকল বৃত্তির আধার। এ যেন মনঃ সমুদ্র আর বৃত্তিগুলি যেন এরই তরঙ্গ।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। সমুদ্রে চাঁদের প্রতিবিম্ব যেমন তরঙ্গের জন্যে অস্পষ্ট বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আত্মার প্রতিবিম্বও তেমনি মনস্তরঙ্গের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যখন আয়নার মত হয়, তখনই তাতে চাঁদের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই, তেমনি চিত্ত যখন সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ শান্ত হয় তখনই আত্মদর্শন ঘটে।

চিত্ত যদিও সূক্ষ্মতর জড়বিশেষ তবুও এ দেহ নয় আর দেহ দ্বারা চিরকাল আবদ্ধও হয় না। আমরা যে মাঝে মাঝে দেহজ্ঞান হারিয়ে ফেলি তাই এর প্রমাণ। ইন্দ্রিয় সমূহ বশে এনে আমরা ইচ্ছামত এই অবস্থালাভের জন্যে অভ্যাস করতে পারি।

এই অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হলে সমস্ত-জগৎ আমাদের অধীনে। কারণ ইন্দ্রিয়ের ভেতর দিয়ে যে সব বিষয় আমাদের কাছে পৌঁছায় তাই নিয়েই জগৎ। স্বাধীনতাই উচ্চ জীবনের চিহ্ন। ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ হবে।

যে ইন্দ্রিয়ের অধীন সেই সংসারী—সেই দাস।

চিত্ত বস্তুর বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করতে পারলেই আমাদের দেহের নাশ হয়। এই দেহটাকে তৈরী করতে কোটি কোটি বৎসর ধরে আমাদের এতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে যে সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা এই দেহ প্রাপ্তির আসল উদ্দেশ্য যে পূর্ণতা লাভ করা তা ভুলে গেছি। আমরা ভাবি এই দেহটাকে তৈরী করাই বুঝি আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য, এরই নাম মায়া। এই মায়া আমাদের ভাঙ্গতে হবে, মূল লক্ষ্যের দিকে ফেরাতে হবে। আর উপলব্ধি করতে হবে আমরা দেহ নই. দেহই আমাদের ভৃত্য। মনকে দেহ থেকে আলাদা করে দেখতে শেখ—ভাব এটা দেহ নয়। এই জড় দেহটাকে আমরা চৈতন্য ও জীবন প্রতিবিম্বিত করে ভাবি এটা চেতন ও সত্য। আমরা এতকাল ধরে এই খোলসটা পরে আসছি যে, এখন ভুলে গেছি, আমরা এই খোলস নই। দেহ একটা যন্ত্রমাত্র, আমাদের দাস—প্রভু নয়; এবং ইচ্ছামত সেটাকে ফেলে দিতে পারা যায়। যোগ এরই উপায় শিক্ষা দেয়। মনঃশক্তি সমূহকে আয়ত্ত করাই যোগাভ্যাসের মুখ্য ও আসল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—যে কোন বিষয়ে সমগ্রভাবে তাদের নিয়োগ করা।

যদি বাজে বক তা হলে যোগী হতে পারবে না।

বাঁশী

ব্রজমাঝে বাজছে বাঁশী দিবানিশি এক বাজনায়
বাঁশীতে কী ফুঁক দিলে সে গোল বাধিল সুর খেলায়।
বাঁশী করে মন উদাসী, এনু তাই প্রেম-যমুনায়
পেয়ে সাড়া দিশেহারা হারিয়ে গেনু ভাব-মেলায়।
লুকিয়ে বসে কোন্‌খানে সে, মধুর তানে প্রাণ মাতায়
প্রাণের মাঝে ঢেউ দিয়ে সে হাওয়ার সনে মিশে রয়।

শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর

আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। আমরা মনে করি সন্ন্যাসীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া আমরা আলস্যের প্রশ্রয় দিতেছি। স্বামিজী বলিয়াছেন, "যথার্থ সন্ন্যাসী—গৃহীদের উপদেষ্টা। * * সন্ন্যাসীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেয়। এই আদান, প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক এতদিনে আমেরিকার Indianদের মত উজাড় হয়ে যেত। * * * * অন্যদেশে যাই হোক্ না কেন, এ দেশে কিন্তু সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসার-সাগরে গৃহস্থদের নৌকা ডুবছে না।" সন্ন্যাসের আদর্শ—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥"

স্বামিজী কোন নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া যান নাই বা কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার করিয়া যান নাই। সম্প্রদায়হীনতাই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। "He spoke of no personal teacher, he gave the message of no limited Sect." "অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় গঠিত করে যেতে আমার জন্ম হয় নাই।" "তিনি কারও ভাব কদাচ নষ্ট করেন নাই; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব।" "এই মঠকে মহা সমন্বয়ক্ষেত্র করে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্ব্বভাবের সাক্ষাৎ সমন্বয় মূর্ত্তি। ঐ সমন্বয়ের ভাবটি এখানে জাগিয়ে রাখ্‌লে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্ব্বমত সর্ব্বপথ, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে যাতে এখানে এসে আপন

আপন ideal দেখ্‌তে পায় তা করতে হবে।" "তুই ত আমার বক্তৃতা পড়েছিস্‌। কই, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি।"

স্বামিজী চা বিস্কুট ইত্যাদি খাইতেন বলিয়া কথনও কথনও আমাদের মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয়। তখন যেন আমরা স্বামিজীর নিজের কথাই স্মরণ করি:—

"হউক কুৎসিত, কিংবা সুরন্ধিত
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জ্ঞানে আপনারে,
কোন্‌ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে?"

সিষ্টার নিবেদিতা লিখিয়াছেন ঠাকুর সেই কারণে তাঁহাকে "roaring fire" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামিজী জীবসেবাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন। "জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম্ম নাই। সেবাধর্ম্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ কর-ফলায়তে'।"

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

(স্বামী বিবেকানন্দ)

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে'
বাঁধা সবার কাছে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

বীর্য্যই তাঁহার ধর্ম্মের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি কোথায়ও পাপকে ঘৃণা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন নাই। বলিয়াছেন,—

"Do not talk of the wickedness of the world and all its sins. Weep that you are bound to see wickedness in it. Weep that you are bound to see sin every-

where, and if you want to help the world, do not condemn it. Do not weaken it all the more. For what is sin and what is misery and what are all these but the results of weakness? The world has been made weaker and weaker every day by such teachings. Men are taught from childhood that they are weak and are sinners. Teach them that they are all glorious children of immortality, even those who are weakest in manifestation."

ইহা অপেক্ষা আশ্বাসের বাণী আর কি হইতে পারে? সমস্ত অশিবের পরিবর্তে স্বামিজী প্রেম এবং সহানুভূতি বিলাইয়া গিয়াছেন। "Nobody in the history of the world loved better than Buddha." সেইজন্য স্বামিজী বলিতেন,—

"We want Sankara's head and Buddha's heart for the regeneration of our country."

এই কারণে স্বামিজীকে জ্ঞান ও প্রেমযোগীর মহামিলনক্ষেত্র বলিয়াছি। তিনি যুগাবতার, নিত্য সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে সামান্য মানুষ, অথবা স্বদেশপ্রেমিক বা সমাজসংস্কারক বলিয়া ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি না। তাঁহার নিজের কথাতেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি পাপী, তাপী, দীন, দুঃখী, পতিতদের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে কে আর দেখবে?" "অমরনাথ (কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ তীর্থ) দর্শনের পর হইতে আমার মাথায় চব্বিশ ঘণ্টা যেন শিব বসিয়া আছেন; কিছুতেই নাম্‌ছেন না।" "শঙ্কর এই অদ্বৈতবাদকে জঙ্গলে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারের ও সমাজের সর্ব্বত্র রেখে যাব বলে এসেছি।"

পাশ্চাত্যদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামিজীর অটুট স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। অবশেষে চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন।

সিষ্টার নিবেদিতা স্বামিজীর তিরোধানের যে বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য :—

"His heroic soul passed away at the early age of forty on July 4, 1902, a memorable day in our national calendar and also a memorable day on the history of America, the other field of his work—a day of special significance to the American people, being by a curious coincidence, the date of anniversary of the Declaration of their National Independence.

"He had spent hours of that day in formal meditation. Then he had given a long Sanskrit lesson. Finally he had taken a walk from the monastery gates to the distant highroads.

"On his return from this walk, the bell was ringing for even-song and he went to his own room and sat down, facing towards the Ganges, to meditate. It was the last time. The moment was come that had been foretold by his Master from the beginning. Half-an-hour went by and then, on the wings of that meditation his spirit soared whence there could be no return, and the body was left, like a folded vesture, on the earth."

আজ ছাব্বিশ বৎসর হইল স্বামিজীর তিরোধান ঘটিয়াছে কিন্তু তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা কি আমরা এই দীর্ঘকালের মধ্যেও দিতে পারিয়াছি? তিনি চাহিয়াছিলেন মাত্র দুই সহস্র সন্ন্যাসী—যাঁহারা মুক্তি-মোক্ষের প্রয়াসী নহেন, যাঁহারা নিজের ভক্তি মুক্তি বিসর্জ্জন দিয়া অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। এক জন্ম নয়, সহস্র সহস্র জন্ম ইহাই হইবে তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। ইঁহারাই হইবেন 'Sappers and Miners of the Grand Army of the

Napoleon of Religion' আমরা নাকি জগতের ধর্ম্মগুরু হইবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। তাহা যদি সত্য হয় তবে স্বামিজীর বাণী সতত আমরা যেন স্মরণে রাখি—নবদ্বীপ আমরা হাসিয়া উড়াইয়াছি, হালিসহর ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু দক্ষিণেশ্বর আমরা যেন হেলায় না হারাই। স্বামিজী ইংলণ্ডে বলিয়াছিলেন,—

"What the world wants today is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God. Who will go?"

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু আর কেহই উঠিলেন না দেখিয়া তিনি বলিলেন,—

"Why should one fear? If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter"

আমরা বহু পুণ্যফলে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি—ধর্ম্মাচরণই ভারতের চির আচরিত পন্থা। স্বামিজী এই ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভিক্ষুক ও দরিদ্র হয় ত তাহারা চিরকাল থাকিবে, ময়লা ও মলিনতার মধ্যে হয় ত তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষিদের বংশধর, এ কথা যেন ভুলিয়া না যায়।" পাশ্চাত্য দেশের মত যন্ত্র-দেবতা কখনও ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা জানে "যন্ত্র কখন মানবকে সুখী করে নাই, কখন করিবেও না।" আর এই কথা জানে বলিয়াই উপনিষদের চরম বাণী একদিন এই ভারতবর্ষেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল:—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

* * * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥”

“হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি; যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।”

ইহাই ভারতের ঐতিহ্য, ইহাই ভারতের নিজস্ব মহিমা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

“হেথা একদিন বিরাম বিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।
* * * *
* * * *
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ।

পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা মানবের
সাগর তীরে।"

মহা মানবতার অনাগত সেই দিনটির অপেক্ষায় আমরা উন্মুখ হইয়া আছি,—

"A new synthesis will suddenly emerge—a new synthesis that will burst all bonds and dash upon the earth with the welter and clash of a cyclical cataclysm. Lo and behold! The sea is already surging, hissing, heaving and tossing. The foam is on the crest. And who rides the element? The trident bearing Poseidon, the great Swami Vivekananda!"

শ্রীঅবনীনাথ রায়

দুরন্ত

লক্ষ্মীছ'ড়া দুরন্ত ছেলেকে আমরা সকলেই ভালবাসিতাম। সে ছিল পালের সর্দ্দার। শিক্ষকরা তাহাকে ভয় করিতেন, পাড়ার লোকেরা দু চোখে দেখিতে পারিত না। কিন্তু নির্ভীক, দুষ্ট, বলিষ্ঠ মুকুন্দ অভিভাবকদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, তাঁহাদের ছেলেদের লইয়া দিবারাত্রি দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইত।

মুকুন্দর বিধবা পিসিমা ছিলেন, তিনি কাঁদিতেন; কোন্ দিন কোথায় গিয়া ছেলেটা বেঘোরে মারা যাইবে—এই ভয়ে। আমরা বলিতাম, "পিসিমা, তুমি ভেবো না, মুকুন্দকে যমও ভয় করে।" তিনি জিব কাটিয়া বলিতেন, "ষাট্ ষাট্, ও কথা বলিসনি বাছা, বলতে নেই। সে আমার বড় দুরন্ত রে! আহা অল্প বয়সে বাপ-মা-মরা ছেলে!

সে তো তোদেরই কাছে থাকে বাবা, তাকে একটু দেখিস, তোরা।” মুকুন্দ পড়াশোনা মোটেই করিত না, কিন্তু তার মত বুদ্ধিমান ছেলেও স্কুলে আর ছিল না। ফোর্থ ক্লাসের হাফ্-ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে সে চার নম্বর পাইয়াছিল, ইয়ারলি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইল। পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে একটু মনোযোগ দিয়া অঙ্ক কষিয়াছিল। ক্লাসে মুকুন্দ বড়ই উপদ্রব করিত। শিক্ষকদের মোটেই তোয়াক্কা রাখিত না। যত রকমের শাস্তি আছে সব রকম পরখ করিয়া শিক্ষকরা যখন দেখিলেন তাহার চরিত্রের কোনই পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তখন তাঁহারা হাল ছাড়িয়া দিলেন।

পিসিমা মুকুন্দকে ছাড়িয়া একদিনও থাকিতে পারিতেন না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইলে পিসিমা একটি কেরোসিনের আলো হাতে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় তাহার খোঁজ করিয়া ফিরিতেন। দুচার দিনের জন্যও কোথাও বেড়াইতে যাইবার কথা বলিলে তিনি মাথা খুঁড়িয়া মরিতেন।

একবার মুকুন্দ বেড়াইতে যাইবার একটা মজার ফন্দি বাহির করিল। একটা নেড়ি কুত্তাকে খোঁচা দিয়া রাগাইয়া তাহার মুখের ভিতর হাত পুরিয়া দিল। তাহার দংশনে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হাতখানা পিসিমাকে দেখাইয়া বলিল, পাগলা কুকুরে তাহাকে কামড়াইয়া দিয়াছে। পিসিমা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সঙ্গে তাহাকে কসৌলি পাঠান হইল। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া, ফিরিবার সময় সিমলা, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা ঘুরিয়া ঠিক গ্রীষ্মের ছুটির পূর্ব্বে সে বাড়ী ফিরিল।

মুকুন্দ না থাকায় আমাদের আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে হাসি তামাসা, সে হুড়োহুড়ি মারামারি, সে নিত্য নূতন দুষ্টুমি—সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে রসের আসরে পসরা যোগাইবার লোক—মুকুন্দ ছাড়া আর কেহই ছিল না। মুকুন্দ আসিতে আমাদের শুষ্ক প্রাণ মুঞ্জরিয়া উঠিল। যেদিন আসিল সেইদিনই বিকালে তাহাকে লইয়া আমরা বেড়াইতে গেলাম। মাঠের পথ ছাড়িয়া বনের পথ ধরিলাম।

দুই পাশে বন। কাঁটা গাছ স্থানে স্থানে বাহু মেলিয়া পথ আটকাইয়া আছে। কত বনফুলের গন্ধ। দূরে মহিষের গলঘণ্টা শোনা যাইতেছে।

মুকুন্দ শাল গাছের দুইটি ডাল ভাঙ্গিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুকুন্দ, ওকি হবে?"

মুকুন্দ বলিল, "ভালুক এলে মারবো।"

সভয়ে বলিলাম, "ভালুক কিরে?"

"ন্যাকা, মহুয়া গাছে ফুল হয়েছে, এখন ভালুক বেরোয় জানিস না?"

আমরা বলিলাম, "তবে আর গিয়ে কাজ নেই, ফিরে চল্, ভাই।"

"ক্ষেপেচিস," তারপর শালগাছের ডাল দুইটি দেখাইয়া বলিল, "তবে আর এ দুটো ভাঙ্গলুম কেন? ভালুক তাড়া করলে একটা লাঠি তার মুখের সামনে ধরতে হয়। সে দাঁড়িয়ে উঠে দুটো হাত দিয়ে লাঠিটা ধরে ফেলে, তারপর আর একটা লাঠি দিয়ে মারতে হয় তার নাকে। ভালুক তো ভালুক, তার বাবা জাম্ববান এলেও পালাতে পথ পাবেন না।"

মুকুন্দ যে রকম ভাবে বলিল, তাহাতে মনে হইল ভালুক মারা আর রসগোল্লা খাওয়া দুই সমান - একই রকম সহজ কাজ। খানিক দূর গিয়া রেল রাস্তায় পড়িলাম। রেল লাইনের উপর দিয়া পাল্লা দিয়া সকলে হাঁটিয়া চলিলাম। একটা ছোট খালের উপর পাথরের পুল। ক্লান্ত হইয়া পুলের উপর রেল লাইনে সকলে বসিলাম। মুকুন্দ তাহার ভ্রমণকাহিনী বলিতে লাগিল। দিল্লীতে এক পাবলিক্ লেট্রিনে যাইবার সময় হিন্দুস্থানী মেথরাণী তাহাকে কেমন তাড়া করিয়া আসিয়াছিল, কি সব গালাগালি দিয়াছিল, তাহা মুকুন্দ এমন রসের ফোড়ন দিয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা হাসিয়া কুটিকুটি। গল্পে আমরা এমন মজিয়া গিয়াছিলাম যে, একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যে আমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা কেহই লক্ষ্য করি নাই। মুকুন্দ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমাদের ঠেলিয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিল। তার পর যাহা হইল তাহা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপিয়া উঠে। দেখিলাম, দুইটি রেল লাইনের উপর বড় বড় পাথর সারি সারি কে তুলিয়া

রাখিয়াছে। আমাদেরই কোন জুড়িদারের কাজ, কিন্তু কখন যে করিয়াছে, তাহা দেখি নাই। ট্রেণের চাকা পাথরের উপর উঠিয়া গড়াইতেছে। এক্ষুণি হয় তো ট্রেণ ডিরেল্ড হইয়া যাইবে। মুকুন্দ রেল লাইনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুইটি লাইনের উপর হইতে বিদ্যুৎ গতিতে পাথরগুলি ফেলিয়া দিতে লাগিল। ট্রেণ অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। চক্ষের নিমেষে ট্রেণের নীচে মুকুন্দ হয় তো পিষিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার সে দিকে দৃকপাত নাই। যখন ট্রেণ আর মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে তখন সে লাফাইয়া লাইনের বাহিরে আসিয়া পড়িল। হাতের কাছে পাইয়া ড্রাইভার, বিষম রাগিয়া একটা কয়লার চাঁই ছুড়িয়া তাহার মাথায় মারিল; মাথা ফাটিয়া রক্তের ফোয়ারা ছুটিল। আমরা তাহাকে টানিয়া লইয়া গভীর বনে ঢুকিয়া পড়িলাম। একহাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া মুকুন্দও আমাদের সঙ্গে ছুটিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, গাছের নীচে অন্ধকার জমিয়াছে। আশেপাশে শুষ্ক পত্রের উপর বন্য জন্তুর পদশব্দ শোনা যাইতেছে। সোজা পথ কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছি। গভীর অন্ধকার ও নিবিড় বন আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; মহুয়া গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল কাহারা যেন কোলাহল করিতে করিতে আমাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে। আমাদের সঙ্গে একটি খুব অল্প বয়স্ক ছেলে ছিল, সে আর ছুটিতে না পারিয়া, বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মুকুন্দ তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ হইয়া আসিলে বুঝিলাম, বনের ওপারে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের আলো—গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর এখানে সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারে এতক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছিল না—তাহা ছিল ভাল, এখন চাঁদের আলো-ছায়ায় বড় বড় গাছ আর ঝোপঝাপ দেখিয়া ভয় ও আতঙ্কে শরীর যেন শীতল হইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল, যেন বিরাটকায় অগণন দৈত্য দানব দাঁড়াইয়া আছে—ঝোপে ঝোপে ব্যাঘ্র ভল্লুক আমা-

দের খাইবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় অদূরে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। সে শব্দ রাত্রির নিস্তব্ধ বনভূমির অনেকখানি অংশ কাঁপাইয়া তুলিল। আমরা ভয়ে চীৎকার করিয়া, সকলে জড়া-জড়ি করিয়া ধরিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ভয়ে প্রায় বাহ্য জ্ঞানশূন্য। সকলে চোখ বুজিয়া আছি। চোখ খুলিয়া দেখিবার বা একটি কথা বলিবারও তখন সামর্থ্য নাই। কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না। খানিক পরে মুকুন্দর গলার আওয়াজে চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল, "ওরে —ও কিছুই নয়। একটা গাছ ভেঙ্গে পড়েছে; পোকায় গাছটার গুঁড়িটা একেবারে খেরে ফেলেছিল। আমি গিয়ে দেখে এলুম। তোদের বিশ্বাস না হয় দেখবি আয়"—এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। আমি সভয়ে বলিলাম, "না, মুকুন্দ যাব না। পোকায় খেয়েছে তো গাছটা ঠিক এখনই পড়লো কেন? ও ঠিক ভূতে ভেঙ্গেছে।"

"তোর মাথা"—এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে লাগিল। আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম কিছুতেই যাইব না, সেও ছাড়িবে না। তখন সে বিরক্ত হইয়া, আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "তবে তোরা থাক্, আমি চল্লুম।" হাত ছাড়িয়া দিয়া সে যখন সত্য সত্যই খানিকদূর চলিয়া গেল তখন আমাদের অসহায় নিরুপায় অবস্থা ভাবিয়া আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। ডাকিয়া বলিলাম, "আয় ভাই যাচ্ছি, তোর পায়ে পড়ি ভাই ফিরে আয়; আমাদের ফেলে যাসনি।" মুকুন্দ হাসিয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। এই বিষম বিপদের মধ্যে তাহার হাসি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তিরস্কার করিয়া বলিলাম, "তুই হাসছিস্! লজ্জা করে না? আমাদের এই বিপদের মধ্যে টেনে এনে এখন কাপুরুষের মত পালাচ্ছিস্?"

মুকুন্দ তেমনি হাসিয়া বলিল, "কাপুরুষ আমি—না তোরা? আর আজ কে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল? আমি?—না তোরা আমায় টেনে নিয়ে এসেছিলি?"

উত্তর দিবার কিছু না পাইয়া আমি ফুঁপাইয়া—ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। অনেক পরে খানিক ঠাণ্ডা হইয়া বলিলাম, "কি হবে ভাই? কি করে বাড়ী যাব?"

উৎসাহ দিয়া মুকুন্দ বলিল, "ভাবছিস্ কেন? বাড়ীর কাছেই তো এসে পড়েছি। বনটা শেষ হতে আর বড় জোর মাইল খানেক আছে।"

"কি করে জানলি?"

"কি করে আবার জানবো!—এ সবই যে আমার জানা শোনা। আমি যে কতবার এসেছি এখানে। আর খানিকদূর গিয়েই ডানদিকে সেই বুড়ো সেগুনগাছটা, তার পরেই সেই উঁচু মাটির ঢিবি; তার ওপর দাঁড়ালেই ঘোষেদের পুকুরের পাড়টা দেখা যায়।" তাহার কথা শুনিয়া দেহে প্রাণ আসিল। আশা হইল, তবে আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিব, আবার মা বাবাকে দেখিতে পাইব। কিন্তু বড়দা তো আস্ত রাখিবে না; জ্যান্ত পুঁতিয়া ফেলিবে। যখন বনের ভিতর বাঘ, ভালুক ও সাপের হাত হইতে বাঁচিবার আশা হইল তখন বড়দা ও থানা-পুলিসের ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল। বড়দা তো মারিয়া নিমখুন করিয়া ফেলিবে, তার পরই পুলিস। পুলিস কি সহজে ছাড়িবে? তখন আবার স্বদেশীর হাঙ্গামা। এমন দিনে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ উল্টাইয়া দেবার চেষ্টা! ফাঁসি না হইতে পারে, কিন্তু জেল দ্বীপান্তর তো হইবেই। ওঃ! কেন আজ বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ সকালে উঠিয়াছিলাম! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই উঁচু ঢিবিটার কাছে আসিয়া পড়িলাম। তাহার উপর সকলে উঠিয়া দেখিলাম, দূরে বনের শেষে গ্রামের ধারে অনেক আলো দেখা যাইতেছে। আলোগুলি এখানে সেখানে ঘুরিয়া যেন কাহাকেও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

আমি বলিলাম, "ঐ দেখ্ ভাই, পুলিস বন ঘিরে আছে। আমরা বের হলেই ধরবে।" সকলে ভয়ে ঢিবির উপর বসিয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিল, "বেরিয়ে কাজ নেই, বনের ভেতরই থাকি।" অন্য সকলে বলিল, "বনে কি খাব ভাই, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে।"

মুকুন্দ এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। সে চুপ করিয়াছিল। এতক্ষণ পরে যেন তাহাকেও একটু চিন্তিত বলিয়া বোধ হইল।

খানিক পরে যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ্ দেখি, কি করলি তোরা। ছেলেমানুষি করতে গিয়ে কি বিপদে পড়তে হল। এখন পুলিসের হাত থেকে কি করে নিস্তার পাবি ?"—এই বলিয়া মুকুন্দ আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাকে অত্যন্ত অবসন্ন বলিয়া বোধ হইল। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া সে ও আমরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে, তাহার মাথায় চোট লাগিয়াছে। এতক্ষণ এতখানি রাস্তা ছুটিয়া আসিয়া এবং আহত মস্তকে ছেলেটিকে অনেকখানি পথ কাঁধে করিয়া আনিয়া সে এবারে তাহার অবশ অঙ্গ কঙ্করময় মাটির উপর বিছাইয়া দিয়া, চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মাথায় হাত দিয়া দেখি, তখনও খুব রক্ত পড়িতেছে। ঘাড়ের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া রক্তে তাহার সমস্ত জামাটা ভিজিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কাহাকেও মারা যাইতে দেখি নাই। আমার মনে হইল, এইবার বুঝি মুকুন্দ আমাদের ছাড়িয়া চলিল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিল, বোধ করিতে পারিলাম না। আমাকে এই ভাবে কাঁদিতে দেখিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিল। কৈ, মুকুন্দ তো আর একটি কথাও বলে না! তাহার একবার কলেরা হইয়াছিল, তখনও তো তাহাকে এমন নিঃসাড় নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখি নাই। সে আমাদের কতখানি ভালবাসিত তাহা আমরা জানিতাম। নিশ্চিত জানিতাম, বাঁচিয়া থাকিলে সে কখনও আমাদের কাঁদিতে দেখিয়া, এমন চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। একি হইল! কেন তাহাকে আজ সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কি করিয়া তাহার পিসিমাকে আবার মুখ দেখাইব ? মুকুন্দকে হারাইলাম—চিরকালের জন্যই হারাইলাম, আর কখনো তাহাকে দেখিতে পাইব না।

যে আলোগুলি দূরে দেখা গিয়াছিল তাহারা যে কখন অতি কাছে আসিয়া পড়িয়াছে,—এতক্ষণ কেহই তাহা দেখি নাই। আলোর সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক পত্রের উপর বহুপদ শব্দ এবং বহুলোকের কণ্ঠধ্বনিও শোনা যাইতে লাগিল। তাহারা আমাদের লক্ষ্য করিয়াই আসিতেছে।

যাহাদের হাতে ধরা পড়িব বলিয়া এতক্ষণ ভয়াকুল হইয়াছিলাম, তাহাদিগকে অতি সন্নিকটে দেখিয়াও এখন আর কোন ভয় নাই। ইচ্ছা করিলে অন্ধকার অরণ্যের ভিতর সকলেই অতি সহজে আত্মগোপন করিতে পারিতাম, কিন্তু মুকুন্দকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ স্থানও কেহ নড়িল না ; তাহাকে ঘিরিয়া সকলেই নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলাম।

যাহাদের হাতে ধরা পড়িব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলাম অবশেষে তাহারা আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম—পুলিস নহে, আমাদেরই আত্মীয় স্বজনেরা। তাঁহাদের দেখিয়া আমরা খুবই কাঁদিতে লাগিলাম। তখন কেন কাঁদিতেছিলাম—নিজেদের হঠকারিতা বা ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় অথবা মুকুন্দর মৃত্যু শোকে—তাহা এখন বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সত্য যে, তেমন করিয়া আর কখনো কাঁদি নাই। আমাদের যে এইখানে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইবেন, আত্মীয়গণ তাহা কখনই ভাবেন নাই। সুতরাং তাঁহারাও কিছুক্ষণের জন্য যেন কেমন হইয়া গেলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন মুকুন্দর কি হইয়াছে,—আমি সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি তাহার বুকে হাত দিলেন, চোখ, জিব ও নাড়ী দেখিলেন। তার পর কয়েকজন মুকুন্দকে কাঁধে তুলিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল। আমরাও যন্ত্রের মত তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম। নিস্তব্ধ বনানী—ততোধিক নিস্তব্ধ এই এতগুলি লোক। চন্দ্রকিরণ ও হাতের মিটমিটে আলোকে তাহাদের মুখের উপর ভয় ও আশঙ্কা থমথম করিতেছে—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম।

* *

মুকুন্দ মরিল না। বোধ হয় মরিলেই ভাল হইত। কেন, তাহা পরে বলিব। আমাদেরও পুলিস ধরিল না।

তার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। মাঝখানের এই দীর্ঘ অবসর নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নানা কাজে নানা স্থানে আমায় ইতিমধ্যে ঘুরিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে কোন জায়গায় হঠাৎ দেশের লোক বা

কোন বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া যাইত—তাহার নিকট কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। এইরূপে শুনিয়াছিলাম—মুকুন্দ বি. এ. পরীক্ষা দিয়া বিবাহ করিয়াছিল কিন্তু পাশ করিতে পারে নাই। পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার পিসিমা মারা গিয়াছিলেন,—তাই পরীক্ষায় সে অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল। তার পর কিছুদিন মুকুন্দর আর কোন সংবাদ পাই নাই। মাঝে মাঝে তাহার জন্য বড় মন কেমন করিত। এমন কি তাহাকে দেখিবারও ইচ্ছা হইত।

লাহোরে থাকিতে একদিন সেখানকার কলেজে একটি নূতন বাঙ্গালী প্রফেসার আসিলেন। তখন লাহোরে এত বেশী বাঙ্গালী ছিলেন না, কাজে কাজেই অল্প কয়েকজন দেশবাসীর ভিতর খুবই আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিত। সেই বিদেশে যে-কোন বাঙ্গালীর আগমন ও বিদায় সকলেরই মনে হর্ষ ও বেদনা জাগাইত। প্রফেসারের বাড়ীতে আমি একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে যে আমারই বাল্যবন্ধু—দলের ছেলে। পারিজাতকে প্রায় পনের যোল বছর দেখি নাই। সেই পারিজাত এত বড় হইয়াছে, বিবাহ ও একটি ছেলেও হইয়াছে। তাহাকেই তো মুকুন্দ সেই দুর্ঘটনার দিন আহত মস্তকে কাঁধে করিয়া অন্ধকার বন-পথে ছুটিয়াছিল। পারিজাতও আমায় দেখিয়া খুব খুসী হইল। এই বিদেশে যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার সহিত তাহার দেখা হইবে—ইহা সে কল্পনাও করে নাই। প্রথম দর্শনে—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে আমায় একেবারে জড়াইয়া ধরিল, আনন্দের বেগ কিছু কমিলে পারিজাত, তাহার স্ত্রী ও ছেলেটিকে আমার কাছে লইয়া আসিল। বন্ধুজায়া সলজ্জ হাসিমুখে আসিয়া নমস্কার করিলেন। তার পর নিজের হাতের তৈরী নানাবিধ খাবার আনিয়া আমায় খাওয়াইলেন।

আহার শেষ করিয়া পারিজাতের কাছে দেশের খবর জিজ্ঞাসা করিলাম। হাল্ চাল্ কি রকম—কে কোথায় আছে? প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম মুকুন্দর কথা—সে এখন কোথায় ও কি করিতেছে? লক্ষ্য করিলাম—মুকুন্দর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেই পারিজাতের

মুখ যেন কেমন হইয়া গেল ; বিশীর্ণ মুখে সে মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আমার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া, তবুও যথাসম্ভব অনুৎকণ্ঠার ভাব দেখাইয়া বলিলাম, "কি হয়েছে তার, আমায় বল্ তো ?"

যে কাহিনী পারিজাত বলিল, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

মুকুন্দ এলাহাবাদে চাকরি করিতে গিয়াছিল। সহরের উপকণ্ঠে তাহার বাসা, সস্ত্রীক সেখানে থাকিত। প্রায়ই বিকেল বেলা গঙ্গার ধারে তাহারা বেড়াইতে যাইত। একদিন যখন গঙ্গার ধারে তাহারা বেড়াইতেছে, হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও মুষলধারে বৃষ্টি। আশ্রয় না পাইয়া মুকুন্দ ও তাহার স্ত্রী একটি গাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল উপরে বৃক্ষশাখা মড়্ মড়্ করিতেছে, নিম্নে গঙ্গা ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিতেছে। ঝড়ের সহিত পাল্লা দিয়া সে যেন মাতামাতি সুরু করিয়াছে।

মুকুন্দ তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তরু, দেখ, গঙ্গা এখন কেমন চমৎকার, কি সুন্দর তুফান !"

বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া তরুর সর্ব্বাঙ্গ তখন শীতল হইয়া আসিতেছিল। উত্তর দিবার মত সামর্থ্য তখন তাহার ছিল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া সে কেবল একবার স্বামীর মুখের দিকে ও একবার গঙ্গার দিকে তাকাইল।

মুকুন্দ বলিল, "এখন সাঁতার কাটতে ভারি মজা, তরু। আমরা ছেলেবেলায় এমন কত সাঁতার কেটেছি।"

তরু বাহুবেষ্টনে স্বামীকে শক্ত করিয়া ধরিল।

মুকুন্দ বলিল, "একবার ছেড়ে দাও না, তরু, একটু সাঁতার কেটে আসি। ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।"

ভীত কপোতের মত কাঁপিতে কাঁপিতে এবার তরু স্বামীকে আরো ভালো করিয়া জড়াইয়া ধরিল।

মুকুন্দ খুব আব্দার করিয়া বলিল, "লক্ষ্মীটি, একবার ছেড়ে দাও, এক্ষুণি ফিরে আসছি।"

তরু স্বামীর বুকে মাথা গুঁজিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "না— সে হবে না।"

তাহার বাহুবেষ্টন হইতে মুকুন্দ হঠাৎ নিজেকে ছাড়াইয়া লইল। তরু কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "ওগো যেয়ো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ফিরে এসো—।"

মুকুন্দ তখন কয়েক হাত গিয়াছে। তরু ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড় ধরিয়া ফেলিল। কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া মুকুন্দ ঝপ্ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। তরু শুনিতে পাইল, স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে যাইতে সে বলিতেছে, "ভয় কি, আমি এক্ষুণি আসছি।"

আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তরুও স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল; কিন্তু পারিবে কেন? চক্ষের নিমেষে মুকুন্দ কোথায় চলিয়া গেল।

ঝড় বৃষ্টি থামিল, মেঘ কাটিল, চাঁদ উঠিল, গঙ্গাও শান্ত হইল, কিন্তু মুকুন্দ আর ফিরিল না।

চন্দ্রেশ্বরানন্দ

স্বামী সারদানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সমস্ত কার্য্যে স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। এই দুই জনের সমবেত চেষ্টায় বেলুড়-মঠে উপ্ত ক্ষুদ্রবীজ বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রকাণ্ড মহীরুহাকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং নানাদেশে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ভারতের মূলভিত্তি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের

আধ্যাত্মিক বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। কিন্তু স্বামী সারদানন্দ এই সংঘের অপর সমস্ত কার্য্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নূতন কেন্দ্র স্থাপন, সেবাকার্য্য, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক বিপদে সাহায্যদান, শিক্ষা-বিস্তার, ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি মঠ ও মিশনের যাবতীয় কার্য্যাবলী তাঁহারই তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহ হইত, তিনি গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের বিশাল স্তম্ভ ছিলেন। সমস্ত রামকৃষ্ণ সংঘ শরৎ মহারাজের জীবন ও সাধনার উজ্জ্বলতম সাক্ষী। তাঁহার অভাবে আজ আমরা নিজকে যে কিরূপ অসহায় মনে করিতেছি তাহা অপরকে বোঝান অসম্ভব। এইরূপ মনীষা, প্রতিভা, কর্ম্মকুশলতা, সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণতা, অপার্থিব উদারতা, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞতা, অনাবিল ভালবাসা ও সহানুভূতি সম্পন্ন নেতা আমরা আর দেখিতে পাইব কিনা জানি না। তাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় উদার ও সমুদ্রের ন্যায় গভীর ছিল। কত নিরাশ্রয় ব্যক্তির তিনিই আশ্রয় ছিলেন। সংসারের কত ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারী এই সুমহান বিটপীমূলে আশ্রয় লাভ করিয়া জীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকেই মনে করিতেন, "যাহার কেহই নাই, তাহার শরৎ মহারাজ আছেন।" তিনি ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অনেক সময় মনে হইত, "মোর অধিকার অপরাধ করা, তোমার করিতে ক্ষমা", পরের ভার বহন করিবার এত শক্তি আর কাহারও আছে কিনা জানি না। কেহ তাঁহার প্রতি এক হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি দুই হাতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। কেহ তাঁহার প্রতি এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আপনার বিশাল বক্ষে জড়াইয়া ধরিতেন। অনেক সাধু ও গৃহস্থ ভক্তের তিনিই "গতি, সুহৃদ ও ভর্ত্তা" স্বরূপ ছিলেন। বাহ্যিক গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে তাঁহার কোমল হৃদয়ে মাতৃপ্রেমের উৎস শতধারে প্রবাহিত হইত। এই প্রেম-মন্দাকিনীর সংস্পর্শে আসিয়া বহু দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়াছে।

তাঁহার ন্যায় কর্ম্মকুশলব্যক্তি অতি বিরল দৃষ্ট হয়। স্বামী সারদানন্দের মধ্যে গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের ধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান

ছিল। সুখে দুঃখে তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। জয় পরাজয়ে তাঁহার সমান জ্ঞান ছিল। তাঁহার মধ্যে স্বাস্থ্যে উদাসীনতা ও রোগে হাসি দেখিয়াছি। সাময়িক উত্তেজনায় তিনি কোনও কার্য্য করিতেন না। কর্ম্মের মাদকতা তাঁহাকে কখনও অভিভূত করে নাই। নিজকে সাক্ষি স্বরূপ ও উদাসীন করিয়া কিরূপ অনাসক্ত ভাবে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহার পরিচয় তাঁহার সমস্ত কার্য্যকলাপের মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। তিনি আদর্শ কর্ম্মযোগী ছিলেন। যেরূপ উৎসাহের সহিত তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেন আবার সেইরূপ অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজকে কর্ম্ম হইতে ব্যবধানে রাখিতে পারিতেন। জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় কর্ম্মের আবিলতা তাঁহার অনাবিল হৃদয় কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া তিনি নিষ্কাম ও নিস্পৃহ ভাবে সমস্ত জীবন ধরিয়া কর্ম্ম করিযাছিলেন। কাজ কর্ম্মের ভিতর থাকিয়া মানুষ কিরূপে আধ্যাত্মিক জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে তাহা শরৎ মহারাজকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছি। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"-রূপ গীতার বাক্য তাঁহার জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে ভগবানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার কর্ম্মের ধারা বহুদূর প্রসারিত থাকিত। তিনি যেমন কল্পনাপ্রিয় ভাবুক আবার তেমনি ওজস্বী লেখকও ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ভাষা-সৌন্দর্য্যে ও ভাব-সম্পদে বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে।

তিনি মুমুক্ষুকে যেমন কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতেন আবার সাধন ভজনেও তেমনি উৎসাহ দিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন, "হাজার কর্ম্মের মধ্যেও ধ্যান জপ করিবে। মানুষ সারাজীবন কর্ম্ম করিতে পারে না। চল্লিশ বছরের পর আমরা সাধারণ কর্ম্মে অপটু হয়ে পড়ি। অভ্যাস থাকিলে তখন ধ্যান জপকে জীবনের সম্বল করা যায়।" মানব-চরিত্রের আপাতদৃষ্ট বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলী তাঁহার জীবনে ও সাধনায় অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে রমণী-সুলভ কোমলতা

থাকিলেও বাহিরে তিনি বিবেক বিচারের সুদৃঢ় বর্ম্মে সুরক্ষিত ছিলেন ; তাঁহার জীবন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়স্থল ছিল। তিনি কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু কর্ম্ম-সহজাত-আবিলতা তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারে নাই। তিনি ভাবুক ছিলেন, কিন্তু ভাবপ্রবণ ছিলেন না। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু কোনরূপ নীরসতা তাঁহার জীবনের মাধুর্য্য নষ্ট করে নাই। তাঁহার ভিতর মায়ের অসীম ভালবাসা, আচার্য্যের কঠোর শাসন ও গুরুর অনন্ত ধৈর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ; তাঁহার চরিত্রে শালবৃক্ষের সারবত্তা ও চন্দনের সৌরভ বিদ্যমান ছিল।

কোন বিষয়েই তিনি বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। ঢাক ঢোল বাজাইয়া কাজ করা তাঁহার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। অতি বৃহৎ ফলপ্রসূ কাজও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে লুকায়িত রাখিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিরভিমানিত্বই তাঁহার কাজের মূলসূত্র ছিল। সাধারণ লোক তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইত না। সম্মান ও নিন্দা তিনি অতি সহজেই হজম করিতেন। শত শত লোক তাঁহাকে অসীম শ্রদ্ধা করিলেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য অহংকারে স্ফীত হইতেন না। তাঁহার কাজের এক ভাগ করিলেই আমরা অহংকারে আত্মহারা হই! সেইজন্যই আমাদের কাজের ফল অতি ক্ষণস্থায়ী। আতসবাজি মুহূর্ত্তকালের জন্য দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া শান্ত তারকামণ্ডলীর প্রতি উপহাসপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সত্য, কিন্তু ক্ষণকাল পরে ঐ আতসবাজি অকিঞ্চিৎকর ভস্মমাত্রে পরিণত হয়।

শরৎ মহারাজের সমস্ত কার্য্য সংযমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কথাবার্ত্তা, চালচলন ও আচার ব্যবহারে এইরূপ সংযত ভাব অন্য জীবনে দেখি নাই। সংযম যেন মূর্ত্তিমান হইয়া শরৎ মহারাজের দেহ ও মনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পবিত্রতা, আত্মনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজী তাঁহার জীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার ছিল অলৌকিক ধৈর্য্য ও অক্রোধ। একবার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার অক্রোধে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "শরতের

যেন মাছের রক্ত। কিছুতেই তাতে না।" একটি দশ বৎসর বয়স্ক বালকের কথাও তিনি ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতেন। বালকের ন্যায় হইয়াই তিনি বালকের সহিত মিশিতেন। ধর্ম্মোপদেশ ভিন্নও নানাবিধ সাংসারিক বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য বিবিধ লোক তাঁহার নিকট সমাগত হইত। লোক-চরিত্রে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া সকল বিষয়ে তিনি দক্ষতার সহিত উপদেশ দিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত আমরা শিক্ষক, বন্ধু, আচার্য্য ও গুরু সকল ভাবেই মিশিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম।

উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই তিনি জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যা সহজে সমাধান করিতে পারিতেন। শুনিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মদৃষ্টিতেই সকল লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ইতর মানবের ন্যায় মানুষ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন না। মায়াতীত সাক্ষী ও দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া তাঁহারা যাবতীয় জাগতিক কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। আমরা দেখিয়াছি, জাগতিক নানাবিধ অশান্তিতে নিরন্তর পরিবৃত থাকিলেও স্বামী সারদানন্দের শীর্ষদেশ সর্ব্বদাই যেন উচ্চ গৌরীশৃঙ্গের ন্যায় ভগবদুপলব্ধিরূপ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহার মনের সেই উচ্চ অংশে সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে পারিত না। মায়ার রাজত্বের নানাবিধ দুর্য্যোগ সেই অংশের অনাবিল শান্তি কখনও বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হইত না। সংসারের ঘাত প্রতিঘাত তাঁহার পাদদেশে আহত হইয়া দূরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠ মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। ইহাই তাঁহার কার্য্যকলাপ ও জীবনের বিশেষত্ব ছিল।

ইংরাজীতে যাহাকে Gentleman বলে তিনি সেইরূপ আদর্শ ভদ্র-লোক ছিলেন। সাধারণ লোকের ধারণা সাধুগণ সামাজিক শিষ্টতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকেন। কিন্তু শরৎ মহারাজের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি নিজ জীবনে উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহিত সামাজিক শিষ্টতার, উত্তম সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া

চলিতেন। তাঁহার বিনয়, ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহারে কত নবাগত ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে স্বল্পকাল বাস করিয়াও তিনি সেই দেশের রীতি নীতিতে পারদর্শিতা লাভ করেন। এদেশে তাঁহাকে দেখিলে অতি নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু বলিয়া মনে হইত; আবার তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণের মুখে শুনিযাছি তাঁহার সহিত দশ মিনিট বাক্যালাপ করিলেই মনে হইত যে তিনি পাশ্চাত্য দেশের শিষ্টাচারের সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানব তাঁহার সুগভীর আধ্যাত্মিকতার মাপ করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে মানব-ধর্ম্মের আশ্চর্য্য সার্থকতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পূর্ণ-মানব ও দেব-মানবরূপে তাঁহার চরিত্র ধ্যান করিয়া শান্তি পাইয়াছি।

একবার বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ড্সে বেলুড়-মঠ দেখিতে আসেন। মঠের ঠাকুর ঘরে জুতা পায়ে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। বোধ হয়, গভর্ণরসাহেব এই নিয়ম জানিতেন না। তিনি পাদুকাসহ ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে স্বামী সারদানন্দ হাঁটু পাতিয়া বসিয়া স্বহস্তে তাঁহার জুতার ফিতা খুলিয়া দেন। এই সামান্য ঘটনা হইতে তাঁহার উদারতা ও তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দও একবার মঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু অনারগিক ধর্ম্মপালের পাদদেশ স্বহস্তে ধৌত করিয়াছিলেন। প্রতি কার্য্যেই শরৎ মহারাজের তীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক কার্য্যে আমরা উহা লক্ষ্য করিয়াছি। সুস্থাবস্থায় ৺কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান, ৺বিশ্বনাথ ও ৺অন্নপূর্ণা দর্শন করিতেন। সেই সময় কোন কোন সাধু তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। আমরা দেখিয়াছি, তিনি কাহাকেও ঐরূপ করিতে দিতেন না; এবং অপরকে তাঁহার সহিত একত্রে চলিতে বিরত করিতেন। উহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পরে বুঝা গিয়াছিল যে, তিনি বাত রোগ হেতু সাধারণতঃ ধীর

গতিতে ভ্রমণ করিতেন, সেই সময় অপর ব্যক্তি তাঁহার সহিত গমন করিলে উহাকে অনর্থক কষ্ট পাইতে হইবে মনে করিয়া তিনি সকলকে ঐ কার্য্যে বিরত করিতেন। অপর এক সময়ে তিনি শীতকালে ৺কাশী-ধামে অবস্থান করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে তাঁহার স্নান করার অভ্যাস ছিল। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে তাঁহার কষ্ট হইবে মনে করিয়া শেষ রাত্রে তাঁহার জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি হঠাৎ একদিন সেবকগণকে শীতের রাত্রে উঠিয়া জল গরম করিতে দেখিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শয়ন করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য ইহার পর হইতে তিনি বেলা করিয়া স্নান আরম্ভ করিলেন। একবার তাঁহার দাঁতের মাড়ীতে যন্ত্রণা হয়। একদিন ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ঘোষকে এই বিষয় বলাতে ডাক্তার বাবু আসিয়া তাঁহার দাঁতের গোড়া হইতে একটি কাঁটা বাহির করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া ডাক্তার বাবু জানিলেন যে, প্রায় মাসাবধিকাল ঐ কাঁটা তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়াছে। এই সামান্য বিষয় তাঁহাকে এতদিন পরে জানান হেতু ডাক্তার বাবু দুঃখ প্রকাশ করিলে শ্রীশরৎ মহারাজ বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম হয় তো উহা অমনি সারিয়া যাইবে। অনর্থক তোমাকে কষ্ট দিয়া লাভ কি?" একবার অসুখের সময় আমরা বারংবার ডাক্তার বাবুর নিকট যাওয়াতে তিনি আমাদিগকে বিশেষ ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য অপরে বিন্দু-মাত্র কষ্ট পায় ইহা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বহু লোক তাঁহার সেবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেও তিনি খুব কমই অপরের সেবা গ্রহণ করিতেন। বিগত শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ ও মিশনের মহাসম্মিলনের সময় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। তখন তাঁহার শরীর সুস্থ ছিল না। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি মঠে এক পক্ষকাল বাস করিয়া উক্ত মহাসম্মিলনের কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। কলিকাতাস্থ ভক্তগণের বিশেষতঃ মহিলাগণের দর্শনের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা সহরের স্বল্প পরিসর বাটিতে সর্ব্বদা বাস করিতেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ সাধারণতঃ স্বল্পভাষী ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অতি জটিল সমস্যাও তিনি দুই এক কথায় অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেন, বোধ হয় তিনি নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ঐরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "একদিন ঠাকুর আমাকে বলিলেন, অত শাস্ত্রাদি পড়িয়া কি হইবে? 'নাথ, তুমি সর্ব্বস্ব আমার' এই গানটির অর্থ বুঝিলেই সমস্ত হইয়া যাইবে। ঠাকুর তাল দিয়া নিজেই আমাকে এই গানটি শিখাইয়াছিলেন।"

"নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
প্রাণাধার সারাৎসার নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে
বলিবার আপনার॥
তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান বুদ্ধি বল।
তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার॥
তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ তুমি পরকাল তুমি স্বর্গধাম।
তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্পতরু অনন্ত সুখেরি আধার॥
তুমি হে উপায় তুমি উদ্দেশ্য, তুমি সৃষ্টিপাতা তুমি হে উপাস্য।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা অনন্ত সুখেরি আধার॥"

আজ তাঁহার অভাবে বোধ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের স্ত্রীভক্তগণ সর্ব্বাপেক্ষা মুহ্যমান হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমার স্থূল দেহত্যাগের পর শরৎ মহারাজই বোধ হয় তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। কলিকাতাস্থ অনেক স্ত্রীভক্ত, বিশেষতঃ নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার অক্লান্ত ধৈর্য্য লক্ষ্য করিয়াছি। পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তগণের সর্ব্ব বিষয়ে আব্দার ও অনুযোগ সহ্য করা যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের একজন সাধু একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "শরৎ মহারাজ পূর্ব্বে আমাদের 'মা' ছিলেন, তিনি এখন আমাদের 'ঠাকুর মা' হইয়াছেন।" শ্রীশ্রীমা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের দেহমন আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তমণ্ডলীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্ত্রীভক্তদের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি আশ্চর্য্যরূপে তাঁহাদের মনোভাব

বুঝিতে সমর্থ হইতেন। অনেকে বলেন যে, তাঁহারা পূজনীয় শরৎ মহারাজকে অনেক সময় নিজেদের একজন মনে করিয়া অকপটে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার নিকট সর্ব্ববিধ মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। তিনি নিজেকে 'মায়ের দারোয়ান' রূপে অভিহিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। শ্রীশ্রীমারও তাঁহার উপর অদ্ভুত স্নেহ ও বিশ্বাস ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "একমাত্র শরৎই আমার সর্ব্ববিধ ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ।" শুনিয়াছি, মা শরীর-ত্যাগের অল্পপূর্ব্বে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "শরৎ, এরা সব রইল।" উপযুক্ত স্কন্ধেই এইরূপ গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সমগ্র স্ত্রীজাতির মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জগজ্জননীর প্রকাশ পরিস্ফুট দেখিয়া তিনি তাঁহাদের সেবায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতিকে তিনি ভগবতীর সাক্ষাৎ প্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। কেহ মাতৃজাতির অবমাননা-সূচক কোনও আচরণ করিলে তাঁহার ন্যায় ধীর ব্যক্তিও অতি সহজে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ 'সিষ্টার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে'র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে উক্ত বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উন্নতি ও প্রসারতা হইয়াছে। তাঁহার অভাবে ঐ বিদ্যালয়ের যে কতদূর ক্ষতি হইল তাহা কে নির্ণয় করিবে ?

জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর পূজনীয় শরৎ মহারাজ ধ্যানজপেই বিশেষভাবে দিন অতিবাহিত করিতেন। সমস্ত প্রাতঃকাল তিনি অন্য কোনও কাজ করিতেন না। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই এক অপূর্ব্ব অন্তর্ম্মুখী ভাব পরিলক্ষিত হইত। বাজে কথাবার্ত্তায় কালক্ষেপ করিতে তিনি বিশেষ বিরক্তি বোধ করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি নবপ্রকাশিত ইংরেজী জীবন-চরিত তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া বলা হইয়াছিল, "মহারাজ, আপনি 'লীলাপ্রসঙ্গ' শেষ করিলেন না। উহার শেষ খণ্ড লিখিলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইত এবং ঠাকুরেরও একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবনী লোকের পড়িবার সুবিধা হইত।" উত্তরে তিনি বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা না হইলে কিছু হয় না। মা ও মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) শরীর ত্যাগের

পর হইতে মনে হইতেছে যেন নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য হারাইয়াছি। এখন আর কোনও কাজে তেমন উৎসাহ পাই না। তার পর এখন আবার দেখিতেছি যে, ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই। কিছুই উপলব্ধি না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লেখা বা বলা নিতান্ত ছেলে মানুষি বলিয়া মনে হয়। এখন ইচ্ছা হয় আর কিছু না বলিয়া বা লিখিয়া কেবল তাঁহাতে ডুবিয়া যাই।" বাস্তবিকই জীবনের শেষ সময় তিনি যেন আধ্যাত্মিকভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। এই সময় বহু নরনারী তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সাধারণ লোক স্বামী সারদানন্দকে একজন কর্ম্মী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পাদক বলিয়া জানেন। কিন্তু তিনি বহু নরনারীর আধ্যাত্মিক বিষয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বড় কেহই তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই।

আধ্যাত্মিক জগতে বা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ইতিহাসে স্বামী সারদানন্দের স্থান ও মূল্য নিরূপণ করিবার এখন উপযুক্ত সময় নহে। ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক এই বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করিবেন। এইমাত্র সেই দিন তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে যে আমরা প্রকৃতপক্ষে হারাইয়াছি ইহা ভাবিতেও মন শিহরিয়া উঠে। এখনও মনে হয় যে, 'উদ্বোধন কার্য্যালয়ে' যাইলে আবার তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিব; আবার তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হইব।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর আচার্য্য দেখা যায়। এক শ্রেণীর আচার্য্য শিষ্যগণকে কেবলমাত্র উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন। ইহাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর আচার্য্য উপদেশ না দিয়া স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বোত্তম আচার্য্য উপদেশও দেন না এবং বিশেষরূপে দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন না। শ্রেষ্ঠ আচার্য্য স্বীয় সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদ দ্বারা নীরবে শিষ্যের মনে 'প্রভাব' বিস্তার করিয়া তাঁহাদের জীবন মধুময় করেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের কৃপা প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের সিদ্ধি সুনিশ্চিত। দেশ, কাল বা কোনও নিমিত্তের ব্যবধান শিষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ গুরুকে দূরে সরাইতে পারে না। গুরু নিত্যই শিষ্যকে

সর্ব্ববিধ অকল্যাণ হইতে রক্ষা করেন এবং স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা আশ্রিতের মঙ্গল সাধন করেন। আচার্য্য স্বামী সারদানন্দের জীবনে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর গুরুর ধর্ম্ম বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার নিকট ধর্ম্মের উপদেশ খুবই বিরল শোনা যাইত। তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিবার সুযোগও বহুলোকের ভাগ্যে হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার কৃপালাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা সকলে এই আচার্য্যের আশীর্ব্বাদের প্রভাব অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন। শিশির-সম্পাত যেরূপ নীরবে ও লোক-চক্ষুর অন্তরালে গোলাপ-কোরকের উপর পতিত হইয়া উহাকে বহুদলে শোভিত ও প্রস্ফুটিত করে, আচার্য্যোত্তম শরৎ মহারাজের আশীর্ব্বাদ এবং শুভেচ্ছাও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে তাঁহার অনুগত ভক্ত-হৃদয়ে বর্ষিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরস্থিত আধ্যাত্মিকতা বিকাশে সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে। আজ আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি, তিনি স্থূললোক-চক্ষুর অন্তরালে গমন করিলেও তাঁহার উদার আত্মা দেশ ও কালরূপ পরিচ্ছিন্নতার বাধা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বব্যাপী বিরাট আত্মারূপে সকলের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তাঁহার জনৈক পাশ্চাত্য শিষ্যা তাঁহার শরীর ত্যাগের পর লিখিয়াছেন,—

" . . . . . . The days of his illness were the most difficult to bear for me. I nearly went mad—longing to be with my beloved. . . . . . . Now I know no one car separate me from my Beloved Guru except my own mind. I can be with him all the time and through his mercy and grace I feel his presence. He will not forsake his children. He will help us. He never failed anyone. He never failed me even before I met him in his physical body. He was with me long before I prostrated before his body in 1, Mukherjee Lane. He himself acknowledged this when I spoke to

him of it. The relationship is eternal—he has said it. So I don't feel so sad now. . . . . . ."

অর্থাৎ—'তাঁহার অসুখের কয়েক দিন আমার পক্ষে দুঃসহ বোধ হইয়াছিল। আমার প্রিয় গুরুদেবের নিকটে থাকিবার প্রবল ইচ্ছায় আমি প্রায় উন্মত্ত হইয়াছিলাম········কিন্তু এখন আমি বুঝিতেছি যে, আমার নিজের মন ব্যতীত আর কেহই আমাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। এখন হইতে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিব। তাঁহার কৃপায় আমি তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিতেছি। তিনি কখনও তাঁহার সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। কেহই তাঁহার নিকট বিফল মনোরথ হয় নাই। এমন কি তাঁহার স্থূলদেহের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেও তিনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১নং মুখার্জ্জির লেনে তাঁহার চরণ প্রান্তে প্রথম উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি আমার সহিত ছিলেন। তাঁহার নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য। সুতরাং এখন আমি আর তত দুঃখ অনুভব করিতেছি না।'

পূজনীয় শরৎ মহারাজের শরীর-ত্যাগের পর তাঁহারই একজন মহামান্য গুরুভ্রাতা আমাদিগের জনৈক বন্ধুকে এক সান্ত্বনা পূর্ণ চিঠি লেখেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"·····শরৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন। আমরাও যাইব। ঠাকুর যখন যাহাকে ডাকিবেন—যাইতে হইবে। আমরা যে তৈয়ার হইয়া আছি। কিন্তু ঠাকুর বা আমাদের সহিত তোমাদের সম্বন্ধ কি কেবল মাত্র স্থূলদেহ লইয়া? তাহা যদি হইত তাহা হইলে ত ঠাকুরের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যাইত! কিন্তু যতদিন যাইতেছে দেখিতে পাইতেছ না ভক্ত এবং অভক্তদের হৃদয়ে তাঁহার অস্তিত্ব বিরাট এবং বিরাটতর ভাবে বোধ হইতেছে এবং সম্বন্ধ দৃঢ় ও দৃঢ়তর হইতেছে। তেমনি শরৎ মহারাজ গেছেন কোথায়? তিনি এতদিন একটি শরীরে আবদ্ধ ছিলেন, এখন হইতে তাঁহার

পূত—পবিত্র চরিত্র, তাঁহার প্রেম ভালবাসা, বিশ্বাস ভক্তি, ধীর স্থির বুদ্ধি, অচল অটল সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য তোমাদের সকলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবে—তাঁহার কৃপায় তোমরা তাঁহাকে চোখে দেখিয়া যে আনন্দ পাইতে এখন হইতে তাঁহার চরিত্র ধ্যানে আরও শতগুণ আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশীর্ব্বাদ এখন সদাসর্ব্বদা অনুভব করিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে আর কলিকাতায় নয়—অতি নিকটে হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাঁহার দর্শন পাইবে। কোন ভয় নাই। তাঁহার শরীর-ত্যাগে ঠাকুরের কৃপায় তিনি তোমাদের আরও আপনার জন হইয়াছেন। অধিক আর কি লিখিব। তাঁহার কৃপায় তোমরা ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিবে·········।”

নিখিলানন্দ

আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তোমরা প্রভুর সর্ব্বদা স্মরণ, মনন, ভজন, ধ্যানাদি ও তাঁহার কার্য্যাদি করিয়া জীবন ধন্য কর। যে জন্য সামান্য সংসার ত্যাগ করিয়া প্রভুর বিশাল, পবিত্র, ধর্ম্মময় সংসারে আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ এবং সমগ্র জগৎকে প্রভুর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ তাহা যেন তোমাদের স্মরণ থাকে। সমস্ত সমাজ এখন তোমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। বেলুড়-মঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন এখন ভারতের আদর্শস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমরা এই সকল চিন্তা করিয়া, অতি তুচ্ছ রাগদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, কামাদি প্রভুর কৃপায় মন হইতে দূর করিয়া দিয়া প্রভুকে সেইখানে বসাইয়া শান্তি, তেজ, ওজঃ, বীর্য্য, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি দৈবী সম্পত্তি ভোগ কর।

শ্রীশিবানন্দ

কারসিয়ং হইতে

রূপ নিতে চায় ছন্দে বাসনা
কি বর্ণে সাজাব ভাবিনু তাই।
লুকান গিরির সবুজ বসন
মেঘের ভিতর দেখিতে পাই।
সারাদিন হেথা একলা নিরালা
চেয়ে থাকি দূরে আপন মনে।
আকাশ-জোয়ারে মেঘ-তরঙ্গ
খেলিয়া চলেছে কাহার পানে।
কোথা হতে আসে, যাবে কোন দেশে
পথিকের কিছু ঠিকানা নাই।
তবুও আমার মনের কামনা
আমিও সেথায় চলিয়া যাই।
সাঁজের বেলায় আকাশের গায়
কে দেয় গাঁথিয়া তারার মালা।
ধীরে চাঁদ জাগে নীলিমা-সাগরে
ভরিয়া সুধায় রূপার থালা।
ঝর ঝর ঝর অঝোরে ঝরিছে
ধরণীর বুকে জোছনা রাশি।
পাহাড়ি ছেলেরা ঘরে ফিরে যায়
আপনার মনে বাজায়ে বাঁশী।
বসি বাতায়নে শুনি আনমনে
বাঁশরীর সেই মধুর তান।
কি জানি কি কথা মনে পড়ে যায়
আকুল হইয়া উঠিছে প্রাণ।

শ্রীসুনয়না দেবী

রাগমালা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাদ হইতে শ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দি ভাষায় শ্রুতি শব্দকে শোরৎ বলে। সঙ্গীত শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের সঞ্চরণ মার্গ লক্ষিত হয় না, স্বর মধ্যগত শ্রুতিগুলিরও সেইরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন অনুভূত হয় না। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব হয় মাত্র। শ্রুতি সম্বন্ধে সঙ্গীত শাস্ত্রে অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি দ্বাবিংশতিটি। শ্রুতি সকল সুরের অতি সূক্ষ্মাংশ মাত্র। কোনও গায়ক কিংবা বীণা অথবা সেতার-বাদক যখন গান করেন কিম্বা বীণাদি যন্ত্র বাদন করেন, তখন মূর্চ্ছনা অর্থাৎ এক সুর হইতে অন্য সুরের অবিচ্ছেদে প্রকাশ করিতে গেলে সেই উভয় সুরের মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম সুরাংশগুলি অনুভূত হয় তাহাকে শ্রুতি বলে। শ্রুতি যে সুরের সূক্ষ্মাংশ, তাহার প্রমাণ মনিষিগণ শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

সাতটি সুরের সমান সংখ্যায় শ্রুতি হয় না। বীণাদি যন্ত্রের পর্দ্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, খরজ (ষড়জ) এবং ঋষভের মধ্যস্থলে যে পরিমাণ স্থান আছে, গান্ধার এবং মধ্যমের মধ্যস্থানে সে পরিমাণ স্থান পাওয়া যায় না। এই কারণে স্থানের ন্যূনতা এবং আধিক্য অনুসারে অর্থাৎ যে উভয় সুরের মধ্যে অল্প পরিমাণ স্থান আছে, সেখানে শ্রুতির স্বল্পতা ও উভয় সুরের মধ্যে যদি অধিক স্থান দৃষ্ট হয় তবে সেইস্থানে শ্রুতিরও আধিক্য বুঝিতে হইবে। সপ্তসুর পরস্পর সমান পরিমাণে নাই; যদি সপ্তসুরে সমান পরিমাণে শ্রুতি থাকিত তাহা হইলে অন্য প্রকার ধ্বনি হইত। যদি সমান পরিমাণে সপ্তসুরে শ্রুতি থাকিত তাহা হইলে ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি যে কোনও সুর ইচ্ছা তাহাকে বিকৃত স্বরের সাহায্য ব্যতীত বাজান যাইতে পারিত। খরজ (অর্থাৎ স) ব্যতীত অন্য কোনও সুরকে আশ্রয় করিয়া বাজাইতে গেলে বিকৃত স্বর ব্যতীত কখনই স্বরগ্রাম বাহির হইবে না।

মূর্চ্ছনা

তিন সপ্তকের এক বিংশতিটি স্বরকে একবিংশতিটি (২১টি) মূর্চ্ছনা কহে। কিন্তু মূর্চ্ছনা দেখাইবার একটু কৌশল আছে। তিন সপ্তকের এক একটি সুর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখাইলে তাহাকে মূর্চ্ছনা বলা যায় না। একটি কোনও সুর হইতে অনুলোম বিলোম সহকারে অবিচ্ছেদ গতিতে স্বরান্তর প্রকাশ করাকে মূর্চ্ছনা বলে। মূর্চ্ছনাতে সুরের পরস্পর সংলগ্ন রাখা অতি কর্ত্তব্য; কেবল এক একটি সুর পৃথক পৃথক্ করিয়া দেখাইতে গেলে পরস্পর সুরের মধ্যে মধ্যে যে সূক্ষ্ম শ্রুতিগুলি আছে, সেইগুলি ভঙ্গ হইয়া রাগ-রাগিণীর রসের অনেক লাঘব হয়, এবং তাহাকে প্রকৃত মূর্চ্ছনা কহা যায় না। অঙ্গুলি দ্বারা, তার বিক্ষেপ, আকর্ষণ, স্পর্শ ইত্যাদি কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া বীণা এবং সেতারাদিতে মূর্চ্ছনা দেওয়া বিধি আছে এবং গুণিগণ উক্ত প্রকারে ওই সকল যন্ত্রে মূর্চ্ছনা দিয়া থাকেন। জগদীশ্বর-দত্ত কণ্ঠে সে নিয়ম সম্ভবে না, তাহা স্বভাব-সিদ্ধ, তাহা স্বভাবতঃই হয়। সুরের প্রকৃত ভাব অথবা বিকৃত ভাবে মূর্চ্ছনা হয়।

মূর্চ্ছনা না দিলে রাগ রাগিণীর উত্তম রূপে বিস্তার হয় না। পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছনাগুলির অনেক প্রকার বিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে যথা—ষট্পঞ্চাদশ (অর্থাৎ ৫৬) মূর্চ্ছনার মধ্য হইতে প্রত্যেক মূর্চ্ছনা সাত সাত প্রকারের হইয়া থাকে; ঐ সকল বিস্তার সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দা বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী সুখা।
আলাপা চেতি গান্ধার গ্রামেস্যুঃসপ্ত মূর্চ্ছনা ॥

সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত সুর-সাগর,
ভরত সূত্র এবং সঙ্গীত সময়-সার।

যদি মূর্চ্ছনা পাঁচ অথবা ছয় স্বরের হয়, তবে তাহাকে তান বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছে,—

যথা—তানাঃস্যুমূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়ুবতীকৃতাঃ।

সঙ্গীত রত্নাকর।

মতঙ্গ বলিয়াছেন—"নন্থ মূর্চ্ছনাতানায়োঃ কো ভেদঃ? ক্রমঃ—আরোহাবরোহক্রমযুক্তঃ স্বরসমুদায়োমূর্চ্ছনেত্যুচ্যতে। তানস্বাৎরোহক্রমেণ ভবতি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত রত্নাকর,

রোঁমারোলাঁর চিঠি

(২)

ভিলেনু (ভঁ)

ভি—অলগা

১৩ই জুলাই, ১৯২৭

প্রিয় মহাশয়,

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন পাঠের সাহায্যের জন্য আমি গোটা কতক খবর চাই। জগতে রামকৃষ্ণ-মিশনের কিরূপ প্রভাব? মোটা মুটি এর অধীনে কতগুলো মঠ, সেবাশ্রম, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আছে? বিদেশেই বা কোন্ কোন্ প্রধান দেশে আপনাদের প্রচার কেন্দ্র আছে? কতগুলি মাসিক বা দৈনিক কাগজ এবং প্রত্যেক কেন্দ্রের সভ্য সংখ্যাই বা কত? আপনাদের প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে এবং স্বামী বিবেকানন্দের দেহ-ত্যাগের পর ওর কত দূর প্রসার হয়েছে, এর একটা মোটামুটি বিবরণ ইউরোপীদের জানা বিশেষ প্রয়োজন।

আপনাদের যে কষ্ট দিলুম তার জন্যে ক্ষমা করবেন। আপনাদের কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন।

আর, আর

(৩)

৪ঠা অক্টোবর, ১৯২৭

প্রিয় স্বামী—

আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করে ১৭ই সেপ্টেম্বর খবরগুলি পাঠিয়েছেন এবং তার সঙ্গে যে সুন্দর চিঠিখানি লিখেছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না। জগতের ও ভারতের সামাজিক সমস্যা সমাধানে রামকৃষ্ণ-মিশনের স্থান সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতার অবকাশ ছিল তা বোধ হয় এমন সুন্দর ভাবে আর কিছুই পূরণ কবতে পারত না। আমি যে লেখার আয়োজন করছি তার শেষ অধ্যায়ে এ বিশেষ কার্য্যকরী হবে।

আমি কাজ এখনও আরম্ভ করিনি বা তার খস্‌ড়াও এখনও আমি তৈরী করতে পারিনি। এক বছরের কিছু ওপর আমি কেবল খাঁটি মাল মসলার যোগাড়ে আছি। এবং আমার প্রথানুযায়ী আমি সমস্ত আগুনটাকে ইন্ধন দিয়ে ঢেকে দেই যেন সবটা এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে। এত বড় একটা বিরাট বিষয় সম্বন্ধে খুব শীঘ্র কতকগুলো ছাপ দেওয়া বড় শক্ত ব্যাপার নয়; কিন্তু তা না-করে এ সম্বন্ধে আমার নির্জ্জনে চিন্তা করা উচিত; এবং আশা করি আগামী শীতে এ বিষয়ে আমি আমার সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করতে পারব।·········

আপনি যে কয়েক সংখ্যা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পাঠিয়েছেন তা আমরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়ছি। তার জন্যে ও রামকৃষ্ণ-মিশনের সাধারণ বিবরণীর (General Report) জন্যে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ রইলুম। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকই পেয়েছি, কিন্তু এখনও আমাদের এই কখানা বই দরকার—

১। জ্ঞান-যোগ

২। ভক্তি-যোগ

৩। মদীয় আচার্য্যদেব

৪। ইউরোপ ভ্রমণ

এই কখানা বই যদি আপনাদের পাঠান সম্ভব হয়, তা হলে আমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আপনার ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পেয়ে আপনাদের মিশনের মহত্ত্ব ও নীরব কর্ম্মের ফল-প্রসূ জ্ঞান আরও উপলব্ধি করতে পারছি। এই সকল চিন্তার দ্বারা আমি আমার চিত্তকে ভাবময় করতে চাই। আমার একটা পর্য্যবেক্ষণ আপনাদের কাছে জানাব। পাশ্চাত্যে বর্ত্তমানে যে কতকগুলো প্রবৃত্তি ও ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে তার সঙ্গে বেদান্তের মতবাদের যে একটা আত্মীয়তা আছে, এর প্রতিবাদ কেউ করতে পারবে না। কিন্তু এটা যে বেদান্তের বহুল প্রচার থেকে হয়েছে এটা আমি স্বীকার করি না। এই আত্মীয়তার হেতু মনুষ্য প্রকৃতির একই ভিত্তি এবং তার ওপর ইউরোপ ও ভারত একই আর্য্য জাতির বংশধর বলে। এ

সম্বন্ধটা যাই হোক, কিন্তু যা এসিয়া এবং ইউরোপের ভাষা (যাকে আর্য্য ভাষা বলে) ও চিন্তার একতা সম্পাদন করেছে, তার সন্ধান পেতে হলে আমাদিগকে অতি সুদূর কালে ফিরে যেতে হবে। প্যাসক্যাল একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'মানুষ যখন তাঁর দেখা না পেয়ে হতাশ হয় তখন ভগবানের কাছেই তারা বাণীর প্রত্যাশা করে।'

"যদি আমার সন্ধান না পাও, তা হলে আমায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর না।"

যখন আমি আপনাদের শাস্ত্র বা দর্শন বা কাব্য পাঠ করি, তখন একটা সত্য আমার হৃদয় বড় স্পর্শ করে—'আমি কোনও নূতন চিন্তা আবিষ্কার করিনি, আমার ভেতর যে গুপ্ত সত্য সকল রয়েছে, আমি কেবল তারই সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এ অনাদিকাল থেকে আমার ভেতর লেখা রয়েছে। কয়েক মুটো শস্য কেবল কয়েকজন বিশেষ-জাতির বিশেষ-লোকের হাতেই আছে এ কথা বল্‌লে সেই পবিত্র পুরাতন পুরুষকে ছোট করা হয়। সেই চিরন্তন সমগ্র মানব-ক্ষেত্রে নিজেকে পূর্ণভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন। তবে পৃথিবীর সব জায়গাই এমন সমান ভাবে উর্ব্বর নয় যে সব বীজই সমান ভাবে অঙ্কুরিত হবে। কোথাও ঐ বীজ বৃদ্ধি পেয়ে ফল প্রসব করে আর কোথাও তা সুপ্ত থাকে, কিন্তু বীজ সব জায়গায় রয়েছে। যারা সুপ্ত আছে কালে তারাও জাগবে, আর, যারা জেগে রয়েছে তারা আবার ঘুমোবে। শক্তি, এক জাতি থেকে আর এক জাতিতে, এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে খেলে বেড়াচ্ছেন। কোনও জাতি বা মানুষ তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। কিন্তু সেই অনাদি অগ্নি প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন—একই অগ্নি। আমাদের বাঁচা কেবল তাঁকে প্রজ্জ্বলিত করবার জন্যে।

ভারত ও তার চিন্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা সত্বেও আমি ছেলে বেলা থেকে বেদান্তের দুটো সত্যের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলাম। তারা কি করে আমার মধ্যে প্রবেশ করলে? তোমার কল্পনার অতিরিক্ত ভাবে তা জগতে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে; খৃষ্টীয় রহস্যবাদে (যার উৎপত্তি-স্থল প্রাচ্য), এবং কতকটা হেলেনী অনুশীলনের ভেতর আমরা এর পরিচয় পাই; হেলেনীয়া

পাইথাগোরাস থেকে আরম্ভ করে, প্লেটোর ভেতর দিয়ে প্লটিনাস পর্য্যন্ত তাদের মননশীল ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে ঐ সত্য পেয়েছিল, এবং সে বৃক্ষের মূল এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আবার দেখুন, ঐ বিজ্ঞানবাদের অপূর্ব্ব উৎস আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বাত্মবাদ (Pantheism) রূপে পেয়েছি। সংগীত বলপ্রদ জার্ম্মান সংগীত এবং সকলের ওপর বিতোভেনের তেজঃপূর্ণ আধ্যাত্মিক সঙ্গীত আমাদের কাছে দর্শন শাস্ত্রের মত, ভাষাহীন ধর্ম্ম ব্যাখ্যার মত—যৌগিকসত্যের প্রকাশের মত। এ সকল যদি আপনার জানা থাকত তা হলে দেখতে পেতেন, প্রতীচ্যেও কেমন অপূর্ব্ব সংযমের মধ্য দিয়ে মনকে সেই চিরন্তন পুরুষে একীভূত ও বিলীন করবার চেষ্টা হয়েছে। ক্যানটাটা বা জে, এস, ব্যাচ এর 'মাসে'র (প্রার্থনা বিশেষ) সুরের ছন্দ-লীলা—যাতে জার্ম্মানেরা নিজেদের হারিয়ে ফেলে, নীরব গভীরতায় এবং বিভোর উন্মাদনায় ভারতের শ্রেষ্ঠ সামের সমকক্ষ। চিন্তা-জগতের পবিত্র স্রোতে আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর হল্যাণ্ডের আহুদী স্পিনোজার চিন্তাধারাকে যুক্ত করতে চাই, যার পরিপূর্ণ বিকাশ এক শতাব্দী পূর্ব্বে হয়েছিল গেটের ভেতর দিয়ে—যে ভাব এখনও আমরা নিঃশেষিত করতে পারিনি, এবং যার সঙ্গে আমরা আরো যোগ করতে চাই উনবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান বিজ্ঞানবাদকে।

মানবের দেবত্ব এবং জীবনের আধ্যাত্মিকতা এই দুটো বর্ত্তমান প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণের এবং সর্ব্বকালের মানবের ধর্ম্মে আছে এবং ছিল। এমনকি এও বলা যেতে পারে, পূর্ব্বোক্ত দুটো সত্যের প্রথমটা এমন একটা চিন্তাশীল "দলের" আদর্শ ছিল যারা জগতে ফরাসী-বিপ্লব ঘটাতে পেরে ছিল। যদিও এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তার প্রত্যেক হঠকারিতা একটা দুরন্ত অপরিচিত জনসংঘকে রক্ত ও অর্থপিপাসু করে তুলেছিল আর সেই মতটা একদল বিশিষ্ট লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আমার পূর্ব্বপুরুষের ভাব শিশুকালে আমার মধ্যে এসে বর্ত্তেছিল। আবার কালে আমার কাছ থেকে এ অন্যে সংক্রমণ করবে।

গভীর চিন্তাশীল সৎ-ইউরোপ—সৎ-এসিয়ার ভগ্নী। একই ঈশ্বরের রক্ত উভয়ের মধ্যেই প্রবাহিত। কিন্তু এসিয়া দেখতে পাচ্ছে না তার ভগ্নী কী নীরব সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।.........

আপনাদেরই একজন বিশ্বস্ত ভ্রাতা

রোঁমা রোলাঁ।

প্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যার্থী ভবন (ষ্টুডেণ্টস্ হোম), কলিকাতা, ১৯২৭ সালের কার্য্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য দরিদ্র ছাত্রদের এখানে রাখিয়া তাঁহাদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে এইরূপ ১৭টি বিদ্যার্থী উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছেন। আরো ৬টি বিদ্যার্থী এখানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ২ জন নিজেদের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার এবং ৪ জন আংশিক ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করিয়াছেন। চরিত্র গঠিত হইয়া ছাত্রগণ যাহাতে আত্মকল্যাণ এবং ভবিষ্যতে দশের ও দেশের সেবা করিতে পারেন সেইরূপ শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়—ইহাই বিদ্যার্থী ভবনের বিশেষত্ব।

গত বর্ষে একটি ছাত্র অনার্সে বি-এ পরীক্ষায়, তিনটি ছাত্র প্রথম বিভাগে আই-এস সি পরীক্ষায়, এবং তিনটি ছাত্র প্রথম বিভাগে ও একটি ছাত্র দ্বিতীয় বিভাগে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে সাধারণ বিভাগে ১৯২৬ সালের উদ্বৃত্ত লইয়া মোট আয় ১১৪২৪৷৷৶১৫ এবং মোট ব্যয় ৬৯.৮৮১০, গৃহনির্ম্মাণ বিভাগের জমা ১৬৮৯৬ টাকা তন্মধ্যে ২৩৮৪৷৵১৫ বেঙ্গল ন্যাসানাল ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল সুতরাং তাহা একরূপ জলে পড়িয়াছে।

স্বামী নির্ব্বেদানন্দের তত্ত্বাবধানে এই কয়েক বৎসরে বিদ্যার্থী ভবন যথেষ্ট সফলতা দেখাইয়াছে। এই গঠনমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উপর সকলের সহানুভূতি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নবযুগ—সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, সম্পাদক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কার্য্যালয়—৮৩নং দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।

বঙ্গলক্ষ্মী—মহিলাদের উপযোগী উচ্চশ্রেণীর সচিত্র মাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য ৩৷০, সম্পাদিকা—শ্রীহেমলতা দেবী, কার্য্যালয় ৪৫নং বেণেটোলা লেন।

ভবিষ্যৎ—পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০, সম্পাদক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম, বি, এল। কার্য্যালয়—উকীল পট্টি, শিলচর।

সমন্বয়—সাপ্তাহিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ২৲, সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কার্য্যালয়—৪নং উইলিয়মস্ লেন।

হিন্দুমিশন—পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ১৲, সম্পাদক—স্বামী নগেশানন্দ গিরি। কার্য্যালয়—৭নং বেচু চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট।

যুগদীপ—সাপ্তাহিক পত্র, বার্ষিক মূল্য ২৷৷০, সম্পাদক—শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়। কার্য্যালয়—বাঁকুড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন দুর্ভিক্ষ কার্য্য

আমরা পূর্ব্ব আবেদন পত্রে 'উদ্বোধনে'র পাঠক-পাঠিকাকে জ্ঞাত করাইয়াছি যে, আমরা বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানায় দুর্ভিক্ষ কেন্দ্র খুলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। উহার সাহায্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তারিখ	গ্রাম সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ	
			মণ	সের
১২।৫।২৮	১৩	২৩০	১২	১২
১৯।৫।২৮	২৯	৩৩৭	১৭	৯
২৭।৫।২৮	৪৪	৪৮৮	২৫	৫
৩।৬।২৮	৬৮	৭০০	৩৫	১৮
১০।৬।২৮	৭৪	৮১০	৪১	২৫

যদিও আমরা সাহায্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছি তথাপি ঠিক ঠিক সাহায্য দিতে হইলে আরও অর্থের প্রয়োজন। অধুনা আমরা বাঁকুড়ার পূর্ব্বদিকে কোতুলপুর থানায় আর একটি ছোট কেন্দ্র খুলিতে ইচ্ছুক; এবং অর্থের সুগমের সহিত আমরা তদন্ত করিয়া অপরাপর জেলায়ও সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার ইচ্ছা করি। যাঁহারা অর্থ, বস্ত্র এবং চাউল সাহায্য করিবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ পোঃ, হাওড়া;

(২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ১৮২।এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(স্বাঃ) শুদ্ধানন্দ

কথা-প্রসঙ্গে

প্রথম প্রশ্ন হচ্চে, পুরাতনকে নূতনের পরিচ্ছদে সাজান যায় কি না? উত্তরে আমরা বলি, এক দিক দিয়ে সেটা অসম্ভব হলেও আর এক দিক দিয়ে সেটা সম্ভব। অতি আদিম কালে ব্রহ্মা একটা সত্য নির্ণয় করে তাঁর শিষ্যদের বল্লেন; অসুর তার ভাবানুযায়ী একটা ব্যাখ্যা করে সন্তুষ্ট রইল এবং সেইটে সমাজে বেশ চল্ল। কিন্তু ইন্দ্র শতবর্ষ ধরে সে বিষয় চিন্তা করে তার আর একটা নূতন অর্থ আবিষ্কার করলেন। এখানে আমরা বলতে পারি, পুরাতন কথাই নূতন কলেবরে প্রকাশ পেলে। আবার আর এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে, এটা অসম্ভব, যেমন জর্ম্মান শিল্পী ভোন ইডে (Von Uhde) বলচেন,

"Could you imagine a sacred story with modern costume, a St. Joseph in a coat of pilot cloth, a Virgin in a dress with a Turkish shawl thrown over her head?...And yet the old painters represented all biblical and sacred stories with the costume of their own time"

সেণ্ট জোসেফ্ কে নাবিকের বেশে বা ভার্জ্জিনকে শাল মুড়ে বর্ণনা করা যায় না। তবুও প্রাচীনেরা বাইবেলের গল্প গুলো তাঁদের সময় কার পরিচ্ছদে সাজিয়েছেন। কিন্তু অনেক সময় তা ভাল না দেখালেও সে দিন এক খানা বই পড়ছিলুম "The man Nobody knows বলে, তাতে খৃষ্টকে নিছক কর্ম্মীর পরিচ্ছদে সাজান হলেও

বড় মধুর আনন্দ-রস পাওয়া গেল। আমরা বলি একই সত্য মানবের সমস্ত চিন্তা ও চর্চ্চার ধারার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপ নেওয়ায় বোধ হচ্চে যেন প্রাচীন হতে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিত্তির হেতু, আদি-প্রকৃতির স্বাধীন লীলা-বিলাস শিল্পীদের কোন স্থির ও স্থায়ী ধারাকে (convention) শিরোধার্য করে নিতে না দেওয়া।

মূল সত্যকে যারা জানতে চায় তারা পরিণাম গুলোকে বাদ দিয়ে নেতি মার্গ অবলম্বন করবেই। আর যারা ভাবে সেই সত্যই এই পরিণামের মধ্যে লীলায়িত হয়ে রয়েছেন, সীমার মধ্যে সেই অসীমই খেলা করছেন তারা প্রতি পরিবর্ত্তনকে সেই চিরন্তনীর নূতন দান মনে করে তাকে বরণ করে নেবে—এ হল ইতি মার্গ। একই মহাপ্রাণের যখন শীর্ণকায়া 'তাপসী' এবং বিলাসোজ্জ্বল 'রাধা'র মধ্যে বিকাশ, 'জ্ঞান'-পথ এবং 'আনন্দ'-পথ যখন একই 'সত্য'কে ধরবার চেষ্টা, তখন তপস্যা ও বিলাসের মধ্যে বিরোধ কোথায়? শিল্প সাহিত্যের ভাব ধারা পিরামিড থেকে তাজমহল পর্য্যন্ত চলে এসেছে। তারই একটা যুগে খৃষ্টীয় আর্টের জরাজীর্ণ type প্রকাশ পায়; কেন না তারা নেতি-মার্গী ছিল বলে মনে করত দেহটা একটা পাপের আসন একটা মৃত্যুর ছায়া। তার পরেই এল ইতি-মার্গী গথিক আর্ট। তারা দেখালে শিল্পে অরূপের মূর্ত্ত রূপ, প্রাণ বেদীতে মহা প্রাণের লীলাভঙ্গী। সত্যকে অবলম্বন করে জ্ঞান ও আনন্দের তরঙ্গ চলেছে—কখনও উঠছে কখনও নামছে। একটা তরঙ্গ শীর্ষে লেখা—

"This body is dead because of sin but the spirit is life because of righteousness. If ye live after the flesh ye shall die but if ye, through the spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live (Romans VIII),

তখনই আবার সেটা ছায়াচিত্রের মত বদলে গিয়ে আর একটা তরঙ্গের আবির্ভাব হল যার ওপর লেখা—

"Christianity disturbed the harmony between man and nature and introduced a sense of discordance by proclaiming to man a higher spiritual law in the light of which his inborn nature becomes a sinful thing which he has to overcome" Leubeck

এই দুটো ভাব নিয়ে মানব চরিত্র, কেউ কাকেও একেবারে নিঃশেষ করে মুছে ফেলতে পারবে না, তা করতে গেলেই আর একদিক দিয়ে তা নূতন রূপে ফুটে উঠবেই। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে, নেতি ও ইতির আলো-ছায়ার লুকোচুরির মধ্যেই নূতনের আগমন।

খৃষ্টীয় আর্টিষ্টরা আবার এককালে বৌদ্ধ, মিশরীয়, পারসিক ও যবন শিল্পের স্বাভাবিকতার সমালোচনা করে তাকে অচল করে দেন। তাঁরা শিল্প সাহিত্যের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান করে বল্লেন, যে সব সৌন্দর্য্য, সুখপ্রিয়তা, কোমলতা ও সৌকুমার্য্য সন্দেহের বস্তু, কারণ সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব ভোগ-জীবনের দিকে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দিকেই দেহীকে প্রলুব্ধ করে। তাই তাঁদের আর্ট স্বেচ্ছাকৃত শ্রীহীনতাই স্পষ্ট।

এর প্রতিবাদ করলে গথিক আর্ট—অসম্পূর্ণ প্রাণের কি গভীর যাতনা তা চিত্র কলায় ফুটিয়ে তুলে। ইতিহাসটাকে যদি একটা গোটা বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে জাগরণ ও স্বপনের মত, শ্রম ও বিশ্রামের মত, নেতি ও ইতির সামঞ্জস্য করে অনন্তের পথে মানুষকে চলতেই হবে। আর তা যদি না পার প্রাচীনকে যদি একেবারে উপেক্ষা কর, তবে দেখ, তোমার ঐ গর্ব্বের বস্তু যে রিণেসাঁস যা এককালে খ্রীষ্টীয় বিধান ধ্বংস করে প্রোটেষ্টাণ্টিজ্‌ম, ইভাঞ্জেলিজিমের সৃষ্টি করে, তাই আজ ঐহিক জীবনকে একমাত্র সত্যবস্তু বলে গ্রহণ করে, সমাজ সভ্যতা ব্যক্তি ও সমষ্টির মূল্য ও দায়িত্ব একেবারে কঠোর আদিম নগ্নতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে ইভ্‌ ও লট্‌ দুহিতায় সৃষ্টি করতে চায় কেন?

ঠিক এমনি ঘটেছিল ভারতে। যজ্ঞীয় সোম ও সহধর্ম্মিনী, প্রজাপতি-ব্রত ও অশ্বমেধের অশ্লীলতার চাবুক হয়ে এলেন তথাগত। সে কঠোরতার বিপরীত পেষণে 'ধর্ম্ম' নবকলেবর ধারণ করলেন মহাযানীদের 'প্রজ্ঞা'-

রূপে। এই প্রজ্ঞারই শক্তি আজও শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মনীষার পরিচয় দিচ্চে। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতার ফলে কলুষের আবিলতায় তা নিজের মৃত্যু নিজে বরণ করে নিলে। কিন্তু তার যেটা সত্য সেটাত অবিনাশী। সেটার গলাটিপে মারবার জন্য ব্রাহ্মণরা যখন চেষ্টা করলেন তখন তা নিরুপায় হয়ে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্যের আকার ধরে ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। ক্রমে বন্দীর প্রতি বিজেতার নিষ্ঠুরতা এমন চরম হয়ে দাঁড়াল যে তার বিদ্রোহিতা আজ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে শূদ্রের বেদাচার্য্যত্ব ও অসূর্য্যম্পর্শার অভিনেতৃত্বের মধ্য দিয়ে।

স্বাভাবিকতা মানুষ চায় কেন? কেন কবি দুঃখে বল্লেন, "The world is too much with us, getting and spending." "প্রকৃতির সঙ্গে অনেকদিন মানুষের সম্বন্ধ ছিল না হঠাৎ ঐতিহাসিক কারণে সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে তারা প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল"—কিন্তু সিলারের ঐ "হঠাৎ ঐতিহাসিক কারণ"টা কি?—স্বার্থপর সভ্যতার পেষণ, ভেদনীতি, অত্যাচার-অবিচার, বিধি-নিষেধ, convention, bluffing, drawing, concocting, mask, hypocracy, treachery, espionage আজ মানুষকে তার সমাজের ওপর অশ্রদ্ধা এনে দিয়েচে। স্বাধীন রস-বোধ একদিকে যেমন আনন্দ দেয় আর একদিকে তেমনি নরকের সৃষ্টি করে। তাই আজ মানুষ ক্লান্ত হয়ে তার আরণ্য প্রকৃতির অনাঘ্রাত কুসুমের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। Do not steal প্রভৃতি negative ধর্ম্ম ত্যাগ করে অরণ্য, ঊষা, সূর্য্য, সমুদ্র, সোমের সুষমায় পূর্ণ বৈদিক গীতির আশ্রয় নিতে চায়।

যবন শিল্প-সাহিত্যই আজ ইউরোপী শিল্প-সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। তারা বাস করেছিল একটা ছোট্ট অনুর্ব্বর দেশে, তাই তাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, দেহ ছাড়া অপর কিছুতে সৌন্দর্য্য খুঁজে পায়নি। পেশী বা মুখের ভাবের ভেতর দিয়ে না হলে গ্রীকচিত্ত কোনও সৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট হত না। তারা প্রকৃতিকে বস্তুর সৌন্দর্য্য-সত্তার রূপে কখনও গ্রহণ করে নি বা তাকে চেতনও কখনও ভাবে নি। তাই তার সব ধর্ম্ম-কলা সমাজ গড়বার জন্যই পাগল। কিন্তু দুহাজার বছর পর আজ সে হয়রান হয়ে

প্রাকৃতিক আহ্বানের আকর্ষণ অনুভব করচে। মানুষের কাছে মানুষ যখন শঠতা ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু পেলে না, তখন তার কাছে "শকুন্তলা" কত মধুর বল দিকি ?

উদ্গলিত দর্ভকবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্ত্তনাঃ ময়ূরাঃ।
অপসৃত পাণ্ডুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণি ইব লতাঃ ॥

পতিগৃহে গমনা শকুন্তলাকে দেখে শোকে ময়ূরী নৃত্য ছেড়েচে, লতায় অশ্রু গড়িয়ে পড়চে—এমন প্রকৃতি প্রেম আর কোনও দেশের কাব্যে আছে কি ? ইউরোপ আজ বুঝতে পারচে কেন সাধু সন্ন্যাসী বনে ঘুরে বেড়াতে ভাল বাসেন। ফ্রিডল্যাণ্ডার (Fried lander) স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন, "It would be difficult to find evidence of travellers going to mountain country in quest of beauty before the eighteenth century."

এই প্রকৃতি-বোধের হেতু সমাজে অত্যাধিক কৃত্রিমতার প্রসার। এই কৃত্রিমতার ওপর রুশোর অজস্র আক্রমণ ও প্রতিবাদই দেখিয়ে দিলে আদিম প্রকৃতির সরলতা। প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হয়ে দূরে মানুষ গ্যাছে বলেই আজ তার ভেতর আনন্দের এত অনুসন্ধান। মানুষ মানুষের ওপর কি করে শ্রদ্ধা হারালে তা জোলা, ইবসেন, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, টুর্গেনিফ্, টলষ্টয় সমাজের মুখোস খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশের নবরসিকরাও অজ্ঞাতসারে সেই একই কাজ করছে। তারা যেটাকে প্রতিপন্ন করতে চাইচে সেটাই সেটার বীভৎসতা প্রকাশ করে দিচ্চে।

কিন্তু বৈদিক প্রকৃতিবাদ ও আধুনিক স্বভাববাদে ঢের তফাৎ। তারা অন্তরের সৌন্দর্য্যই বাহিরে দেখেছিল। তারা বলত, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তাঁরই আলোকে জগৎ আলোকিত। পতি ও পত্নী এত সুন্দর কেন ? তিনি তাদের মধ্যে আছেন বলে। কিন্তু আধুনিক জড়সর্ব্বস্ব স্বভাব বাদ জড়ের সৌন্দর্য্যে নিজের মনকে ভোলাবার চেষ্টা করায় সে ভ্রম শীঘ্রই তার দূর হবে। মন্দের দিকটা বিশ্লেষণ করে ভদ্রবেশী সমাজের বর্ব্বরতাকে লোক চক্ষুর সামনে ধরার শ্রম তাদের শীঘ্রই ব্যর্থতায়

পরিণত হবে। অসংযমী হয়ে তথাকথিত শালীনতার ধ্বংস করতে গিয়ে যে ট্রাজিডির সৃষ্টি হবে তাতে জুলিয়েট বা মোপাসাঁর 'উন্‌ভি'ও হার মেনে যাবে। শিলার যাকে নীতিগত বলেছেন, বাস্তবিক সেটাও ইন্দ্রিয়জ, কেন না সে রূপ বা রসের উৎস্ কোনও অরূপ বা "রসোবৈস" নয়। ফলে দাঁড়াচ্ছে, ইবসেনের Ghosts, হোপটম্যানের Friedensfest, ষ্ট্রীণ্ডবার্গের Ranch, গোর্কির Lower Depths প্রভৃতি প্রতি শিল্পে ও কাব্যে কেবল যন্ত্রণা ও অস্থিরতা, কেবল মর্ম্মন্তুদ যাতনা ও পীড়াকেই স্পষ্ট করে তুলছে। আর্টের কাজ কী?—বর্ত্তমানের মধ্য দিয়ে মানুষকে ভবিষ্যতের উন্নত আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া। আর্টের পুষ্প হবে অনাঘ্রাত কিন্তু বড়ই মধুর, আর্টের বিহঙ্গ-কণ্ঠ হবে নূতন কিন্তু বিনোদী—যা মানুষের মনে ভবিষ্যতের মধ্যে একটা বড় জিনিষ পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়—সে এমন একটা প্রামাণ মূর্ত্তি চোখের সামনে ধরবে, যার কাছে আর সব নকল।

ছবি

মানস মন্দিরে মম এতকাল ধরি
অস্তমিত রশ্মি যার ছিল আলো করি
এবে তাহা চিত্রপটে হয়ে সুরঞ্জিত
নয়নের তৃপ্তিদান করে অবিরত।

শ্রীঅরবিন্দনাথ ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(১৫)

ইংরাজীর অনুবাদ

১৪ গ্রে কোর্ট গার্ডেনস্
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার, এস. ডব্লিউ
১১ই নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

খুব সম্ভবতঃ আমি ১৬ই ডিসেম্বর বা তার দু একদিন পরে রওনা হব, এখান থেকে ইটালি গিয়ে, সেখানে দু একটা জায়গা দেখে, তারপর নেপল্‌সে ষ্টীমার ধরব। * * *

রাজযোগের প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেচে, দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্চে। ভারতবর্ষ ও আমেরিকাতেই সব চাইতে বেশী কাটতি। * * *

ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

তোমাদের—
বিবেকানন্দ

ইংরাজীর অনুবাদ

৩৯ ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট,
লণ্ডন, এস, ডব্লিউ
২০শে নভেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় অ—

১৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড ছেড়ে আমি ইটালী যাচ্চি, সেখান থেকে নেপল্‌সে জার্ম্মান দেশীয় লয়েড এস, এস, প্রিন্স রিজেণ্ট লিওপোল্ড নামক ষ্টীমার ধরব। আগামী ১৪ই জানুয়ারী ষ্টীমার কলম্বো গিয়ে লাগবে, সিলোনে অল্পস্বল্প দেখে তারপর মাক্রাজ যাব।

মিঃ সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী আলমোড়া সহরে আশ্রম খুলতে যাচ্চেন,

তাই হবে আমার হিমালয়ের কেন্দ্র, আর পাশ্চাত্যবাসী শিষ্যেরা সেখানে থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবে। গুডুইন একজন অবিবাহিত যুবক, আমার সঙ্গে বেড়াতে ও থাকতে যাচ্চে, সে ঠিক সন্ন্যাসীরই মত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আগেই আমার কলকাতা পৌঁছুবার ভারি ইচ্ছে * * *। কলকাতা আর মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খুলবো —এই হচ্চে আমার বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি, সেখান থেকে প্রচারক তৈরী করতে হবে। কলকাতায় কেন্দ্র খোলবার মত টাকা পয়সা আমার হাতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানেই আজীবন কাজ করে গেচেন, সুতরাং কলকাতার ওপরেই আমার প্রথম নজর দিতে হবে। মাদ্রাজে কেন্দ্র খোলবার জন্যে টাকা পয়সা, আশা করি, ভারতবর্ষ থেকেই উঠবে।

এই তিনটি কেন্দ্র থেকেই এখন আমরা কাজ আরম্ভ করব, পরে বোম্বাই ও এলাহাবাদে কেন্দ্র খোলা যাবে, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, এই সকল কেন্দ্র থেকে—শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে প্রচারক পাঠাব। এই হচ্ছে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। প্রাণ দিয়ে কাজ করে যাও।

* * * ভারতবর্ষে এখন আমাদের একটি মাত্র ইংরাজী মাসিক পত্র আছে। দেশীয় ভাষাতেও আর কয়েকটি বের করা যেতে পারে। এই ধরণের কাগজ খুব অল্প সংখ্যক লোকেই পড়ে * * * ভারতের কাগজ ভারতের লোকেরাই রাখবে, সব দেশের ও সব জাতির লোকের পড়বার মত একখানি কাগজ বের করতে হলে, সব জাতিরই কতকগুলি লেখক চাই, কিন্তু তাতে লাখ খানেক টাকা বছরে খরচ।

সব দেশের লোককে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই শুধু ভারতবর্ষে নয় একথা যেন কিছুতেই ভুলো না।

উইম্বেলডনের মিস্ এম, নোবল্ একজন খুব বড় কর্ম্মী * * *

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

রাজযোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় পাঠ

রাজযোগের নাম অষ্টাঙ্গযোগ, কারণ, এর প্রধান অঙ্গ আটটি। যথা—

প্রথম। যম। যোগের এই অঙ্গটি সব চাইতে দরকারী। সারা জীবনকে এ নিয়ন্ত্রিত করে। এ আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

(এক) কায়মনোবাক্যে হিংসা না করা।

(দুই) কায়মনোবাক্যে লোভ না করা।

(তিন) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করা।

(চার) কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া।

(পাঁচ) কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ হওয়া। (অপ্রতিগ্রহ)

দ্বিতীয়। নিয়ম। শরীরের যত্ন, স্নান, পরিমিত আহার ইত্যাদি।

তৃতীয়। আসন। মেরুদণ্ডের ওপর জোর না দিয়ে মাথা ঋজু ভাবে রাখা।

চতুর্থ। প্রাণায়াম। প্রাণ বায়ুকে আয়ত্ত করবার জন্যে শ্বাস প্রশ্বাসের সংযম।

পঞ্চম। প্রত্যাহার। মনকে বহির্মুখী হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করে কোন জিনিষ বোঝবার জন্যে বারংবার বিচার।

ষষ্ঠ। ধারণা। কোন এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।

সপ্তম। ধ্যান। কোন এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

অষ্টম। সমাধি। জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি—আমাদের সাধনার লক্ষ্য।

যম ও নিয়ম সারা জীবন ধরে আমাদের অভ্যাস করতে হবে। জোঁক যেমন একটা ঘাস দৃঢ় ভাবে ধরে, তবে আর একটি ছেড়ে

দেয় তেমনি ওপরের ধাপে ওঠবার আগে নীচের ধাপটাকে আমাদের বেশ করে আয়ত্ত করা চাই।

এর পরের প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণের নিয়মণ। প্রাণ কি করে চিত্ত ভূমির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়ে যায়, রাজযোগে তা বলা আছে। এটা হচ্ছে সমস্ত দেহ যন্ত্রের মূল চক্র। প্রাণ প্রথমে ফুসফুসে, ফুসফুস থেকে হৃদয়ে, হৃদয় থেকে রক্ত প্রবাহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে, সব শেষে মস্তিষ্ক থেকে মনে কাজ করে। মানুষের ইচ্ছা শক্তি দেহের ওপর যেমন ক্রিয়া করতে পারে তেমনি দেহের ক্রিয়াও ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। আমাদের ইচ্ছাশক্তি বড়ই দুর্ব্বল, আমরা এতই বদ্ধ যে, সেই শক্তিকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করি না। অধিকাংশ কাযের প্রেরণা আমাদের বাইরে থেকে আসে, বহিঃ প্রকৃতি আমাদের অন্তরের সাম্য ভাব নষ্ট করে কিন্তু আমরা তার সাম্যভাব নষ্ট করতে পারি না; যেটা আমাদের পারা উচিত, কিন্তু এ সবই ভুল, বহিঃ প্রকৃতির চাইতে বেশী শক্তি সত্য সত্যই আমাদের ভেতরে আছে।

যাঁরা নিজেদের ভেতর চিন্তারাজ্য জয় করেছেন তাঁরাই খুব বড় সাধু, তাঁরাই আচার্য্য, তাঁদের কথার শক্তিও তাই এত বেশী, দুর্গের উচ্চ চূড়ায় আবদ্ধ কোন মন্ত্রিকে তাঁর স্ত্রী গুবুরে পোকা, মধু রেশমের সূতা, দড়ি ও কাছি দিয়ে উদ্ধার করেছিলেন—এই রূপকে সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে—প্রাণের নিয়মণ থেকে কি করে ক্রমে ক্রমে মনোরাজ্য জয় করা যায়। এই প্রাণের সাহায্যেই একটার পর একটা শক্তি আয়ত্ত করে আমরা একাগ্রতারূপ রজ্জু ধরবো, আর সেই রজ্জুর সাহায্যে দেহ কারাগার থেকে উদ্ধার হয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ করবো। মুক্তি লাভ করে তার সাধনগুলি আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

প্রাণায়ামের অঙ্গ তিনটি।

প্রথম। পূরক। শ্বাস গ্রহণ।

দ্বিতীয়। কুম্ভক। শ্বাস রোধ।

তৃতীয়। রেচক। শ্বাস ত্যাগ।

দুটি শক্তি প্রবাহ মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে এসে মেরুদণ্ডবয়ে তার শেষ ভাগে পরস্পরকে অতিক্রম করে ফের মস্তিষ্কে ফিরে যায়। এর একটির নাম সূর্য্য পিঙ্গলা)। পিঙ্গলা মস্তিষ্কের দক্ষিণার্দ্ধ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের বাঁদিকে মস্তিষ্কের ঠিক নিম্নে একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে, আবার মেরুর নীচে চারএর অঙ্কের মত আকারে আর একবার পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়।

অন্য শক্তি প্রবাহটির নাম চন্দ্র (ইড়া), এর গতি পিঙ্গলার ঠিক উল্টো এবং চতুর্থ স ‍্যার অপরাদ্ধ আকার সম্পূর্ণ করে। দেখতে চারএর ৪) ম‍ ত লণ্ড এর নীচের দিকটা ওপরের দিকের চাইতে অনেকট লম্ব এই দুটো প্রবাহ দিনরাত্রি বইছে, আর বিভিন্নকেন্দ্রে, যাকে অ ম ' চক্র (Plexus) বলি, এরা জীবনী শক্তি সমূহ সঞ্চয় করে, কি ' ' আমরা প্রায় টেরই পাই না। একাগ্র মনের দ্বারা এই শ ক সমূহ এবং সমস্ত শরীরে তাদের ক্রিয়া আমরা অনুভব কর ' পারি। এই সূর্য্য (পিঙ্গলা) এর চন্দ্রের (ইড়া) প্রবাহ শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সেই জন্যে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই সমস্ত দেহটাকে আয়ত্ত করা যায়।

কঠ উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়দের ঘোড়া এর বিষয়কে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর আত্মা হচ্ছেন সেই রথের রথী। সারথি যদি বুদ্ধি সহায়ে ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে তা হলে কখনও লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না, দুষ্টাশ্বের মত ইন্দ্রিয় গুলো রথকে যেখানে খুসী টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু এই দুটি শক্তি প্রবাহ ইড়া ও পিঙ্গলা দুষ্টাশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগাম স্বরূপ। সারথিকে এদের দমন করা চাই, দমন করতেই হবে। নীতি-পরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হলে আমাদের কর্ম্ম সমূহকে আমরা কিছুতেই অধীনে আনতে

পারব না। নীতি-শিক্ষা সমূহ কি করে কর্ম্মে পরিণত করতে পারা যায় যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতি-পরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য। জগতের বড় বড় আচার্য্য মাত্রেই যোগী ছিলেন এবং ইড়া ও পিঙ্গলাকে তারা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ দুটিকে যোগীরা মেরুর তল দেশে সংযত করে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন আর তখনই ইড়া ও পিঙ্গলার প্রবাহ জ্ঞান-প্রবাহে পরিণত হয়। যোগী ছাড়া কারও এ হতে পারে না।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে দ্বিতীয় পাঠ সকলের পক্ষে এক রকম সাধন নয়। প্রাণায়াম একটা ছন্দের তালে তালে করতে হবে এবং তা করবার সহজ উপায় হচ্ছে গণনা করা, তবে সেটা একেবারে যন্ত্রের মত হয়ে পড়ে তাই গণনার নির্দ্ধারিত সংখ্যায় আমরা পবিত্র 'ওঁ' কার মন্ত্র জপ করবো।

ডান নাক বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে চারবার ওঁকার নাম জপ করতে করতে বাম নাকে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হয়; এরই নাম প্রাণায়াম তারপর তর্জ্জনীর দ্বারা বাম নাক চেপে ধরে দুটি নাকই বন্ধ করে, মাথাটিকে বুকের ওপর অবনমিত রেখে মনে মনে আটবার 'ওঁ' কার জপ করতে করতে শ্বাস রোধ করে রাখতে হয়।

তারপর মাথা ফের সোজা করে বুড়ো আঙ্গুল ডান নাক থেকে উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে চারবার 'ওঁ' কার জপ করতে করতে শ্বাস ফেলতে হয়।

যখন শ্বাস ফেলা শেষ হয়ে যাবে তখন ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দেবার জন্য পেট সঙ্কুচিত করবে। তারপর বাম নাক বন্ধ করে চারবার 'ওঁ'কার জপ করতে করতে ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে হবে। পরে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাক চেপে ধরে মাথা অবনমিত রেখে শ্বাস রোধ করে আটবার 'ওঁ'-কার জপ করবে। তারপর আবার মাথা সোজা করে বাম নাক খুলে দিয়ে চারবার 'ওঁ'কার জপ করতে করতে শ্বাস ত্যাগ করবে। সেই সময় আগের মত পেট সঙ্কুচিত করা চাই। যখনই বসবে, এই

রকম দুবার করবে অর্থাৎ ডান নাকে দুবার ও বাম নাকে দুবার মোট চারবার প্রাণায়াম করবে। বসবার আগে প্রার্থনা করে নিলে ভাল হয়। এক সপ্তাহ ধরে এই রকম অভ্যাস করা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে প্রাণায়ামের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস গ্রহণ, রোধ ও ত্যাগের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে অর্থাৎ যদি দুবার প্রাণায়াম কর তা হলে শ্বাস নেবার সময় দুবার ও ফেলবার সময় দুবার ও কুম্ভকের সময় বার (১২) বার 'ওঁ'কার জপ করতে হবে, এই প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা আমরা আরো বেশী পবিত্র, নির্ম্মল ও আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ হব। বিপথে যেয়োনা; কোন শক্তি (সিদ্ধাই) চেয়ো না। প্রেমই একমাত্র শক্তি যা চিরকাল থাকে আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। যারা রাজযোগের সাহায্যে ভগবানের কাছে আসতে চায় মানসিক শারীরিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে তাদের খুব সবল হতে হবে। আলো দেখে পা ফেলো।

লক্ষের মধ্যে একজন বলতে পারে "এই সংসার পার হয়ে আমি ভগবানের কাছে যাব।" সত্যের সামনে দাঁড়াতে পারে এমন লোক খুব কম কিন্তু তবুও আমাদের কোন কিছু করতে হলে সত্যের জন্য মরতেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

শক্তি

শক্তি শব্দের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ আজ বলব।

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রে শক্তি শব্দটি দেখতে পাই।

স্তোমেন হি দিবি দেবাসো অগ্নিমজীজনচ্ছক্তিভিরোদসি প্রাম্।

তমু অকৃণ্বন্ত্রেধাভুবে কংস ওষধীঃ পচতি বিশ্বরূপাঃ॥ ১০।৮৮।১০।

দেবগণ স্তুতি দ্বারা শক্তিযোগে যে ত্রিলোক ব্যাপক সূর্য্যাত্মক অগ্নিকে দ্যুলোকে উৎপন্ন করেছেন সেই অগ্নিকেই জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য বলে ভাগ করেছেন। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্চে দেবতারা শক্তির দ্বারাই অগ্নির সৃষ্টি করেছেন। এখানে শক্তি = কর্ম্ম। নিরুক্তকার "শক্তিভিঃ" অর্থে "কর্ম্মভিঃ" করেছেন। দেবতারা ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। দেবতারা বাস করেন চন্দ্রলোকে বা দ্যুলোকে (mental world)। অর্থাৎ আদি-শক্তিই ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে পরিণত হন। তাই আবার আদিত্য-লোকে (psysical world) অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং সূর্য্যরূপে পরিণত হয়েছে।

অথর্ব্ব বেদ

ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদবানাম বো হিতম্—সায়ণ এখানে শক্তিভিঃ = হেতুভিঃ করেছেন। কারণই কার্য্যের হেতু শক্তি।

উপনিষদ

শ্বেতাশ্বতর, নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনী (৩।১), অথর্ব্বশীর্ষ (৪), সন্ন্যাসোপনিষৎ (২) কঠশ্রুতি (৩), হংসোপনিষৎ (৬) এবং কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদে (১০।১৬;২২।৭২।৮৬।৯০) শক্তি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে 'শক্তি' শব্দের দার্শনিকতা খুব বেশী। যথা—

(১) পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (৬৮ —এক পরা শক্তিকে বহুরূপে শ্রবণ করা যায়।

২) তে ধ্যান যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢাম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

তাঁরা (ঋষিরা) ধ্যানযোগে সেই দেবাত্মশক্তিকে দেখেছেন। নিজ গুণের দ্বারা তিনি গুপ্ত, নিখিলের কারণ, কালাত্মযুক্ত হয়ে রয়েছেন। তা ছাড়া অন্য শ্লোকে পাওয়া যায় তিনি ত্রিগুণাত্মিকা পরমাত্মা হতে অভিন্না এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কারিণী।

সাংখ্য

কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ে সাংখ্য—কারিকা বলছেন,

শক্তস্য শক্যকরণাৎ। ৬।

প্রবচন সূত্র বলছেন,

শক্তোদ্ভবানুভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১।১১॥

কার্য্যের সঙ্গে কারণের একটা সম্বন্ধ কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান। মৃত্তিকা শক্ত এবং ঘট শক্য। মৃত্তিকায় ঘট জন্মিবার চির-স্তনী শক্তি থাকা চাই, নইলে মৃত্তিকা থেকে জলও হতে পারত। বিশেষ বিশেষ শক্তি সম্বন্ধায় কারণ বিশেষ বিশেষ কার্য্য সৃষ্টি করে। মৃত্তিকায় ঘট জন্মিবার শক্তি চির-সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে না থাকলে ঘট হতে পারত না। যেমন তিল হতে তেল হয়, দুধ হয় না। পদার্থের ধর্ম্মত্ব (স্বভাব) কখনও নষ্ট হয় না। তিরোভাব হতে পারে কিন্তু নাশ হয় না। কার্য্য-জনন শক্তি ঘুমন্ত dorment অবস্থায় থাকতে পারে বা অন্যত্র তার সংক্রমণ (transmutation) হতে পারে কিন্তু সেটার অনস্তিত্ব (no-existence) হতে পারে না। কাজেকাজেই বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ভাষায় বলতে হয়, "কার্য্যের অনাগত অবস্থাই শক্তি।"

পাতঞ্জল

পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ‘শক্তি’ শব্দটি ‘যোগ্যতা’ ও ‘সামর্থ্য’ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

পূর্ব্ব মীমাংসা

তদশক্তি স্বানুরূপত্বাৎ (১৷৩৷২)

শব্দাদির যে অপভ্রংশ তা অশক্তির অনুরূপ। উচ্চারণের যে অপভ্রংশ দোষ তা উচ্চারণের শক্তি বা সামর্থ্য হীনতা থেকে হয়। যেমন ‘গো’ শব্দটি সাধু কিন্তু কেউ কেউ তাকে ‘গাই’ বলে। জৈমিনী এখানে ‘শক্তি’ শব্দ ‘যোগ্যতা’ ও ‘সামর্থ্য’ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

বেদান্ত-দর্শন

শক্তি বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৷৩৷৮ ॥

ইহার ব্যাখ্যায় আচার্য্য শংকর বলেছেন, “জীব কর্ত্তা, বুদ্ধি করণ মাত্র, বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে শক্তি বিপর্য্যয় হয়। এখানেও ‘শক্তি’ ‘সামর্থ্য’ ও ‘যোগ্যতা’ বাচক। কিন্তু আচার্য্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় স্থলে সাংখ্যাচার্য্যদের মতেই মত দিয়েছেন—

কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতাং কার্য্যম্।

কারণ (potential) প্রথমে শক্তি রূপে (kinetic) তারপর কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। সেইজন্য সাংখ্যবাদীদের জগৎ-কারণ সম্বন্ধে শংকরের মত আর একটু তলিয়ে বোঝা উচিৎ।

শংকরের মায়া ও শক্তি একই। মায়া বলতে তিনি বোঝেন, ‘যা যা নয় তাইতে তাই বুদ্ধি’। এই মায়া মিথুন ভাব—সত্যও বটে মিথ্যাও বটে। সমষ্টি মায়া যা তা মূলা, ব্যষ্টি মায়া তুলা। এই মায়া শক্তি আবার দু ভাগে বিভক্ত—বিক্ষেপ ও আবরণী। আবরণী শক্তি প্রথম জ্ঞান হারিয়ে দেন, তারপর তাঁর বিক্ষেপ শক্তি প্রপঞ্চ রচনা করেন। মায়ী ও মায়া অভেদ।

যোগবাশিষ্ঠ

অপ্রমেয়স্য শান্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌম্য চিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যানাকৃতেরপি॥
ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত॥

(নির্ব্বাণ-প্রকরণ)

অপ্রমেয়, শান্ত, চিন্মাত্র, নিরাকার ও মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মায় প্রথমে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয়, পরে ব্যোমসত্তা, কালসত্তা ও নিয়তি সত্তার যথাক্রমে অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতাসত্তা মহাসত্তা নামে অভিহিত। ইচ্ছাদি সত্তাই ঐশীশক্তি। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্ত্তৃত্বশক্তি, অকর্ত্তৃত্বশক্তি ইত্যাদি নামে পরমেশ্বরের বহু-শক্তি আছে। এই সকল শক্তি শক্তিমান থেকে অভেদ। টিকাকার আরও বলেন, সেই শিব হতে শক্তি যে ভিন্নরূপে বিকল্পিত হয়, তা বিকল্পই, বস্তুতঃ ভিন্ন নয়।

গুণকারণ্ড ব্যূহ

মহাযানী বৌদ্ধেরা এই শক্তিকে বলেছেন প্রজ্ঞা, পারমিতা, অমিতা। গুণকারণ্ড ব্যূহ গ্রন্থে আছে—যখন কিছুই ছিল না, শম্ভু ছিলেন, শম্ভু স্বয়ম্ভূ। তিনি সকলের পূর্ব্বে, তাই তাঁর অপর নাম আদিবুদ্ধ। তিনি বহু হতে ইচ্ছা করলেন; সেই ইচ্ছাই প্রজ্ঞা (ধর্ম্ম) সেই আদি-বুদ্ধ ও প্রজ্ঞার মিলনে উপায় (বুদ্ধ) জন্ম নিলেন।

বৌদ্ধ মহাযানীদের এই আদি মাতৃ-শক্তির সঙ্গে, ঋগ্বেদের দেবী-সূক্ত, নাসদীয় সূক্ত, এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদের অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত এবং মনু মহারাজের আসীদিদন্তমোভূতম-প্রজ্ঞাতমলক্ষণং, অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ প্রভৃতি ভাবের সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নাসদীয় সূক্তে দেখতে পাই ঋষি বলছেন, 'তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। অন্ধকারে অন্ধকার লুকানো ছিল'। আবার দেবী-সূক্তের বক্তা ব্রহ্ম সম্বন্ধে যা বলেচেন সব স্ত্রীবাচী

—যেমন 'রাষ্ট্রী', 'সংগমনী', 'চিকিতুষী', 'প্রথমা'। কাজেকাজেই ব্রহ্মশক্তির আবিষ্কার মহাযানীদের পূর্ব্বেও ছিল বলতে হবে। নষ্টিক সম্প্রদায়ের (Gnostics) যবনেরা এঁকে 'সোফিয়া' বলে উপাসনা করেছেন।

প্রজ্ঞাপারমিতা

আর একখানি মহাযানী গ্রন্থ। এতে প্রজ্ঞার মাতৃত্ব আরও পরিস্ফুট।

যদ বুদ্ধা লোক গুরবঃ পুত্রাস্তব কৃপালবঃ।
তেন ত্বমপি কল্যাণি সর্ব্বসত্ত্ব পিতামহী॥

যে বুদ্ধ সর্ব্বলোকের হিতৈষী, সর্ব্বলোকের গুরু বা জগদগুরু তিনি তোমার পুত্র। এই জন্য তুমি সমস্ত জগতের কল্যাণকারিণী এবং সর্ব্ব-জীবের পিতামহী,—গুরুরও গুরু।

এই 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' অথবা 'মায়া' ও 'বুদ্ধ'ই প্যালেষ্টাইনে 'মেরী'ও 'ক্রাইষ্ট' রূপে প্রকাশ হলেন। তিনি "সমস্ত-লোক-স্বামিনী" তাই তিনি Virgin; আবার বুদ্ধ খৃষ্টকে প্রসব করেছেন বলে 'মাতা'।

সহধর্ম্মিনী, সোমরস ও মন্ত্র-তন্ত্র-যুক্ত অথর্ব্ববেদ বৌদ্ধদের সময় ধারিণী নাম নিলেন, পরে ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি নতুন নাম পেলেন তন্ত্র। ইঁনি মহাযানীদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করলেন। কেবল "প্রজ্ঞা নাম বদলে তাঁরা বল্লেন, 'ন ভুক্তিশ্চ ন মুক্তিশ্চ বিনা দুর্গা নিষেবণাৎ"। চণ্ডীকার বল্লেন, "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" ঋগ্বেদের দেবী-সূক্ত, ঐতরেয়ারণ্যকের প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, মহাযানীদের প্রজ্ঞাপারমিতা, তন্ত্রের শক্তি একই জিনিষ।

এই মাতৃশক্তিই আবার স্ত্রীশক্তিতে পরিণত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলছেন—

অজামেকাং লোহিতশুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

সেই লোহিত (রজঃ) শুক্ল (সত্ত্ব) কৃষ্ণা (তমঃ) এক অজা (জন্মরহিত) নিজের মত বহু প্রজা সৃজন করেন—মূলাশক্তির এই হল মাতৃত্ব। তার পর তাদের ভোগ ও মোক্ষ বিধান করেন—এই হল তাঁর স্ত্রীত্ব। মুগ্ধ

জীব যখন প্রকৃতিকে ভোগ করে তখন প্রকৃতি তাঁর স্ত্রী। আত্মা-পুরুষ, দেহ—প্রকৃতি। আত্মা দেহের গুণ (সুখ দুঃখ) ভোগ করেন। তার পর জীব যখন দেহের সুখ দুঃখ নিজের নয়, বুঝতে পারে তখনই তাকে ত্যাগ করেন। পুরুষ সুন্দর নটীতে মুগ্ধ হয় কিন্তু যখন বুঝতে পারে যে সে সৌন্দর্য্য কেবল খড়ি ও পরচুলো, তখন সে তাকে ত্যাগ করে। আবার যখন জ্ঞান হয় তখন জীবের জীবত্ব কেটে গিয়ে শিবত্ব লাভ হয়। তখন সে দেখে প্রকৃতি তারই শক্তি, লীলার দ্বারা তাকে বদ্ধ করেছিল। মহাযানীরা এই সত্য নির্ণয় করে বলেছিলেন—

যস্য ত্বদাপ্যভিষঙ্গ স্বনাথস্য ন বিদ্যতে।
তস্যাস্য কথমন্যত্র রাগদ্বেষৌ ভবিষ্যতঃ॥ ১২।

প্রজ্ঞাপারমিতা॥

যিনি তোমার নাথ সেই যোগী তোমার সহবাস লাভ করে রাগ ও দ্বেষ হতে মুক্ত হন। হে মাত। তোমার যে সঙ্গ লাভ করেছে তার কি করে রাগ দ্বেষ থাকবে?

মাতৃশক্তি ও স্ত্রীশক্তি যে একই আদি শক্তির বিকাশ তা বৃহন্নীলতন্ত্র প্রজ্ঞাপারমিতার কথা আরও প্রকাশ করে বলেছেন—

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবানাঞ্চ প্রসূতে করুণাময়ি।

* * *

ত্বং শ্রীস্ত্বং হি সাবিত্রী সতী ত্বঞ্চ সুরেশ্বরী॥

হে করুণাময়ী। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবকে প্রসব করেছ, আবার হে সুরেশ্বরী তুমি বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ব্রহ্মার সাবিত্রী এবং শিবের সতী।

ত্রিপিটক ও বেদের সংঘর্ষে মহাযানের উৎপত্তি। মহাযান থেকে সহজ যান, মন্ত্রযান, বজ্রযান ও কালচক্রযান উৎপত্তি হয়। তারা সকলেই প্রজ্ঞার মাতৃত্বের ও স্ত্রীত্বের উপাসক। এর মধ্যে সহজিয়ারাই অত্যন্ত প্রবল হয়। এরা প্রজ্ঞার সঙ্গে অধিক মাত্রায় মধুর ভাব স্থাপন করে, যেমন সাদি হাফেজ প্রভৃতি সুফিরা। মধুর ভাব বাংলা দেশের সান্ধ্যভাষায় বহু দোঁহা ও গানে দেখতে পাওয়া যায়। "আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।" 'ওলো ডোম্‌নী আমি তোর সঙ্গে সঙ্গ

করব'। ডোমনী অস্পৃশ্য বলে তাকে "অস্পর্শম" প্রজ্ঞার প্রতীক ধরা হয়েছে। বৌদ্ধ কৃষ্ণপাদাচার্য্য টিকায় লিখেছেন—"অস্পৃশ্যযোগত্বাৎ ডোম্বীতি পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা বোদ্ধব্যা।" তখনকার মধুর ভাবের এমন এক একটা সুন্দর দোঁহা আছে যার কাছে চণ্ডীদাসের 'ধোপানী' থেকে আরম্ভ করে রবি ঠাকুরের 'মানসী' পর্য্যন্ত সকলেই ঋণী। বাংলায় ব্রাহ্মণদের আগমনের সঙ্গে যতই বৈদিক পুরাণ-কথার প্রসার এবং সংস্কৃতর প্রভাব বাড়তে লাগল ততই ঐ পালি ভাষায় তন্ত্র-মন্ত্র ও ভাব-সংযুক্ত বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা শিবশক্তি বা রাধাকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ালেন। কি ভাবে হয়েছিল তা দেখান এখানে অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ বাসুদেবানন্দ

বিবর্ত্তন

(১)

আনন্দ শর্ম্মা বিজ্ঞ জন। যে গ্রামে তিনি থাকিতেন, তার চতুঃ-পার্শ্বে এইরূপই তাঁহার খ্যাতি ছিল। শুধু বিজ্ঞ নহেন—ধার্ম্মিক, আচারী, সত্যবাদী, তেজস্বী ও নির্ব্বিবাদী বলিয়াও বহুলোক—ধনী দরিদ্র, তাঁহাকে সমভাবে ভক্তি করিত। কিন্তু এতগুণ যাঁহার ভগবান তাঁহার ভাগ্যে সুখ লেখেন নাই। যৌবনে সুশ্রী পতিপরায়ণা পত্নী পাইয়াছিলেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্দিরে মন্দিরে পূজা করিয়া সামান্য যাহা পাইতেন তাহাতেই অতি কষ্টে দিন চলিয়া যাইত; পত্নীকে ইচ্ছামত সাজাইয়া পরাইয়া কোন দিন সুখী করিতে পারিলেন না—সহস্র দুঃখের ভিতর ইহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ,—কিন্তু পত্নীর মুখে তাহার জন্য কোন দিন বিষাদের ছায়াও দেখেন নাই, আবার ইহাই ছিল সহস্র দুঃখের ভিতর তাঁহার সব চাইতে বড় সুখ। দিনের দুঃখ

বেদনা, অবসাদ ক্লান্তি পত্নী সুহাসিনী আদরযত্ন ছেলেমানুষী ও দুষ্টুমী করিয়া কোথায় ভাসাইয়া দিত। তাহার ভালবাসা বুকের ভিতর সর্ব্বদা অনুভব করিয়া আনন্দ শর্ম্মা সমস্ত দুঃখকে বন্ধুর মত হাসিমুখে বরণ করিতেন।

কিন্তু এমন লক্ষ্মী ঘরে থাকিল না; গৃহদীপ অতর্কিত ঝড়ে নিবিয়া গেল। গৃহ অন্ধকার হইল, বুক অন্ধকার হইল, আনন্দ শর্ম্মার জীবন অন্ধকারময় হইয়া তাঁহাকে দিশেহারা করিয়া দিল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অনেক বিচার করিলেন, কিন্তু মন মানিল না। পুঁথি হাতে করিয়া পণ্ডিত বসিতেন, কিন্তু শাস্ত্রজাল ছিন্ন করিয়া সুহাসিনীর স্মৃতি তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিত—বিবাহের পরদিন কথা বলিবার জন্য পরস্পরের কি আকুল আগ্রহ কিন্তু কি ভয়ানক লজ্জা, তারপর আলাপ যখন জমিল তখন সারারাত কথায় কি ধূম, শত গৃহকর্ম্মের ভিতর সে মাঝে মাঝে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আদরের জ্বালায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, যখনই তাঁহার মুখের দিকে চাহিত তখনই না হাসিয়া সে থাকিতে পারিত না, সারাদিন চোখে চোখে রাখিয়াও তাহার দেখিবার আশা মিটিত না, একটু গম্ভীর হইয়া থাকিলে বা কথা না বলিলে সে কাঁদিয়া ফেলিত—সুহাসিনীর সেই আনন্দের—সেই বিষাদের মুখ পণ্ডিতকে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে লইয়া গিয়া পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভুলাইয়া দিত।

হিতৈষীরা বলিল, পুনরায় বিবাহ কর, কিন্তু আনন্দ শর্ম্মা করিলেন না; যে মন যে হৃদয় একজনকে নির্ব্বিবাদে দিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আবার আর একজনকে দিবার মত ইচ্ছা তাঁহার ছিল না, আর দিবেনই বা কি? সুহাসিনীকে সবই তো উজাড় করিয়া দিয়া ফেলিয়াছেন—বাকী তো কিছুই রাখেন নাই! কিন্তু দীর্ঘ জীবন কাটে কি করিয়া? যাঁহার কোন বন্ধন নাই বাসনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই আনন্দ নাই, স্নেহ পাইবার ও স্নেহ করিবার কেহ নাই, মনের কথা বলিবার ও বেদনা জানাইবার স্থান নাই সে বাঁচে কি করিয়া—থাকে কি লইয়া? পুঁথি পড়িয়া ও তামাক খাইয়া তো সারাজীবন কাটিতে পারে না—কিন্তু এমনি করিয়াই আনন্দ শর্ম্মার বহুদিন—বহু বছর

কাটিল। দীর্ঘ দিন আর কাটিতে চাহিত না; শুইয়া বসিয়া পড়িয়া ও ভাবিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোনরূপে তিনি ঠেলিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু রাত্রি—তাহাই তো ছিল আনন্দ শর্ম্মার সব চাইতে বিপদের সময়; নীরব নিস্তব্ধ বিনিদ্র রজনী একা একা শুইয়া তিনি সারা গৃহে, শয্যার প্রতি অণুপরমাণুতে পত্নীর অঙ্গ-সৌরভের আঘ্রাণ পাইতেন, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত কাঁদিতেন, উন্মাদের মত গৃহময় তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন পণ্ডিতের সংযম ও শাস্ত্রমর্ম্ম গভীর নিশার অতল অন্ধকারে সবই ডুবিয়া যাইত।

সুহাসিনী যাইবার পর হইতে আনন্দ শর্ম্মার গৃহে আর হাঁড়ি চড়ে নাই, সময়ে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। পূজার দক্ষিণা যাহা পাইতেন তাহা একজনের বাড়ীতে দিতেন সেখান হইতে একবেলা খাইয়া আসিতেন, রাত্রিরে অনাহারে থাকিতেন। এইরূপে বছরের পর বছর কাটাইয়া আনন্দ শর্ম্মার চুলে পাক ধরিল, চর্ম্ম শিথিল ও শরীর কৃশ হইল। সময় নিকট বুঝিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি কাশীবাসী হইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু সংসার তো তাঁহার ছিল না, তবে আর ত্যাগ করিবেন কি? কিন্তু সেই নষ্ট নীড়ে যেটুকু সুখ—সেই ভগ্ন পাত্রে যেটুকু মধু লাগিয়া ছিল তাহাও তো আনন্দ শর্ম্মার কাছে কম নয়? এই ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের ভিতর সুহাসিনীর যে স্মৃতির তনু এখনও হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় যাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া তিনি এত দিন এত বছর কাটাইয়াছেন—এইখানে, এই নিরালা কুটীরে নিষ্ঠুরের মত তাহাকে চিরকালের জন্য ফেলিয়া যাওয়া তো তাঁহার পক্ষে কম ত্যাগ নয়! সুহাসিনী এতদিন মরিয়াও মরে নাই—আজই বাস্তবিক সে মরিল, আজই বাস্তবিক লক্ষ্মী চলিয়া গেল, দীপ নিভিল, গৃহ অন্ধকার হইল।

(২)

যাত্রার আর দুই দিন বাকী। আনন্দ শর্ম্মা দেওয়ালে ঠেস দিয়া আপন মনে তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় একটি ছেলের হাত

ধরিয়া প্রৌঢ়াগোছের অনৈকা মহিলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিশোর কুমার তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার ও প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া আনন্দ শর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই ?"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "চিনতে পারছ না দাদা, এ—রতন, তোমার ভাগ্নে। তুমি কাশী যাচ্ছ শুনে তোমার সঙ্গে দেখা কবতে এলুম !"

আনন্দ শর্ম্মা কিছু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, "ও—তা বেশ করেছ, বস। এখন কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?"

প্রৌঢ়া তাঁহার কাছে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কি দাদা, আমায় এরি মধ্যে ভুলে গেলে। আমি রাজু—রাজেশ্বরী।"

রাজেশ্বরী—যেন শোনা নাম, হয় তো শুনিয়া থাকিবেন—দেখেন নাই, হয় তো দেখিয়াও থাকিবেন—মনে নাই, একটু ভাবিয়া আনন্দ শর্ম্মা বলিলেন, "তা এসেছ ভালই করেছ, বাবা রতন, তোর মাকে নিয়ে পুকুরে হাত পা ধুয়ে আয়, আমি খাবার যোগাড় করি।"

রাজেশ্বরী বলিলেন, "না দাদা, সে তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি বস, আমি নিজে সব ঠিক করে—নেব।"

রাজেশ্বরী রতনের সঙ্গে হাত পা ধুইতে চলিয়া গেলেন ; আনন্দ শর্ম্মা ভাবিতে লাগিলেন,—এ আবার কি আপদ এল। বেশ ছিলুম, আবার হাঙ্গাম।

খানিক পরে রাজেশ্বরী ফিরিয়া আসিলেন। সিক্ত বসন, মাথার শিক্ত কেশ হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে ; রতনও ভিজা কাপড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দ শর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ওকি করলে রাজু, অবেলায় স্নান করলে, ছেলেটাকে করালে ? অসুখ করবে যে !"

ভিজা চুল হইতে জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে রাজেশ্বরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কিছু হবে না দাদা, আমাদের অভ্যাস আছে।"

"তোমার তো আছে, কিন্তু রতনের ? তাকে শুধু শুধু এই শীত কালের অবেলায় পচা ডোবায় নাইয়ে আনলে কেন ?"

রাজেশ্বরী বলিলেন, "তা হোক দাদা, রাস্তি মাড়িয়ে এসেছে, কত কি হাড়গোড় ছুঁয়েছে—"

আনন্দ শর্ম্মা আর কিছু বলিলেন না।

তারপর রাজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া, পোঁটলা হইতে কিছু চাল ডাল বাহির করিয়া রান্নাঘরে গেলেন। গিয়াই সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "একি দাদা, রান্নাঘর যে আস্তাকুড় হয়ে আছে। বৌদি যাবার পর থেকে আর হাঁড়ি চড়েনি বুঝি।"

আবার তার কথা?—এমনি করিয়াই তো কতদিন রান্নাঘর হইতে, রান্না করিতে করিতে তাঁহার সহিত সে কত কথা বলিয়াছে, কত গল্প করিয়াছে। একদিন ঠাট্টা করিয়া তিনি কি বলিয়াছিলেন, সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া, ঠিক এইখানেই দাঁড়াইয়া দুষ্টুমি করিয়া বলিয়াছিল, "ফের যদি ওরকম বলবে, এই গরম হাতার ছ্যাঁকা দিয়ে দোব।" সে আজ পঁচিশ বছরের কথা, কিন্তু আনন্দ শর্ম্মার মনে হইতে লাগিল—এই তো সেদিন।

তারপর রাজেশ্বরী রান্না বান্না সারিয়া দুইখানি আসন করিল। কলা-পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহাতে গরম ভাত ঢালিয়া ডাকিলেন, "দাদা এস, রতন খাবি আয়।"

আনন্দ শর্ম্মা বলিলেন, "ওকি রাজু, আমি যে খেয়েছি।"

ভাতগুলি পাতার উপর মেলিয়া দিতে দিতে রাজেশ্বরী উত্তর করিলেন, "তা হোক, দুটিখানি খাও।"

"না রাজু, এই অবেলায় আমি আর খাব না।"

"খুব খাবে; নাও—শীগ্‌গীর এস, ভাত জুড়িয়ে যাবে।"

আনন্দ শর্ম্মা বাধ্য হইয়া আসনে গিয়া বসিলেন। অকারণে তাঁহার চোখে জল আসিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রাজেশ্বরী বলিলেন, "দাদা, রতনের খুব জ্বর।"

আনন্দ শর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "এঁ্যা—সে কি? কাল শুধু শুধু ছেলেটাকে পচা জলে ডুবিয়ে নিয়ে এলে।"

রাজেশ্বরী আর কিছু বলিলেন না।

একদিন, দুদিন, তিনদিন—রতনের জ্বর ছাড়িল না।

তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আনন্দ শর্ম্মাকে ডাক্তার ডাকিতে হইল। এই বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় যাহা তাঁহাকে কখনো করিতে হয় নাই—ঔষধ ও পথ্যের জন্য অনেক ছুটাছুটি করিতে হইল।

চল্লিশ দিন পরে রতন পথ্য করিল। এই চল্লিশ দিন আনন্দ শর্ম্মা ও রাজেশ্বরী পালা করিয়া দিবারাত্রি তাহার শিয়রে বসিয়া কাটাইয়াছেন। কোন দিন তাঁহাদের খাওয়া হইয়াছে, কোন দিন হয় নাই। এই গুরুতর পরিশ্রমে বৃদ্ধ আনন্দ শর্ম্মার শরীর নিতান্ত অবসন্ন, রতনও এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহাছাড়া সামান্য সঞ্চিত অর্থ যাহা ছিল ঔষধ পথ্য ও ডাক্তারের ভিজিটে সবই খরচ হইয়া গিয়াছে, তাই অনিশ্চিত দিনের জন্য কাশী যাওয়া তাঁহাকে বন্ধ রাখিতে হইল।

* * * *

দুইমাস হইয়া গিয়াছে—এখনও রতন ভাল করিয়া সারিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল অসুখে ভুগিয়া সে বড়ই খিটখিটে হইয়াছে, মাকে মোটেই দেখিতে পারে না। রাজেশ্বরী ঔষধ বা পথ্য দিতে আসিলে রতন তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আনন্দ শর্ম্মা খাইতে বলিলে আর 'না' করে না। যখন কাঁদে, তিনি চুপ করিতে বলিলে তখুনি সে চুপ করে, শুইতে বলিলে শোয়, ঘুমাইতে বলিলে তখুনি ঘুমাইয়া পড়ে। যখন সে অনেকটা সারিল, সময় কাটাইবার জন্য আনন্দ শর্ম্মা তাহাকে কিছু কিছু পড়াইতে লাগিলেন; দেখিলেন, রতন ভারী বুদ্ধিমান, অন্য ছেলেরা পাঁচবার বলিলেও যাহা বুঝিতে পারে না, সে একবারেই তাহা বুঝিয়া লয়, আর স্মরণ শক্তিও খুব তীক্ষ্ণ। ছেলেটিকে তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল বেশ হাসিখুসী মুখ, কালো কালো দুঠি চোখ দুষ্টুমিতে ভরা, অথচ খুব অমায়িক। রতনও সর্ব্বদা তাঁহার কাছে কাছে থাকিত; তামাক সাজিয়া দিত, পাকা চুল তুলিত, তাঁহার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া কত কি বকিত।

অল্পদিনের ভিতর রতন অনেকগুলি পুঁথি শেষ করিয়া ফেলিল। আনন্দ শর্ম্মা ভাবিলেন, ছেলেটাকে যদি মানুষ করিয়া দিতে পারি—তবুও

সংসারের কিছু একটা করিলাম, অন্ততঃ দুটি প্রাণীও তো সুখী হইবে। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইল। সকলেই তাঁহাকে ভাল লোক বলিয়া জানিত, কিন্তু তাঁহার বিশেষ খোঁজ খবর কেহ লইত না, তিনিও তাহা পছন্দ করিতেন না; সংসার হইতে নিজেকে ছিন্ন করিয়া সকলের দৃষ্টির অন্তরালে, একান্ত আপনার ভাবে, নিজের মর্ম্ম বেদনা বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে একা একা উপভোগ করিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। যখন কাশী যাইবেন ভাবিয়াছিলেন তখন আনন্দ শর্ম্মা কাহারও সহিত যুক্তি করেন নাই, যখন যাইবেন না মনে করিলেন তখনও কাহারও মতামত লন নাই, কিন্তু অন্যে এই অমূল্য সুযোগ ছাড়িবে কেন? অনাবশ্যকরূপে গায়ে পড়িয়া তাহারা বৃদ্ধকে অনেক উপদেশ দিল, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইল, এমন কি সমবয়স্ক কেহ কেহ ইঙ্গিতে ইতরামিও করিল। আনন্দ শর্ম্মা সবই শুনিয়া যাইতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না। যখন সমালোচনা বড়ই তীব্র হইত তখন তিনি ভাবিতেন, সংসার অনিত্য—ইহা সত্য কথা, কিন্তু এই অনিত্য সংসারে দুঃখও তো অনন্ত। রতন যদি মানুষ হইতে পারে তাহাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব কখনো থাকিবে না; এই অনন্ত দুঃখের ভিতর একটা দুঃখও তো তাহাদের কমিবে!

মনের আনন্দে বৃদ্ধের মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিত। পঁচিশবছর আগের হাঁসি আজ আবার বৃদ্ধের মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে।

চন্দ্রেশ্বরানন্দ

রেঁমা রোলাঁর চিঠি

৪

১৪ই ডিসেম্বর
১৯২৭

প্রিয় স্বামী—

আপনার ১৩ই নভেম্বরের চিঠি ও স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ্ জানাচ্ছি।

স্বামী শিবানন্দ এবং আপনাকে যে সকল পত্র আমি লিখেছি, যদি মনে করেন, আপনাদের সকল দৈনিক ও মাসিকের পাঠকপাঠিকারা তাতে ঔৎসুক্য দেখাবেন, তা হলে যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিনিধি, তাঁদের যাকেই আমি পত্র লিখিনা কেন, তা ছাপার জন্য সাগ্রহে আমি অনুমতি দিচ্ছি......। আপনাদের সাধারণ স্বভাবতঃই ধর্ম্ম প্রাণ, আমি আপনাদের পত্রিকার মধ্য দিয়ে তাদের সংস্পর্শে আসতে চাই।

আমি আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর খুব আগ্রহের সহিত পড়েছি। মূল সত্য সম্বন্ধে আমাদের এক মত। তবে ভেদ এইটুকু (যদি তাকে ভেদ বলা যায়), আপনারা যে শ্রেণীর চিন্তাকে বেদান্ত বলেন, তা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই ছিল। তবে তার পূর্ণ বিকাশ হয় ভারতের বৈদান্তিক যুগে। একটা জিনিষের পূর্ণ পরিণতি এক কথা। আর তার মূল আরএক কথা। ভারত বা অন্য কোনও দেশ যে আধ্যাত্মিক সত্য বিকাশের মূল স্থান, এ কথা আমার মনে হয় না। সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী একমাত্র ভগবানকেই আমি এ সম্মান দিয়ে থাকি। তিনিই সকল সত্যের মূল উৎস—যে উৎস সকল প্রাণীর মধ্যে ছিল আছে ও থাকবে। সে বাণী সকলে শুনতে পায় না। তবে সকলের মধ্যেই তা ধ্বনিত হচ্চে। তবে তাঁদের মধ্যে যারা নীরব বা নীরব থাকতে চান তাদের হৃদয় যে তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পূর্ণ হচ্চে না

একথা আমি জানি না। তীব্র শক্তি সম্পন্ন ভাষার মধ্যে যেমন তাঁর প্রকাশ, নীরবতার মধ্যেও ঠিক তেমনি। চিরন্তনের সমক্ষে পূর্ব্বাপরের প্রশ্নই উঠতে পারে না; সেখানে আরম্ভও নেই, শেষও নেই। তবে একথা স্বীকার করতে আমি একটুও ইতস্ততঃ করি না যে, ভারতেই সর্ব্বাপেক্ষা-শক্তিশালী, সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তম্ভ বর্ত্তমান। ভারতই একতা ও মিলনের মন্দির—আধ্যাত্মিকতার হিমালয়।

আমার বোধ হয় আমার অভিপ্রেত কর্ম্ম যা ভেবেছিলুম তার চাইতেও আরও কিছু দেরী হবে। প্রথমতঃ মাল মসলা গুলো এখনও ঠিক্ ঠিক্ সাজান হয়নি (আপনাদের বই গুলোও তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে)। তার পর আমার অপরাপর কাজ থেকেও (যা প্রায় এখন শেষ হয়ে এসেছে) আমি সম্পূর্ণ রূপে খালাস হতে পারিনি। তা ছাড়া অবিচার এবং অপরাধের বিরুদ্ধে লেখার জন্য আমার কাছে যে সব আবেদন আসছে তার উত্তর দেওয়াও আমার কর্ত্তব্য। ঐ সব ব্যাপার যে কেবল জগতের কোনও স্থান বিশেষে ঘটচে তা নয়, রিপু-তাড়িত জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই একই রূপ। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজেদের শান্তি-ভঙ্গের ভয়ে যে সম্বন্ধে চোক কান বুঝে আছেন, আমি নিজেকে সেই কর্ত্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছুক নই।

আমার ভ্রাতৃ সম্ভাষণ জানবেন।

ইতি

আপনাদের অনুগত

রোঁমা রোলাঁ

অন্ধ কবি

(খলিল গিবরান হইতে)

আলোক করেছে অন্ধ মোরে
যে আলো ফুটালো পুর্ব্ব পারে
জ্যোতির রক্তদল ;
রাত্রি প্রবাসী সেই ত করেছে
স্বপনের দেশে সেইত এনেছে
ভুল সাগরের তল।
তবুও আমি চির অস্থির
তোমরা অচল কেবলই ধীর
আঁখির শিকল ভারে—
যদি না মৃত্যু লইয়া যায়
এ দেহ হইতে অন্য কায়
আগামী রাজ্য দ্বারে।
তবুও পন্থা কেবলই খুঁজি
বীণা ও যষ্ঠি লইয়া পুঁজি
অন্ধ যদিও আমি।
বসে বসে শুধু মালাই জপ
স্বাধীন শক্তি হয়েছে লোপ
দৃষ্টির বশ তুমি।
আঁধার পথেতে ছুটিয়া যাই
আলোর ডরত আমাতে নাই
তুমি ডরে মর তার।
অন্ধ কবি !
ভয়কি তোমার
ঝরুক সুরের ধার !
তারা বলে,

হায়রে ! দেখল না সে রূপ কি আলো
দেখল শুধুই আঁধার কালো
ফুল তা কি সে জানে !
আমি ভাবি,
হায়রে ! শুনল না সে তারার কথা
জানল না সে ফুলের ব্যথা
এমনি ভাগ্য হত !
কান শোনে না মর্ম্ম কাহার
পায় নাক স্বাদ আগুন্ তাহার
দুর্ভাগা নর যত !
বিপথ আমার নাই কো জানা
দীপ্তি দেবীর প্রবেশ মানা
অরূপ স্বপন দেশে।
পদে পদে পাই যে অভয়
ঠাকুর আমার পথ বলে দেয়
মণি কোঠায় বসে।
বাধার ঘায়ে যদিই পড়ি
সুর পাখী মোর যায় যে উড়ি
ভেদি গভীর নীল।
ঊর্দ্ধ গভীর দেখে দেখে
ঘনিয়ে এল আঁধার চোখে
লাগিয়ে দিলে খিল—
নজর দিলুম নজরেরে
একটি নিমেষ দেখনু তারে
গভীর উজল দ্যুতি !
নিভিয়ে দিনু দুটুই বাতি
পোইয়ে গেল দীর্ঘ রাতি
জাগল উষার ভাতি !

ধ্রুব

রাগ মালা

* শ্রুতি এবং মূর্চ্ছনার চক্র

সপ্তস্বর।		শ্রুতির নাম।	সংখ্যা।	* মূর্চ্ছনা।	মূর্চ্ছনার নাম।	সংখ্যা।
		তীব্রা	১	স ঋ গ ম প ধ ন	ইতি উত্তর মন্দ্রা	১
		কুমুদ্বতী		ন ধ প ম গ ঋ স।		
"স"	"ষড়জ"	মন্দা		ন স ঋ গ ম প ধ		
		ছন্দোবতী	৪	ধ প ম গ ঋ স ন।	ইতি রঞ্জনী	২
				ধ ন স ঋ গ ম প		
				প ম গ ঋ স ন ধ।	ইতি উত্তরায়তা	৩

*সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত স্বরসাগর এবং সঙ্গীত সময়সার।

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বেগান্ধারে নিষাদকে॥

সঙ্গীত সময়সার।

(১ম গ্রাম কিম্বা মন্দ্র সপ্তক)।

		দয়াবতী	৩	প ধ ন স ঋ গ ম ম গ ঋ স ন ধ প।	ইতি শুদ্ধ ষড়্জা	৪
"ঋ"	"ঋষভ"	রঞ্জনী		ম প ধ ন স ঋ গ গ ঋ স ন ধ প ম।	ইতি মৎসরী কৃতা	৫
		রতিকা		গ ম প ধ ন স ঋ ঋ স ন ধ প ম গ।	ইতি অশ্বকান্তা	৬
"গ"	"গান্ধার"	রৌদ্রী ক্রোধী	২	ঋ গ ম প ধ ন স স ন ধ প ম গ ঋ।	ইতি অভিরুদ্‌গতা	৭
"ম"	"মধ্যম"	বজ্রিকা প্রসারিণী প্রীতি মার্জনী	৪	এই প্রকারে ষড়্জ গ্রামের দ্বিতীয় সপ্তকের ষড়্জ (অর্থাৎ মুদারা গ্রামের "স") হইতে প্রথম মূর্চ্ছনা আরম্ভ করিয়া উদারা গ্রামের দিকে লইয়া যাইতে হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।		

			ক্ষিতি	} ৪	
৩	"প"	"পঞ্চম"	রক্তা		
			সন্দীপিনী	} ৩	
			আলাপনী		
	"ধ"	"ধৈবত"	মদন্তী		
			রোহিনী		
			রম্যা		
	"নি"	"নিষাদ"	উগ্রা	} ২	
			ক্ষোভিনী		
				২২	

ম প ধ ন স ঋ গ

গ ঋ স ন ধ প ম।

দ্বিতীয় সপ্তকের মধ্যম ("ম") হইতে সপ্ত মূর্চ্ছনা আরম্ভ করিতে হইবে।

মধ্যম হইতে সপ্ত মূর্চ্ছনা স্থিরিকৃত হইয়াছে।

গ ম প ধ ন স ঋ

ঋ স ন ধ প ম গ।

দ্বিতীয় গ্রামের গান্ধার ("গ") হইতে সপ্ত মূর্চ্ছনা আরম্ভ করিতে হইবে। মূর্চ্ছনা পাঁচ কিম্বা ছয় স্বরের হইলে, তাহাকে তান বলা যায়।

(২য় গ্রাম কিম্বা সপ্তক)।

ইতি সৌবিরী　১
ইতি হরিণাশ্বা
ইতি কলোপলতা
ইতি শুদ্ধ মধ্যা
ইতি মার্গী
ইতি পৌরবী
ইতি হৃষ্যকা

(৩য় গ্রাম কিম্বা সপ্তক)।

ইতি নন্দা　১
ইতি বিশালা
ইতি সুমুখী
ইতি চিত্রা
ইতি চিত্রাবতী
ইতি সুখা
ইতি আলাপা

২১

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মাধুকরী

কাল্‌ভে-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে

কার্ত্তিক মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "সবুজ পত্রে" প্রকাশিত "ভ্রাম্যমানের জল্পনা" থেকে ফ্রান্সের একটি শ্রেষ্ঠা গায়িকার সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তা সঙ্কলিত করে দেওয়া হয়েছে এবং "বিচিত্রা" "নানা কথা"য় সেই "শ্রেষ্ঠা গায়িকা"র ভারত-ভ্রমণ বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে।

যদি এই শ্রেষ্ঠা গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে হন, তবে দিলীপ বাবুর এর নাম অপ্রকাশ রাখবার কারণ বুঝতে পারা গেল না। মাদাম কালভের নাম ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সুপরিচিত। বিশেষ এই বাংলা দেশে। স্বামিজী তাঁর "পরিব্রাজকে" নিজেই কাল্‌ভের এই-রূপ পরিচয় দিয়েছেন :—

"সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাকলাউড; ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুলবোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্য-লেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় "মিষ্টর" হচ্ছেন "মস্যিয়," আর "মিস্" হচ্চেন মাদ্‌মোয়াজেল্ "জ"টা পূর্ব্ব-বাঙ্গলার জ। মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে।

মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম করবেন; ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট,

দর্শন-শাস্ত্র ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন! রাজা বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম্ মেল্‌বা মাদাম্ এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকলে আছেন; জঁা দরজে কি, প্লাঁসঁ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন! কিন্তু কাল্‌ভের বিস্তার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকা মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় করেছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট—যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ কোরে কাল্‌ভের এই বিজয় লাভ, যে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।"

সুতরাং বাংলা পাঠকদের মধ্যে এবং স্বামিজীর ভক্তদের মধ্যে "কাল্‌ভে"র নাম নূতন নয়—এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দিলীপবাবুর নাম প্রকাশ কর্‌লে বাংলার পাঠক পাঠিকারা আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ করতেন। আজ মাদাম কাল্‌ভের আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে কাল্‌ভে যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁর বেলুড়মঠ দর্শনের কথা মনে পড়্‌ল, এবং "বিচিত্রা"র "নানাকথা"র মন্তব্য পাঠ ক'রে সেই পুরাতন স্মৃতি আবার নবীন হ'য়ে জেগে উঠল।

মাদাম কাল্‌ভে যখন কলকাতায় আসেন তখন ইংরাজী ১৯১১ সাল 'ইংলিসম্যান' পত্রিকা মাদাম কাল্‌ভের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রিকার প্রতিনিধির যে কথাবার্ত্তা হয় তা' সবিস্তারে প্রকাশিত করেন। সেই আলাপ-আলোচনা প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল যে কাল্‌ভের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য—ভারত সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শ এতদিন কল্পনা ও স্বপ্নরাজ্যে ছিল—যে দেশকে তিনি জগতের একটি তীর্থরূপে মনে ক'রে এতদিন এসেছেন—সেই আদর্শকে ধারণা কর্‌তে তীর্থযাত্রিরূপে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান কর্‌তে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। প্রশ্নকর্ত্তা

ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ভারত সম্বন্ধে তাঁর এই আদর্শ ও শ্রদ্ধা কি করে হ'ল? মাদাম বল্লেন, "স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকে। তাঁর মুখে যখন প্রাচীন ভারতের মহোজ্জ্বল বর্ণনা শুনতাম—তখন থেকে এই পবিত্র ভূমিকে দেখ্‌বার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। ভগবানের কৃপায় আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"

ইংলিশম্যানের এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে আমাদের বিবেকানন্দ সমিতিতে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ের আলোচনা হয়। বিবেকানন্দ-সমিতি তখন ১।৪নং শঙ্কর ঘোষের লেন মেট্রোপলিটান কলেজের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সে সময়ে "বিবেকানন্দ সমিতি"র সম্পাদক ছিলেন। "বিবেকানন্দ-সমিতির" সেই সভায় স্থির হ'ল যে পরদিন আমরা বেলা ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে গ্র্যাণ্ড হোটেলে মাদাম কাল্‌ভের সঙ্গে দেখা করতে যাব এবং তাঁকে জানাব তিনি যদি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়মঠ দর্শন কর্‌তে চান তবে আমরা তাঁর সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। পূর্ণবাবুর উপদেশ ও প্রস্তাবানুযায়ী আরও স্থির হ'ল যে আমাদের সমিতির পক্ষ হ'তে কালভেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামি বিবেকানন্দের ফটো ছবিগুলি উপহার স্বরূপ প্রদান করা হইবে।

পূজনীয় পূর্ণবাবু, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক সকলে মিলে গ্র্যাণ্ড হোটেলের দ্বিতল কক্ষে গিয়ে জানাই যে আমরা বিবেকানন্দ-সমিতির সম্পাদক ও কয়েকজন সভ্য মাদামের দর্শনপ্রার্থী। সংবাদ পাঠাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ডাক পড়্‌ল। প্রাসাদোপম গ্র্যাণ্ড হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে আমরা ছ'জন প্রবেশ করলেম, একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমাদের সম্বর্দ্ধনা ক'রে চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ কর্‌লেন। তিনি বল্‌লেন "আপনারা এসেছেন শুনে মাদাম বড় আনন্দিত হয়েছেন, তিনি

আপনাদের পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে অনুরোধ ক'রেছেন।" আমরা সকলেই মাদামের আগমন প্রতীক্ষায় রইলাম, কিন্তু অবিলম্বে দুটি ভদ্র-লোককে সঙ্গে ক'রে ভিতরের কক্ষ থেকে মাদাম কাল্ভে আমাদের সম্মুখে হাস্যমুখে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে আমরা যখন সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠ্লাম—তখন তিনি আমাদের অভিবাদন করে ওষ্ঠে অঙ্গুলী-সঙ্কেত ক'রে বল্লেন "নথ ইংলিশ" পরে তাঁর সঙ্গী একটি ভদ্রলোককে ফরাসী ভাষায় কি বল্লেন—তা তখন আমাদের অবোধ্য। (দীর্ঘকায় কেশবিরল প্রৌঢ়) বললেন মাদাম ইংরাজী জানেন না এই জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছেন। তাঁর মনের ভাব তিনি আপনাদের নিকট আপনাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। আমি দোভাষী হ'য়ে আপনাদের কথা তাঁকে জানাব এবং তাঁর কথা আপনাদের জানাব।"

আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ পূর্ণবাবু কথা আরম্ভ কর্লেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ফটোগুলি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্যবদনে সেগুলি নিজের হাতে গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো দেখে অতি শ্রদ্ধাভরে মস্তকে স্পর্শ করলেন—পরে টেবিলের উপর রাখ্লেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দেখে তিনি যেন আনন্দের বেগে আত্মহারা হয়ে গেলেন, স্বামিজীর ফটো তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন, মুখে চোখে—সর্ব্বশরীরে যেন সেই আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; অতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, "Oh! I am very very happy," তারপর ফরাসী ভাষায় অনর্গল বলতে লাগলেন এবং আমার দিকে একটু করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। সেই দৃষ্টি যেন স্পষ্ট করে বল্লে কি দুঃখ! আমার এই মনের ভাবগুলি তোমাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।" দোভাষী মাদামের উচ্ছাসগুলি যেন ব্যক্ত করতে অক্ষম—তিনিও শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বল্লেন মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পুরাণো স্মৃতি সব জেগে উঠেছে! স্বামিজীর এই ছবি দেখে মাদাম স্বামিজীকে যেন চোখের সামনে দেখ্তে পাচ্ছেন।" দোভাষীর কথা শেষ হ'তে

না হ'তে মাদাম অনর্গল ফরাসী ভাষায় তাঁর মনের উচ্ছাস ব্যক্ত কর্‌তে লাগলেন। তখনো তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ফটো বক্ষে চেপে রেখেছেন, দোভাষী হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন—মাদাম কালভে নিজেই মনের আবেগে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বল্‌তে লাগলেন, "স্বামী বিবেকানন্দ যীশুখৃষ্টের মত ছিলেন যীশুর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল, যীশুর মত তাঁর জীবন প্রেম পূর্ণ পবিত্র সরস ছিল।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আবার ফরাসী ভাষায় বল্‌তে লাগলেন। দোভাষী বল্‌লেন মাদাম বল্‌ছেন—তাঁর জীবনের অতি শুভ মুহূর্ত্তে তিনি স্বামিজীর দর্শন ক'রেছিলেন। তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মত পবিত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও লোকে পবিত্র হ'ত। ভগবৎ শক্তির প্রকাশমূর্ত্তি বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর কি প্রবল আকর্ষণ ছিল—সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও বোধ করিনি। কত দিন তাঁর কথা শুনতে শুন্‌তে এত তন্ময় হয়ে গেছি যে কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল—চলে গেল—কিছু লক্ষ ছিল না। তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয়—বহুবার আমাকে অর্থ দণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়—কি অদ্ভুত পবিত্রতা—কি মোহন আকর্ষণ—কি মর্ম্ম স্পর্শী বাণী—কি বাল সুলভ সরলতা—কি উন্নত উদার সঙ্গ—কি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি—কি সুন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু!" দোভাষীরও চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল। মাদাম আবার ফরাসী ভাষায় তাঁর আকুল আকুতি—আনন্দের আবেগ জানালেন। যদিও ভাষা আমাদের অবোধ্য, কিন্তু সেই মর্ম্মবাণী - গভীর ভাবোচ্ছাস—অন্তরের অব্যক্তবাণী শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল—ভাব প্রবাহের কলধ্বনি অন্তরের সুরে সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামিজীর পবিত্র তেজোদৃপ্ত বিরাট প্রেমপূর্ণমূর্ত্তি সকলের সম্মুখে সজীব হয়ে উঠেছিল। সেই বিলাস-সজ্জিত কক্ষ তখন শ্রদ্ধা ও পূজার বিরাট আবহাওয়ায় ভরে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে পূর্ণবাবু সেই দোভাষীর মারফত মাদামকে বল্‌লেন, "যদি আপনি স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ দেখতে ইচ্ছে করেন তবে আমরা আপনার সুবিধামত বন্দোবস্ত কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

মাদাম তাতে বললেন স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিস্থান কোথায়?" পূর্ণবাবু তাঁর উত্তরে বললেন "বেলুড় মঠে"। পরদিন বেলা আড়াইটার সময়ে সমিতির একজন সভ্যকে তাঁর নিকট আসতে বললেন, এবং সেই সময়ে তিনি বেলুড় মঠ দর্শন করতে যাবেন এই রকম ঠিক হ'ল। পূর্ণ বাবু আমাকে দেখিয়ে বললেন যে, "কাল ইনিই আসবেন—আপনাদের পথপ্রদর্শক হয়ে।" বলা বাহুল্য এই সব কথা গুলোই দোভাষীর মারফত।

আমরা সকলে মিলে মাদামের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম। আমাদের পেছনে পেছনে দোভাষী এলেন এবং করমর্দ্দন করে বিদায় নিলেন। যাবার সময়ে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, "এখান থেকে বেলুড় মঠ কতদুর? ট্যাক্সি যায় কিনা? সময় কত লাগবে? পূর্ণবাবু যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে পুনর্ব্বার করমর্দ্দন করে বিদায় নিলেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল তৎক্ষণাৎ উদ্বোধন মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে সব কথা জ্ঞাপন করলেন। স্বামিজী শুনে আহ্লাদিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ মঠে সংবাদ পাঠালেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ বংশী-বাদক হাবু বাবুকে খবর দেওয়া হল তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মঠে যাবেন তা স্থির হল।

পরদিন ঠিক বেলা আড়াইটার সময়ে গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে হাজির হ'লাম। সেই দোভাষী আমাকে সাদর সম্ভাষণ করে সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। মাদাম মাথা নত করে আমাকে অভিবাদন করলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আরো কতক গুলি সাহেব মেম এলেন। মাদাম দোভাষী মারফত আমাকে জানালেন যে এঁরা চন্দননগরে থাকেন, এবং এঁরাও মাদামের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবেন। দুখানা ট্যাক্সি করে বেলুড় মঠ দর্শনে যাত্রা করা গেল।

আমি যে ট্যাক্সিতে স্থান পেয়েছিলাম—তাতে মাদাম এবং আর দুইটি ফরাসী মহিলা ছিলেন। এঁরা ফরাসীতে কথাবার্ত্তা বলছিলেন কিন্তু মাদাম কাল্‌ভে ছিলেন স্থির ধীর গম্ভীর। ধীরে ধীরে ট্যাক্সি বেলুড়মঠে প্রবেশ করলে—মঠের স্বামিজীরা এবং ভক্তেরা মাদামকে অভ্যর্থনা

করতে অগ্রসর হয়ে এলেন। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ মিসনের সেক্রেটারী স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই—স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালে ইনি মার্কিনে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন। "ইতি মধ্যে স্বামী সারদানন্দ মাদাম কাল্‌ভেকে এসে জিজ্ঞেসা করলেন মাদাম আমাকে চিন্তে পারছেন ?" দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন—সঙ্গে সেই দোভাষী। অপর সাহেব মেমরা মাদামের পশ্চাদানুসরণ করতে লাগলেন।

মাদাম সর্ব্বাগ্রে স্বামিজীর সমাধিস্থান দেখতে চাইলেন। স্বামী সারদানন্দজী স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—"এই স্থান।" মাদাম কালভে অতি শ্রদ্ধা ভরে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন—অপর সাহেব মেমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ ক'রে পাঁচমিনিট পরে বাইরে এলেন, কিন্তু মাদাম ভিতরে রইলেন। আমরা বাইরে থেকে দেখতে পেলাম মাদাম স্বামিজীর প্রস্তর মূর্ত্তির সন্মুখে নতজানু হয়ে রয়েছেন। সকলেই নীরব—একটা গাম্ভীর্য্যের রেখা যেন সেখানে ফুটে উঠছিল। সম্মুখে পূত-সলিলা কলনাদিনী ভাগিরথীও কল্ কল্ গম্ভীর নাদে যেন সকলের অন্তর প্রতিধ্বনিত করছিল। দেখতে দেখতে পনর মিনিট চলে গেল—মাদাম সেইভাবে নতজানু হ'য়ে রয়েছেন—চোখে মুখে গণ্ডে পবিত্র অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে। কি মহান পবিত্র দৃশ্য! কৌপীন সম্বল ভিখারী সন্ন্যাসীর মর্ম্মর মূর্ত্তির চরণপ্রান্তে বিদেশিনী জগৎপ্রসিদ্ধা শ্রেষ্ঠা গায়িকার নীরবে অশ্রুর অর্ঘ্যদান।

পরে মাদাম ধীরে ধীরে সে মন্দির থেকে বাইরে এলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে অগ্রণী ক'রে মাদাম, ফরাসী মহিলা ও ভদ্র লোকদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঠের ভক্ত দর্শকেরাও প্রবেশ করলেন। সেখানে মাদাম কাল্‌ভে যখন নতজানু হ'লেন—তখন তাঁর সে গাম্ভীর্য্য নেই—তখন তিনি হাস্যময়ী আনন্দোৎফুল্লা। স্বামী সারদানন্দজীকে বললেন, "স্বামিজী একটা বৈদিক প্রার্থনা বলতেন, তার মানে—অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকময় পথে নিয়ে চল। যদি জানেন—তবে সেই প্রার্থনা আপনি এখানে বলুন। আমার

অত্যন্ত শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।" স্বামী সারদানন্দজী তাঁর সুমধুর গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সকলেই সেই মুহূর্ত্তে যেন স্বতঃই ধ্যানস্থ হ'লেন। পরে পূজনীয় সারদানন্দ স্বামিজী মাদাম কাল্‌ভেকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন, "মাদাম! ঠাকুরকে আপনি এখানে গান শোনাবেন না?" মাদাম শ্রদ্ধানত হয়ে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দজীর আদেশ গ্রহণ কর্‌লেন। মাদাম তাঁহার কলকণ্ঠে ফরাসী সঙ্গীত গাইলেন। যদিও সে সঙ্গীতের অর্থ আমাদের অবোধ্য—কিন্তু কি মধুর স্বরলহরী; যেন হাজার বুলবুল-বন্যা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—যেন মঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর বায়ুস্তরকে কম্পিত ক'রে আন্দোলিত করে এক আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করলে। অর্থশূন্য ভাষাশূন্য বিহগকাকলী যেন প্রাকৃতিক অন্তর্বীণায় ধ্বনিত হ'ল। ঠাকুর ঘর যেন নিকুঞ্জের পাখীর কূজনে মুখরিত হ'য়ে উঠলো। মাদাম পর পর দুইটি গান গাইলেন।

কিছুক্ষণের পরে সকলে ঠাকুর ঘর থেকে নেমে নীচে এলেন। মাদামের অভ্যর্থনার জন্য মঠ ও ঠাকুর ঘর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে চেয়ার টেবিল সাজান ছিল। নীচে ফরাসে হাবু বাবু তাঁর দল নিয়ে ব'সে ছিলেন। পূজনীয় স্বামিজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ স্বামিজীরা সম্মুখের বারান্দায় উপস্থিত ছিলেন। সারদানন্দ স্বামিজী মাদাম কাল্‌ভেকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মাদাম তার সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মাদাম কালভেকে এবং তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক ও মহিলাদের বস্‌তে বল্‌লেন, এবং কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মাদাম তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করে সকলে চেয়ারে বস্‌লেন এবং কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন আহার করতে লাগ্‌লেন। সেই সময়ে হাবু বাবু কনসার্ট বাজালেন। মাদাম কাল্‌ভে হাবু বাবুর বংশী-

বাদন শুনে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি দেশী গৎ ও গান শুনতে চাইলেন। হাবুবাবু তাই বাজালেন। দেশী গানগুলি ইংরেজী নোটেশানে এনে তাঁকে দিতে অনুরোধ করলেন। পরে ধীরে ধীরে মাদাম কাল্‌ভে অতি বিনীতভাবে মঠের স্বামিজীদের কাছে বিদায় চাইলেন।

যেতে যেতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখে মাদাম কাল্‌ভে থম্‌কে দাঁড়ালেন। স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞেস করলেন "উনি কে? অনেকটা স্বামিজীর চেহারার আদল্‌ আছে।" স্বামী সারদানন্দ বললেন—"উনি স্বামিজীর সহোদর ভাই।" এই বলে সারদানন্দ স্বামিজী মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিলেন। মাদাম মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যখন স্বামিজীর সঙ্গে আমি কনষ্টান্টিনোপলে যাই তখন আপনি সেখানে ছিলেন?" মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "না। আপনাদের যাবার কিছু পূর্ব্বেই আমি সে স্থান ত্যাগ করেছিলাম।" মাদাম কাল্‌ভে তাঁর সঙ্গে পরদিন বেলা ৩টা ৪টার মধ্যে দেখা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন।

গ্রাণ্ড হোটেলে পৌঁছে দেবার জন্য মাদাম আমাকে ট্যাক্সিতে বস্‌তে অনুরোধ করলেন। সূর্য্য তখন প্রায় অস্তগমনোন্মুখ অস্তগামী সূর্য্য চারিদিকে যেন ম্লান সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে—রাস্তায় যেতে যেতে আঁধার নেমে এল।

যখন আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে পৌঁছুলাম তখন চারিদিকে রাস্তাঘাট বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত। আমি মাদামের নিকট বিদায় গ্রহণ করবার সময় তিনি বল্‌লেন, "কাল আসবেন ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে স্বামিজীর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাল আমার কনসার্ট আছে।"

পরদিন মহীন বাবুর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলাম। দোভাষী বেরিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে সেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেলেন। তিনি বিষন্নমুখে জানালেন, "মাদামের শরীর অসুস্থ। কাল মঠ থেকে আস্‌তে তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছিল—তাইতে সর্দ্দি হয়েছে। বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গী ডাক্তার তাঁকে ঔষধ দিচ্ছেন। সর্দ্দির দরুণ তাঁর গান ঠিক হবেনা বলে আজকের কনসার্ট বন্ধ করতে বলেছেন—তাদের

টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ রাত্রেই আমরা কলকাতা ত্যাগ করে যাব।"

মহীনবাবু বল্লেন "মাদামের অসুস্থতা শুনে আমরা বড় দুঃখিত হ'লাম। আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি।" দোভাষী তাড়াতাড়ি বল্লেন,—"একটু অপেক্ষা করুণ, আপনারা এসেচেন তা মাদামকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথা শুনে বিদায় নেবেন।"

এমন সময় একজন ফরাসী মহিলা তাড়াতাড়ি এসে ফরাসী ভাষায় আস্তে আস্তে দোভাষীকে কি বল্লেন। দোভাষী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাদাম শয্যায় শায়িতা আছেন, পীড়িতা বলে তিনি আপনাদের সাক্ষাৎ করতে পারছেন না—তাই তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি তাঁর শয্যা কক্ষে আপনাদের ডাকছেন।"

আমরা ধীরে ধীরে মাদাম কাল্ভের শয্যাগৃহে প্রবেশ করলাম। একটি পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে তিনি শায়িতা ছিলেন। আমরা নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালাম। তিনি মহীন বাবুকে দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বল্লেন, "আপনি এসেছেন—বড় সুখী হ'লাম। মঠ থেকে ফিরে আসবার সময় ঠাণ্ডা লেগে বড় সর্দ্দি হয়েছে, আজ বম্বে মেলে কলকাতা ত্যাগ করবো।"

এই বলে মাদাম অর্দ্ধশায়িত ভাবে বালিসে হেলান দিতে উঠ্লেন। সেই সময় দেখতে পেলাম স্বামিজীর ফটোগুলি—যা আমরা বিবেকানন্দ সমিতি থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেম—বিছানায় ছড়িয়ে পড়লো। এই পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁর নির্জ্জন শয্যাকক্ষে ছবিগুলি বক্ষের উপরে রেখে দিয়েছিলেন—তাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। স্বামিজীর প্রতি এই শ্রেষ্ঠা গায়িকার—এই বিদেশিনী মহিলার কি প্রাণঢালা অনুরাগ! কি অসীম ভক্তি! মাদাম কাল্ভে ধীরে ধীরে সেই ছবিগুলি একে একে দেখে আবার তাঁর বক্ষের উপর রাখলেন। পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, কি আনন্দে কাল বেলুড় মঠে কাটালেম। বড় আনন্দ পেয়েছি—কাল আমার জীবনের একটি স্মরনীয় দিন। কখনও ভুলতে পারবো না।"

আমি বললাম "মাদাম! যদি কাল একটু আগে আসতেন তবে বোধ হয় এই অসুখ হ'ত না।"

মাদাম বললেন, "এই সর্দ্দিতে আমি কিছু মাত্র দুঃখিত হইনি। কাল মঠে যেন একটি সঙ্গীতের সুরের মত কবিতার কাব্যালোকের মত কেটেছে। স্বামিজীর সমাধিস্থান দর্শন করেছি। কি পবিত্র শান্তিময় স্থান!" ব'লে মাদাম একটি বন্ধ করা খাম বালিসের নীচে থেকে তুলে নিয়ে মহীন বাবুকে দিয়ে বললেন, "মঠে দেবেন—স্বামিজীদের জন্য। মহীন বাবু মাদামের সামনেই সেই খামটি আমাকে দিয়ে বললেন "শরৎমহারাজকে দিও।" আমরা বিদায় নিতে চাইলেম— মাদাম ধীরে ধীরে বললেন,—"আমি বড় আনন্দিত হ'লাম। স্বামিজীর কথা আর কি বলবো—তাঁর ধ্যানে তাঁর বাণীতে মানুষ নূতন জীবন গড়ে তুলতে পারে। জগতের পতিত দুর্ব্বল পদদলিত দরিদ্র ব্যথিতদের জন্য কি অগাধ প্রেম! কি বিরাট সহানুভূতি! বর্ত্তমানকালে তিনি খ্রীষ্টের মত মানবজাতির পরিত্রাতা—নবযুগের প্রবর্ত্তক।" আমরা নত হ'য়ে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। পথে আস্‌তে আস্‌তে মনে হল—স্বামিজীর কি অলৌকিক প্রভাব—কি অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব! কোথায় পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা—পাশ্চাত্য-ভোগবিলাসবর্দ্ধিতা—রাজা বাদশাহাদির আদৃতা—প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী এই ফরাসিনী নারী—আর কোথায় সর্ব্বত্যাগী কৌপীনসম্বল আকুমার ব্রহ্মচারী বেদান্তমূর্ত্তি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আজ কত বছর অতীত হল স্বামিজীর দেহত্যাগ হয়েছে, কিন্তু তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এমন একটি ব্যক্তিত্বের—একটি আদর্শের ছাপ এই ফরাসিনী মহিলার অন্তরে অঙ্কিত করে গেছেন যে শত সহস্র ভোগবিলাস আরাম ঐশ্বর্য্যের আবহাওয়ার মাঝখানেও তিনি তা ভুল্‌তে পারছেন না। মানবের পরিত্রাতা যীশুর মতই সেই মহাপুরুষের ভিতর পবিত্রতা, সরলতা ও জীবন্ত আদর্শ দেখতে পেয়ে এই শ্রেষ্ঠ গায়িকা রমণী তাঁর অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ স্বামিজীকে অর্পণ করেছেন। আমরা বাঙ্গালী আমরা ভারতবাসী আজও বুঝতে পাচ্ছিনি যে স্বামিজী সমগ্র জগতে—কি ইউরোপ, কি আমেরিকায়,

কি এই প্রাচ্যদেশে—ভাবী সভ্যতার কি মহাবীজ উপ্ত করে রেখে গেছেন, যা কালে মহামহীরুহ হয়ে প্রকাশ পাবে—যা কোনও সংকীর্ণ-গণ্ডী বা পাঁচিলে আবদ্ধ থাকবে না, যার ছায়াতলে বিশ্বের সন্তাপিত নরনারী বিমল প্রেমের মৃদুমন্দ হিল্লোলে পরম শান্তিতে ও আনন্দে সম্মিলিত হবে।

(বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)　　　শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

সর্ব্বানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মাতঙ্গাশ্রমে সর্ব্বানন্দ

অমাবস্যা তিথি ধরণী ঘোরতমসাচ্ছন্ন। বিশাল মহীরূহ সমূহ, বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া বিরাট দৈত্যের মত দণ্ডায়মান। জীনবৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া সমীরণ শন্ শন্ রবে বহিতেছে। এক প্রবীন জীনবৃক্ষ মূলে এক যুবক শবের উপর ধ্যান স্তিমিত নেত্রে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। যুবকের বদন মণ্ডল হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে! ঐ জ্যোতিঃ অমাবস্যার অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিতেছে। সহসা সেই কানন উজ্জ্বল করিয়া ভুবনমোহিণী জগত্তারিণী মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন, এবং এক অপূর্ব্ব অগ্নিশিখার কিরণের ন্যায় আলোক বহির্গত হইয়া মাতঙ্গাশ্রমকে আলোকিত করিয়া তুলিল। তখন মহাত্মা সর্ব্বানন্দ ঠাকুর স্তোত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

ত্বং ভূতলস্থাখিল যজ্ঞকর্ত্রী।
ত্বং নাক সংস্থাখিল যজ্ঞ ভর্ত্রী॥

ত্বমেব তুষ্টা খিলমুক্তি দাত্রী।
ত্বমেব রুষ্টা ত্রিজগন্নিহন্ত্রী॥
ত্বং সর্ব্বশক্তির্জগতাং চহিত্রী।
ত্বং সর্ব্বমাতা সকলস্য ধাত্রী॥
ত্বং বেদরূপাখিলবেদ বাচ্যা।
ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সকল প্রকাশ্যা॥
ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাং।
ত্বং বৈষ্ণবানাং পুরুষপ্রধানম্॥
ত্বং কৌলিকানা পরমাহি শক্তি
স্তমেব তেষামপি দিব্যভক্তিঃ॥

শ্রীশ্রীদেবী ভগবতী দশভূজা সর্ব্বানন্দ দেবকে বলিলেন। "বৎস! সর্ব্বানন্দ! তুমি সুমধুর স্তব পরিত্যাগ কর! আমি তোমার পুণ্য ও পাপহরণ পুর্ব্বক তোমাকে মোক্ষ দান করিতে পারি। আমি নিষ্কাম ও সকাম উভয় ভাবই দান করিতে পারি। আমার হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় সতত বিরাজিত থাকে! অতএব তুমি যে বর চাহিবে, আমি তাই তোমাকে দিব। সম্প্রতি আমি স্বনাথ সঙ্গ বিরহে বড়ই ব্যাকুল চিত্তে আছি।"

সর্ব্বানন্দদেব বলিলেন, "মা হরি হর ব্রহ্মা বিষ্ণু বিরিঞ্চি সেবিত অতি নিগূঢ় তোমার যুগল চরণারবিন্দ দর্শনেই আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্ত হইয়াছে সত্য! কিন্তু মা দয়াময়ি! যদি একান্তই অন্যবর দিতে ইচ্ছাকর তবে "পূনা দাদাকে" জিজ্ঞাসা কর।"

"অয়ি ত্রিভুবন জননি! তোমার সম্মুখে যে মহাযোগ বলে শবাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা চায় তাহাকে সেই বর প্রদান কর।"

শ্রীশ্রীভগবতী দশভূজা দেবী বলিলেন। "বৎস! পূর্ণ! তুমি যোগনিদ্রা পরিত্যাগ কর, জাগ্রত হও, উপবিষ্ট হও" ইহা বলিয়াই, দেবী, বাম পদ পূর্ণানন্দেরমস্তকে স্পর্শকরানমাত্রই পূর্ণ সংজ্ঞালাভ করিল তখন দেবী বলিলেন, "বাবা পূর্ণ আমার এ পরমরূপ দর্শন

করতঃ যথেচ্ছানুযায়ী বর গ্রহণ কর।" পূর্ণানন্দ জাগ্রত হইয়া ঐ ভুবনমোহিনী সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দর্শন করতঃ দিব্য শক্তিতে মত্ত হইয়া, ঐ দেবীকে স্তব আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীদেবী ভগবতী তাহার স্তোত্রে সাতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া পুনরায় বলিলেন "বাবা পূর্ণ! অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, আমাকে অবিলম্বে কৈলাস নগরীতে গমন করিতে হইবে।"

পূর্ণ বলিল, "ভক্ত বৎসলা পূর্ণ শক্তিরূপিণি মা! তুমি যদি দয়া করিয়া বাসনা পূর্ণ কর, তবে এই মূর্খ সর্ব্বানন্দকে এ ঘোর কলি-যুগে কালী-তারাদি দশমহাবিদ্যারূপে এখন প্রত্যক্ষ দর্শন দাও।" তখন জগজ্জননী স্বকীয় করুণা প্রকাশে দশভুজা ভগবতীরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা খণ্ড শক্তিরূপে দণ্ডায়মানা হইলেন। তৎকালে সর্ব্বানন্দদেব ও পূর্ণানন্দদাস তাহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিশিত-শায়কা সুর বিদারিণী।
হিমগিরিধ্বজাচলানবাসিনী॥
ভব-সরিত্তারী গিরিশ-কামিনী।
চরণ-নূপুরধ্বনি-বিনোদিনী॥
নত শুভঙ্করী শব-শিবোধরা।
রিপুভয়ঙ্করী-বনদিগম্বরা॥
জলধরদ্যুতিঃ সমরনাদিনী।
মদ-বিমোহিতাদ্বিরদ-গামিনী॥
জগদুপদ্রব-ব্রজ বিভাবরী।
শতদিবাকর-পরমসুন্দরী॥
অনিভৃতজ্বলৎ কুটিল-কুন্তলা।
শব-করাবলি ধৃত-কটিস্থলা॥
শতকোটি দিবাকর কান্তিযুতং।
বিধি বিষ্ণু শিরোমণি-রত্নধৃতম্॥

চলদুজ্জ্বল নূপুর গানযুতম্ ।
জগদীশ্বরী তারিণী তে চরণম্ ॥
বিষয়ানল-তাপিত তাপহরং ।
বিধিশৌরি-মহেশ-বিধানকরং ॥
শিবশক্তিময়ং ভবনাশকরং ।
জগদীশ্বরী তারিণী তে চরণম্ ॥
কুসুমাকর-শেখর-ধূসরিতম্ ।
মদমত্ত-মধুব্রত-গুঞ্জরিতম্ ॥
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং ।
জগদীশ্বরী তারিণী তে চরণম্ ॥

শ্রীশ্রীদেবী দশমহাবিদ্যা বলিলেন "বৎসগণ সুমধুর ও সুললিত পদ্য ছন্দের-স্তুতিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলাম। এখন তোমাদের ঈপ্সিত বর নাও, আমি এই মুহূর্ত্তেই হিমাদ্রি শিখরে কৈলাস আশ্রমে গমন করিব, বর্ত্তমানে আমি ভিন্ন কৈলাস নগরী শূন্যা।"

পূর্ণানন্দ বলিলেন। "মাতঃ! আর কি বর চাহিব, তোমার যুগল পাদপদ্ম দর্শনে অদ্য পূর্ণচন্দ্রের জীবন ও জন্ম সফল হইল। মা আজ হইতে তুমি সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমেহারেশ্বরী নামে অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও, আর তোমার দাসানুদাস সেবক (শূদ্র) পুনঃ তোমার নিকট একমাত্র প্রার্থনা করে যে, তোমার চরণ কমলে যেন সর্ব্বদা সর্ব্বানন্দ বংশোদ্ভবের শিষ্য সম্প্রদায়ের অচলা ভক্তি থাকে।"

"অয়ি! মেহারেশ্বরি! যে মন্ত্রের সাধনার দ্বারা ব্রহ্মময়ী স্বরূপা তোমার চরণদ্বয় আমি দেখিতেছি। এই সিদ্ধ মহামন্ত্র চিরদিন যেন ইহার বংশধরগণের সাধনমন্ত্র হয়, এবং অভীষ্ট সাধনে যেন বিঘ্ন না হয়।"

"মা! আজ রাজভবনে তোমার নিজদাস শম্ভুহত সর্ব্বানন্দ অমাবস্যাতে পূর্ণমাসি বলায় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা অতিশয় উপহসিত হইয়াছে সুতরাং ইহার সর্ব্ববিদ্যা লাভ হউক।"

দেবী বলিলেন, "বাবা পূর্ণ তুমি স্থির হও, আমি মেহার-ধাম পরিত্যাগের সময় আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখরূপ দর্পণের

দ্বারা ত্রিলোক আলোকিত করিব, তাহাতেই জ্যোৎস্নার কিরণ বিকসিত হইয়া পৌর্ণমাসী হইবে।"

অয়ি বিশ্বমোহিনি! তোমার চরণারবিন্দদর্শী সর্ব্বানন্দ বংশের শিষ্যগণ যেন সমৃদ্ধিশালী হয়। কখন যেন তাহারা অধার্ম্মিক না হয়। সর্ব্বানন্দ বিরচিত এই স্তব যাহারা ত্রিসন্ধ্যা ভক্তি সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবে, তাহাদের ত্রিবিধ দুঃখদূর হইবে ও তোমার চরণে যেন তাহাদিগের সতত ভক্তি জন্মে। অয়ি মাতঃ! সর্ব্বানন্দেশ্বরি! ব্রহ্মাদিদেবগণ প্রণাম করায়, তাহাদিগের মস্তকস্থ কিরীটের অগ্রভাগ দ্বারা তোমার যে চরণ আচ্ছাদিত হয় সেই চরণারবিন্দে আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

দশমহাবিদ্যা স্তোত্রে তুষ্টা হইয়া উভয়কে অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়া শিব সমীপে গমন করিলেন।

তখন রাত্রি অবসান প্রায়। উভয়ে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী

পৌরাণিকী

আনপু ও বাটা

(১)

যেদিন থেকে মানুষ পরস্পর কথা বলতে আরম্ভ করেছে সেইদিন থেকে গল্পেরও সৃষ্টি হয়েছে। সে সবগুলো যদি এক করা যেত তাহলে বড় বড় লাইব্রেরী ভর্ত্তি হয়ে যেত। কিন্তু লেখা না থাকায় এবং মনে না রাথায় তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। সভ্যতার ঊষা-ভাগে ইজিপ্টে যে সব গল্প প্রচলিত ছিল; তার মধ্যে একটি গল্প আবিষ্কার করা গেছে। বোধহয় জানা গল্পের মধ্যে এইটি সব চেয়ে প্রাচীন। গল্পটি পড়লে মনেহয় মানুষ এর অনেক পূর্ব্ব থেকেই বেশ জমাটি গল্প বলতে শিখেছিল। নানা হাতের মধ্য দিয়ে আমরা এ গল্পটি পাইনি। ঠিক যেমনটি লেখা হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় পাওয়া গেছে। কাজেকাজেই লেখক ও সময় সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদেরই প্রয়োজন হয় না। সেই বাদামী রংএর প্যাপিরাস (Papyrus) জরা জীর্ণ হয়ে গুড়িয়ে পড়ছে তার উপর চিত্রবর্ণে (Hieroglyiphic) লেখা পড়ে নির্দ্ধারিত হয় বত্রিশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আন্নানা (Annana) বলে একজন মিশরী পণ্ডিত লিখিত আনপু ও বাটার গল্প এখনও বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। গল্পটা প্রাচীনকালের মত কেবল ভূতুড়ে গল্প নয়। তথনকারের মানুষের কাজ ও চিন্তা নিয়ে লেখা। সে সময়টা হল ইজিপ্টের উনবিংশ সাম্রাজ্যের সমসাময়িক। প্রথমটা বেশ সরল গ্রাম্য গাথায় লিখিত, কিন্তু শেষের দিকে আবার অসম্ভব আজগুবি ব্যাপারে পরিপূর্ণ। গল্পটা এই রকম :—

আনপু ও বাটা

একই বাপ মায়ের দুই ছেলে ছিল। বড়র নাম আনপু ছোটর নাম

বাটা। এখন আনপুর একটি মাত্র স্ত্রী ও একটি ঘর ছিল, কিন্তু তার ছোট ভায়ের বে হয়নি এবং সে তাদের ছেলের মত ছিল। সে তাদের কাপড় তৈরী করে দিত, গরু মাঠে নিয়ে যেত, চাষের কাজ করত, ধান কাটা প্রভৃতি সব ক্ষেতের কাজ দেখত। দেখ, তার ছোট ভাই কেমন সুন্দর খাটিয়ে হয়ে উঠেছিল। তার মত খাটিয়ে সে দেশে কেউ ছিল না, তাই দেবতার আত্মা তার মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল।

দৈনন্দিন জীবন

ছোট ভাই এমনি রোজ মাঠে গরু নিয়ে যায় আর সন্ধ্যে বেলা ক্ষেতের সব ফসল, গরুর দুধ, বনের কাঠ আর চাষ বাসের যন্ত্রপাতি নিয়ে ফিরে আসে; এসে তার বড় ভাই ও তার স্ত্রী যেখানে বসে থাকে তাদের সামনে এনে সব ধরে দেয়।

তারপর সে পান ভোজন করে গোয়ালের একপাশে গিয়ে ঘুমোয়, আবার ভোরে উঠে রুটি সেঁকে ভায়ের কাছে দিয়ে আসে।

তারপর কতকরুটি নিজের সঙ্গে নিয়ে গরু চরাতে মাঠে যায়। যখন সে গরুর পিছনে পিছনে মাঠে যায়, তখন লোকে তাকে বলে "তোমাদের ক্ষেতে কি ফসলই হয়েছে"। তাই শুনে সে তাদের সঙ্গে করে ক্ষেতের যেখানে খুব ভাল ফসল হয়েছে সেই খানে নিয়ে গিয়ে দেখায়। তার পালের গরু ও ভেড়া গুলি খুব সুন্দর ছিল, আর ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

চাষের সময় তার বড় ভাই একদিন বল্লে, "এক জোড়া ভাল বলদ ঠিক্ কর। নতুন যে চর-জমিটা উঠেছে সেইটায় লাঙ্গল দিতে হবে। কালকে একেবারে আমরা বীজ সঙ্গে করে মাঠে যাবো। ছোট ভাই এক জোড়া বলদ যোগাড় করে রাখলে।

ভোর হতেই তারা মাঠে বেরিয়ে গেল, ক্ষেত দেখে তারা ভারী খুসী হয়ে লাঙ্গল দিতে লাগল। লাঙ্গল দেবার পর তাদের বীজের কথা মনে পড়ল, বীজ আনা হয়নি। বড় ভাই ছোট ভাইকে বল্লে দৌড়ে গিয়ে গোলা থেকে বীজ নিয়ে এস।

ছোট ভাই বাড়ী গিয়ে দেখলে তার বড় ভায়ের স্ত্রী চুল বাঁধছে। সে বল্লে "শীগ্‌গির উঠে বীজ বের করে দাও, আমার বড় ভাই আমাকে শীগগির বীজ নিয়ে ফিরে যেতে বলেছে।" তাই শুনে তার বড় ভায়ের স্ত্রী বল্লে "তুমি নিজে গোলা খুলে তোমার ইচ্ছামত বীজ বের করে নাও, আমি এখন চুল বাঁধছি উঠতে পারব না।"

বাঘের ক্রোধ

যুবক গোলা বাড়ী ঢুকে গম ও বার্লির বীজ যথেষ্ট পরিমাণে বস্তাবন্দি করে নিয়ে বেরুলো। তার ভায়ের স্ত্রী জিগেস করলে কাঁধে করে কত বীজ নিয়ে যাচ্ছ। সে বল্লে তিন বুসেল বার্লি ও দুই বুসেল গম সব শুদ্ধ পাঁচ বুসেল। তার ভায়ের স্ত্রী বল্লে "এত বড় বোঝা তুমি কি করে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার গায়ে ত খুব জোর। আমি তোমার এই জোর রোজ লক্ষ্য করি।" তারপর কাছে এসে বল্লে "এস না খানিক বসে গল্প করা যাক, আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর পোষাক তৈরি করব।" যুবক তার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে দক্ষিণে বাঘের মত গর্জ্জে উঠল। তাতে সে খুব ভয় পেলে। সে তার ভ্রাতৃ-জায়াকে বলতে লাগল "দেখ আমি তোমাকে আমার মার মত এবং তোমার স্বামীকে আমার বাপের মত মনে করি, কারণ আমার বড় ভাই আমাকে মানুষ করেছে। একি অসদভিপ্রায় তুমি আমার কাছে প্রকাশ করছ। আর কখন এমন কথা আমার কাছে বল না, এ কথা আমি আর কাকেও বলব না। আমি চাই না যে আর কারুর মুখে এ কথা শুনতে পাই।" এই বলে সে তার বোঝা ঘাড়ে করে মাঠে চলে গেল। এবং তার ভায়ের সঙ্গে একত্র কাজ আরম্ভ করে দিলে।

মিথ্যাবাদী স্ত্রীলোক

সন্ধ্যে বেলা বড় ভাই ঘরে ফিরে এল। পেছনে বলদ ও চাষের জিনিষ পত্র কাঁধে করে ছোট ভাই। তারপর গোয়ালে গরু গুলো বিশ্রামের জন্য রেখে দিলে। এদিকে তার বড় ভায়ের

স্ত্রী তার নিজের কথার জন্য মনে মনে খুব ভয় পেল। সে তখন করলে কি—যেন খুব মার খেয়েছে এই রকম ভান করে শুয়ে রইল। তার স্বামী রোজ যেমন মাঠ থেকে ফিরে আসে, তেমনি এসে দেখলে তার স্ত্রী অসুস্থ। সে আজ তার হাতে জল দিতে এল না ঘরের আলোও জ্বালেনি, অসুখের ভান করে শুয়ে রইল। তার স্বামী বল্লে "তোমাকে কে কি বলেছে," সে বল্লে "কেউ আমায় কিছুই বলেনি, কেবল তোমার ছোট ভাই ছাড়া। তোমার জন্য যখন সে বীজ নিতে আসে, তখন আমায় বল্লে, 'এস আমরা বসে গল্প করি, তোমার চুল বেঁধে দি'।" এই রকম বলায় আমি বল্লুম, 'দেখ, আমি তোমার মার মত, তোমার বড় ভাই তোমার বাপের মত। এই শুনে সে ভয় পেয়ে যাতে আমি একথা তোমাকে না বলি সেই জন্য প্রহার করতে লাগল। দেখ, তুমি যদি তাকে মেরে না ফেল ত আমি মরব। ওই সে আসছে। এই দিনের আলোতে সে যে রকম ব্যবহার আমার প্রতি করেছে তা আমি তোমার কাছে নালিশ করছি'।

প্রতিশোধের প্রতীক্ষায়

বড় ভাই শুনে দক্ষিণে বাঘের মত হয়ে উঠল। সে তার ছুরিতে ধার দিয়ে গোয়ালের দরজার পেছনে ওত পেতে দাঁড়িয়ে রইল; যেই তার ছোট ভাই গরু নিয়ে সন্ধ্যে বেলা গোয়ালে ঢুকবে অমনি তার বুকে বসিয়ে দেবে।

এদিকে সূর্য্য অস্ত গেল ছোট ভাই তার শস্যের বোঝা রোজ যেমন কাঁধে করে নিয়ে আসে তেমনি করে বাড়ীর দিকে আসতে লাগল। তার পরে যখন সে বাড়ী এল তখন তার পালের প্রথম গরুটা গোয়ালে ঢুকেই বলে উঠল "দেখ তোমার বড় ভাই তোমাকে ছুরি মারবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। তুমি শীঘ্র পালাও। সে সে-কথা শুনলে এবং দ্বিতীয় গরুটা ঢুকেও তাকে সেই কথা বল্লে। শুনে সে দরজার তলার দিকে দৃষ্টি করতেই তার বড় ভায়ের পাদুটি দেখতে পেলে। দেখেই সে তার পিঠের বোঝা মাটিতে ফেলে প্রাণ-

পণে ছুটতে লাগল। তার বড় ভাইও তার পেছনে পেছনে সেই ছুরি নিয়ে ছুটল।

তখন ছোট ভাই চিৎকার করে রা হারাখ্‌তির (Ra Harakhti) কাছে প্রার্থনা করলে "হে প্রিয় প্রভু! যিনি সৎ এবং অসৎকে বিভাগ করেছেন তিনি তুমিই।' রা তার প্রার্থনা শুনলেন এবং দুই ভায়ের মাঝখানে একটা নদী সৃষ্টি করে দিলেন, আর সে নদী একেবারে কুমীরে পরিপূর্ণ। এক ভাই এপারে, আর এক ভাই ওপারে।

বড় ভাই ছোট ভাইকে মারতে না পেরে দুবার নিজের হাত কামড়ালে। ছোট ভাই চিৎকার করে বড় ভাই কে বল্লে, 'প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাক। যখন রা উঠবেন তখন তাঁর সামনে আমাদের বিচার হবে। তিনিই ভাল মন্দর ভেদ জানেন। তোমার সঙ্গে আর কখন আমি বাস করব না। তুমি যেখানে থাকবে আমি সেখানে আর কখন যাব না। আমি একেসিয়ার উপত্যকায় গিয়ে বাস করব।'

পৃথিবীতে যখন আলো এল, পরের দিন যখন রা-হারাখ্‌তি উঠলেন, দুই ভাই পরস্পরের মুখ দেখতে পেলে তখন ছোট ভাই বড় ভাইকে বল্লে, "অমন চতুরতা করে তুমি আমাকে মারতে গেলে কেন? আমার মুখের কথাত তুমি কিছুই শুনলে না। আমি তোমার সত্যি সত্যি ভাই। তুমি আমার বাপের মত এবং তোমার স্ত্রী আমার মার মত।—নয় কি? সত্যি কথা বলছি আমাকে যখন তুমি শস্যের জন্য পাঠিয়েছিলে তখন তোমার স্ত্রী বল্লে 'এস আমার কাছে থাক; তার পর দেখ সেই ব্যাপারটা এখন অন্য রকম দাঁড়িয়েছে।"

সত্যের প্রকাশ

ছোট ভাই বড় ভাইকে বুঝিয়ে দিলে কি ঘটনা ঘটেছিল। তার-পর সে রা-হারাখ্‌তির নাম করে বল্লে, "তুমি চাতুরীতে ভুলে তোমার ছুরি নিয়ে যে নীচ কাজ করতে এসেছিলে তা আমি সম্পূর্ণ করছি।" এই বলে সে তার ছুরী বের করে দেহের খানিকটা মাংস কেটে জলে

ফেলে দিলে। মাছেরা তা খেয়ে ফেল্লে। সে মাটিতে পড়ে গেল। অত্যন্ত রক্তস্রাবে ক্রমে তার জ্ঞান লোপ হল।

বড় ভাই তাই দেখে নিজেকে নিজে গালাগালি দিতে লাগল ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। এবং কি করে পার হয়ে ওপারে যাবে তা ভেবে পেলে না—কারণ জল কুমীরে পরিপূর্ণ। ছোট ভাই জোরে চেঁচিয়ে বল্লে, "তুমি এমন খারাপ মতলব করলে কেন? এখন তোমার সৎ কাজ করা উচিৎ। যেমন আমি তোমার প্রতি করেছি। তুমি বাড়ী ফিরে যাও, গিয়ে নিজের গরু বাছুর দেখ, কারণ তুমি যেখানে থাকবে, আমি সেখানে আর থাকব না। আমি একেসিয়ার উপত্যাকায় যাচ্ছি। এখন তোমার আমার জন্য কি করা উচিৎ? একবার তুমি আমাকে খুঁজতে বেরিও, তারপর তুমি একটা ব্যাপার দেখবে—সেটা কি তা বলছি।"

শাস্তি

"ঘটবে---আমি আমার আত্মাকে বের করে একেশিয়া ফুলের ওপর রাখব। যখন একেশিয়া গাছ কাটা হবে, ওই ফুলও তার সঙ্গে মাটিতে পড়বে। তুমি তার সন্ধানে বেরিও, সাত বছর সন্ধান করেও যদি না পাও ত ধৈর্য্য হারিও না। তুমি খুঁজে পাবেই। তারপর ফুল-টাকে একবাটি ঠাণ্ডা জলে রেখে দিও। মনে রেখ আমি একদিন জীবন পাবই। এবং যে দোষ করা হয়েছে তার উত্তর দেব। আরও তুমি জানতে পারবে যে একটা বিপদ আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, যখন দেখবে কেউ তোমায় একবাটি মদ (beer) দিলে, তা উৎলে পড়ছে। তখন আর তুমি অপেক্ষা কর না। আমার খোঁজে বেরিও। আমি সত্যি বলছি এ ঘটবেই।" ছোট ভাই একে-শিয়ার উপত্যকায় চলে গেল। বড় ভাই মাথায় হাত দিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরল। পাগলের মত নিজের মাথায় নিজে ধুলো দিতে লাগল, বাড়ী ফিরেই সে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়ালে। তারপর সে তার ভায়ের জন্য শোক করতে বসল।

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রভাতী দেবী

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি

(১)

প্রাচীনকালে দ্বিজাতিগণের জীবন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ বিদ্যাশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শুধু পুস্তক পাঠেই এই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইত না। কঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা শিক্ষার্থী আপনাকে ভবিষ্যৎ জীবনের গুরু দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইত। এইজন্য ইহার নাম হইয়াছিল "আশ্রম"। (শ্রমু তপসি খেদে চ)

অধ্যয়নকাল অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহার আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা সমাপ্ত হইত তাহা নহে ; জীবনের প্রত্যেক ভাগের জন্যই কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য তাহাকে প্রতিনিয়ত আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইত। বস্তুতঃ ভারতীয় আর্য্যের সমগ্র জীবনই ছিল একটা বিরাট তপস্যা (আশ্রম)। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম জীবনসৌধের ভিত্তিস্বরূপ। এই জন্য আর্য্যঋষিগণ এই আশ্রমের জন্য কঠোর বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

উপনয়ন ও অধ্যয়ন কাল

উপনয়ন সংস্কার করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা হইত। সাধারণতঃ সপ্তমবর্ষে ব্রাহ্মণের, দশমবর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং একাদশবর্ষে বৈশ্য বিদ্যার্থীর উপনয়ন হইত। ১। মনু বলেন, "প্রকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃকামী ব্রাহ্মণের গর্ভ পঞ্চম (অর্থাৎ গর্ভের আরম্ভকাল লইয়া পঞ্চমবর্ষ) ; বলার্থী ক্ষত্রিয়ের গর্ভ ষষ্ঠ ও ধনকামী বৈশ্যের গর্ভ অষ্টম বৎসরে দীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।"

---

১ গৌতমসংহিতা ১

(১)। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের ও দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত বৈশ্যের উপনয়ন কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। (২)। মানসিক শক্তির তারতম্যের *জন্যই* বোধ হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিদ্যার্থীর উপনয়ন কালের মধ্যে এরূপ পার্থক্য বিহিত হইয়া ছিল। বৌদ্ধগণের ভিতরেও সাধারণতঃ সপ্তম বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হইত। (৩) উপনিষদে বার বৎসর, বত্রিশ বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল অধ্যয়নের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৪)। গৃহ্য সূত্রে ৪৮ বৎসর অধ্যয়নকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। (৫)। গৌতম বলেন, "এক একটি বেদ অধ্যয়নে বার বৎসর অতিবাহিত করিবে। (৬)। কাজেই যে বিদ্যার্থী চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিত তাহাকে ৪৮ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। বোধায়নের মতে ৪৮ বৎসর শিক্ষকের নিকট বাস করাই সমীচীন। (৭)। কেহ কেহ অথর্ব্ব বেদকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁহাদের মতে অধ্যয়ন কাল ৩৬ বৎসর ব্যাপী। *মনু বলেন, শিক্ষার্থীকে* ৩৬ বৎসর আচার্য্যের নিকট বাস করিয়া বেদাধ্যয়ণ করিতে হইবে। অথবা অর্দ্ধেক কাল কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যতদিন পর্য্যন্ত বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয় ততকাল গুরুগৃহে যাপন করিতে হইবে।" (৮) মেগাস্থিনিসের (৩০০ খৃঃ পূঃ বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে ভারতের বিদ্যার্থী ৩৭ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিত। অবশ্য সকল বিদ্যার্থী এত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিত না। গুরুগৃহে থাকিয়া ১২ বৎসর অধ্যয়নই

---

(১) মনুসংহিতা ২।৩৭
(২) গৌতম ১
(৩) মহাবগ্‌গ ১।৩২।১
(৪) ছান্দোগ্য ৬।১।২, ৮।৭।৩
(৫) পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২।২
(৬) গৌতম ২
(৭) ১।২।৩
(৮) মনুসংহিতা ৩।১-২

সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। (১) বৌদ্ধশাস্ত্র মতে ১০ বৎসর আচার্য্যের নিকট শিক্ষালাভই প্রশস্ত ছিল। (২)।

(২)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষার বিশেষত্ব এই ছিল যে উহাতে শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইত। আচার্য্য শিষ্যকে শুধু পুস্তকের বিদ্যা প্রদান করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন না। ভারতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল—চরিত্র গঠন। দুশ্চরিত্র ছাত্র তাহার চরিত্র সংশোধন না করিলে কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিত না। সংহিতাকার উশনাঃ বলেন "গুরু এক বৎসর এরূপ শিষ্যকে শিক্ষাদান না করিয়া তাহাকে ঐ সময়ের মধ্যে ভাল করিতে চেষ্টা করিবেন।" এক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিলে পর গুরু তাহাকে আচার সম্পন্ন মনস্বী এবং সর্ব্বদা হিতকারী জানিতে পারিয়া উহাকে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করিবেন। (৩)

শারীরিক শিক্ষা

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীকে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতে হইত। সূর্য্যোদয়ের পরে যে ব্রহ্মচারী গাত্রোত্থান করিত তাহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। (৪)

সুস্থশরীরে দিবাভাগে নিদ্রা গেলে স্নানান্তে সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিয়া এক শতবার গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা ছিল। (৫) অরণ্য হইতে যজ্ঞার্থে সমিধ সংগ্রহ, গোচারণ, গুরুর গৃহকর্ম্ম সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মচারীর যথেষ্ট শরীর চালনা হইত।

---

(১) ছান্দোগ্য ৬।১।২
আশ্বলায়ন ১।২২।৩
(২) মহাবগ্‌গ ১।৩২।১
(৩) উশনঃ সংহিতা ৩।৩৩-৩৪
(৪) মনু ২।২২০
(৫) সংবর্ত্তসংহিতা ৩৩

ভিক্ষাচর্য্যা

বিদ্যার্থী ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিত কিন্তু ভিক্ষান্ন একজন গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিত না। (১)। মনু বলেন, যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠান-যুক্ত সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব বৃত্তিতে কালযাপন করিতেছেন ব্রহ্মচারী প্রতিদিন তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। (২) অভিশপ্ত কিংবা মহাপাতকাদি যুক্ত গৃহস্থের অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলিলে নিকট আত্মীয়, গুরু কিম্বা চাতুর্ব্বর্ণের যে কোন ব্যক্তির গৃহে ভিক্ষা করা যাইত। (৩) বিদ্যার্থী এইরূপে দেশবাসীর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষালাভ করিত। সুতরাং প্রথম হইতেই তাহার মনে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য বোধ জাগিয়া উঠিত এবং উত্তরকালে সে তাহার সমুদয় শিক্ষা দেশবাসীর হিতার্থে নিয়োজিত করিত।

বিদ্যার্থীর আহার

যে সকল দ্রব্য আহারে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা জন্মিতে পারে বিদ্যার্থীকে ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে হইত। মধু, মাংস, গুড় দধি গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী দিবাভাগে ও রাত্রিকালে দুইবার মাত্র আহার করিত। (৪) বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আহার করিবার বিধি ছিল; কারণ ভক্তিভাবে প্রতিদিন অন্ন ভোজন করিলে সামর্থ্য ও বীর্য্যলাভ হয়; পরন্তু অশ্রদ্ধার সহিত অন্নভোজন করিলে উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। (৫) অতি ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। (৬)

(১) মনু ২।১৮৮
(২) মনু ২।১৮৩
(৩) মনু ২।১৮৪,১৮৫
(৪) সংবর্ত্তসংহিতা ১২
(৫) মনু ২।৫৫
(৬) মনু ২।৫৭

বিদ্যার্থীর বেশভূষা

বিদ্যার্থীকে সর্ব্বতোভাবে বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইত। সুতরাং তাহার পরিচ্ছদের ভিতরে কোন প্রকার উপকরণ বাহুল্য ছিল না। পরিধেয়, উত্তরীয় মেখলা দণ্ড ও উপবীত—ইহাই ছিল ব্রহ্মচারীর পরিচ্ছদের অঙ্গীভূত সামগ্রী। উত্তরীয় জামার কাজ করিত, মেখলা ছিল কটিবন্ধ; উহা পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়কে আঁটিয়া রাখিত। ব্রহ্মচারীকে হিংস্র জন্তু সমাকুল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞার্থে সমিধ্ সংগ্রহ করিতে হইত, গরু চরাইতে হইত, এই কারণে দণ্ড তাহার নিত্য সহচর ছিল। দণ্ডটি অধ্যয়নের সময়েও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। (১)। উপাসনা কার্য্যে উপবীতের বিনিয়োগ হইত।

বিদ্যার্থীর পক্ষে পাদুকা বা ছত্রধারণ, গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ তৈল ব্যবহার ও কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুরঞ্জন নিষিদ্ধ ছিল। (২) দর্পনে মুখাদি অবলোকনও নিষিদ্ধ ছিল। (৩)।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের ব্রহ্মচারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। শুধু পোষাক দ্বারাই বুঝা যাইত কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয় এবং কে বৈশ্য। বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর পরিধেয় ছিল শাল বস্ত্র ক্ষত্রিয়ের ক্ষৌম বস্ত্র আর বৈশ্যের মেষলোম সম্ভূত বস্ত্র। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ব্যবহার করিত, ক্ষত্রিয় রুরু নামক মৃগ বিশেষের চর্ম্ম এবং বৈশ্য ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় পরিধান করিত। ব্রাহ্মণের মেখলা মুঞ্জা তৃণের, ক্ষত্রিয়ের মূর্চ্চার (যাহা দ্বারা ধনুর ছিলা প্রস্তুত হইত) এবং বৈশ্যের মেখলা শনতন্তু নির্ম্মিত ছিল। দণ্ডটি সরল ও ত্বকযুক্ত হওয়া আবশ্যক ছিল। ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী বিল্ব অথবা পলাশের দণ্ড ব্যবহার করিত এবং উহা কেশ পর্য্যন্ত উচ্চ হইত। ব্রাহ্মণ

---

(১) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা—১

(২) মনু ২।১৭৭-১৭৮

(৩) উশনঃ সংহিতা—২

ব্রহ্মচারীর উপবীত কার্পাস সূত্রের, ক্ষত্রিয়ের উপবীত শণ সূত্রের এবং বৈশ্যের উপবীত মেষলোমের সূত্রে প্রস্তুত হইত। (১)।

কেহ কেহ বলেন—"ব্রাহ্মণের পক্ষে বৃক্ষত্বক্ নির্ম্মিত কাষায় বস্ত্র এবং বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ঐ জাতীয় মাঞ্জিষ্ট এবং হারিদ্র বস্ত্র বিহিত ছিল। (২)। ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ফেলিতে হইত। ক্ষত্রিয় বিদ্যার্থী মস্তকে জটা রাখিত আর বৈশ্য বিদ্যার্থী শিখা রাখিত। (৩)।

নৈতিক শিক্ষা

বিদ্যার্থীকে সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করিতে হইত। সামান্য পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের অসংযমের জন্যও শাস্ত্রকারগণ কঠোর প্রয়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন। (৪)। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ব্রহ্মচারী নিষ্ঠুর বাক্য, জীবহিংসা, অশ্লীল বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক মিথ্যা হউক পরের দোষ উল্লেখ করা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। (৫)। উশনাঃ বলেন 'সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে, আত্মাকে বশীভূত করিবে। ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে, পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতজনক সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। (৬)। জৈন শাস্ত্রও শিক্ষার্থীকে ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছে। 'আত্ম-সংযম কর; আত্ম-সংযম বড় কঠিন, যদি আত্ম-সংযমে সমর্থ হও,

(১) মনুসংহিতা ২।৪১—৪৬
(২) গৌতম—১
(৩) গৌতম—১
(৪) সংবর্ত্ত সংহিতা—২৮।২৯
বিষ্ণুসংহিতা ২৮।৪৮—৫৩
মনু ২।১৮০—৮১
(৫) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।৩৩
(৬) উশনঃ সংহিতা—৩।১৫

ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্র সুখী হইবে। (১)। গীতবাদ্য ও নৃত্যাদিতে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে বলিয়া ঐগুলি ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয় ছিল। (২)। বিদ্যার্থীর পক্ষে অক্ষাদি ক্রীড়াও নিষিদ্ধ ছিল। (৩)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

বিদ্যার্থীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শাস্ত্রকারগণ প্রাত্যহিক উপাসনা ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাকে প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ও সায়ংকালে উপবিষ্ট হইয়া গায়ত্রী উপাসনা করিতে হইত। (৪)। উপাসনা নির্জ্জন অরণ্যে যাইয়া করিতে হইত। (৫)। উভয় সন্ধ্যায় স্নান করার বিধি ছিল। (৬)। ব্রহ্মচারিগণ পুষ্প পত্র ও জল দ্বারা দেবপূজা করিত। (৭)। স্নান করিয়া দেব ঋষি ও পিতৃ তর্পণ এবং উভয় সন্ধ্যায় সমিধ দ্বারা, হোম করিত। (৮)।

(ক্রমশঃ)

অধ্যাপক—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

---

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—৬ষ্ঠ ভাগ
পৃঃ—১৫৩

(২) উশনঃ সংহিতা ৩।১৭

(৩) মনু ২।১৭৯

(৪) মনু ২।১০১

(৫) মনু ২।২১৯

(৬) বিষ্ণু ২৮।৫

(৭) উশনঃ ১।১৬—১৭

(৮) মনু ২।১৭৬

সংঘ-বার্ত্তা

১। স্বামী বিজয়ানন্দ টালায়, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ ইটালী অর্চ্চনালয়ে এবং ভবানীপুর রামকৃষ্ণ সমিতিতে, স্বামী অসিতানন্দ বাগবাজারে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শুনাইতেছেন।

২। কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস হোমের নূতন ও পুরাতন ছাত্রগণ বিগত ২৮শে জুন হইতে ১লা জুলাই পর্য্যন্ত একটি মিলোনৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বামী নিখিলানন্দের সভাপতিত্বে একটি অভার্থনা সভায় পুরাতন বিদ্যার্থিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়। আলবার্ট হলে জাস্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক অধিবেসনে শ্রীমান্ বিমলকুমার দত্ত, স্বামী অব্যক্তানন্দ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। ১লা জুলাই এ্যটর্নী শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত দমদম্ ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্ত্তী গৌরীপুর গ্রামে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত জমিতে উৎসবাদির পর স্বামী সচ্চিদানন্দের সভাপতিত্বে বিদায় সভার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

৩। আমাদের বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষ কার্য্য বিস্তৃত হইতেছে কিন্তু অর্থাভাবে সম্পূর্ণ সাহায্য আমরা দিতে পারিতেছি না। অতএব দাতাগণ চাউল, অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি (১) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়মঠ পোঃ, হাওড়া, (২) ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্য্যালয়, বাগবাজার কলিকাতা, অথবা (৩) ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ১৮২।এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই সকল ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পুস্তক-পরিচয়

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা ১৯২৭ সালের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইলাম। বাহিরের দরিদ্র ও উপযুক্ত ছাত্রদিগকে নানা প্রকার শিল্পকার্য্য ও লৌকিকবিদ্যা, যথা, বেতের কাজ, দর্জ্জির কাজ,, কৃষি প্রভৃতি বিনা

বেতনে আশ্রমের কর্ম্মিগণ শিক্ষাদান করিতেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট-ল যে নূতন জমি দান করিয়াছেন, সেখানে শীঘ্রই ঐ আশ্রম স্থানান্তরিত করা হইবে।

২। অপূর্ব্ব-সাধনা—শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—ঠাকুর সর্ব্বানন্দের দশমহাবিদ্যা—সিদ্ধি-বৃত্তান্ত—মূল্য দেড় টাকা।

৩। মেহার-মাহাত্ম্য—শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় কাব্য-বিনোদ—মেহার-নিবাসী শ্রীসর্ব্বানন্দের অদ্ভুত সাধন ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ বৃত্তান্ত এবং নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনাতত্ত্ব সংবলিত ভক্তি রসাত্মক গদ্য-পদ্যময় উপন্যাস—মূল্য বার আনা।

৪। সর্ব্বানন্দ-মঠ—অধুনা প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বানন্দ মঠের কার্য্য-বিবরণী।

৫। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯২২-২৭ পর্য্যন্ত অগ্নি, ঝড়, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ কার্য্যের বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯২২ সালে মেদনীপুর, রাজসাহী, হুগলী ও ফরিদপুর যে বন্যা কার্য্য এবং গঙ্গাসাগর মেলায় যে সেবাকার্য্য হয় তাহাতে ১৫১৯৯৸৵১৫, ১৯২৩ সালে শোনবন্যা কার্য্যে ৫০৪৮।৫, ১৯২৩ সালের মানভূম অগ্নি কার্য্যে ৬১৮৸৵০, ১৯২৪ সালে পাঞ্জাব প্লেগ রিলিফে ৯৮৭৷৴০ গঞ্জাম ঝড়ে ৩০৯৬৸৵১৫, ঐ সালের বাংলা এবং আসামের অগ্নি কার্য্য ২৫৭৫৸৴৫, ঐ সালে বিহার বন্যা কার্য্যে ৪৬৮৫৶০, ঐ সালের গঙ্গা যমুনা বন্যাকার্য্য ২৮৮৩৷৵১০, ঐ সালে জয়ন্তী পাহাড়ে কলেরা সেবাকার্য্যে ৮৮৸০, ১৯২৫ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যা কলেরা বসন্ত এবং ম্যালেরিয়া সেবাকার্য্যে ৫০৲ টাকা (স্থানীয় লোকেরা ব্যয়ভার বহন করায় আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয় নাই), ১৯২৬ সালে মাদারিপুর ঝড়ের কার্য্যে ১৩১২৸৵১০ এবং পাঁচগুড়া, ভুবনেশ্বর অগ্নি কার্য্যে ৪১০৲ টাকা, ঐ সালের সাঁওতাল পরগণার, দুর্ভিক্ষ কার্য্যে ২৮২১৸৶০, ঐ সালের মেদনীপুর বন্যাকার্য্যে ১০৪৯৸৶৫, ১৯২৭ সালের আন্ধারুয়া ভুবনেশ্বর অগ্নিকার্য্যে ৩৫৫৵৫, ঐ সালে বালেশ্বর বৈতরণী বন্যাকার্য্যে ১০১৭৩৲১৫ টাকা খরচ হয়।

৬। বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের গুজরাট বন্যাকার্য্যের বিবরণী আমরা পাইয়াছি ১৯২৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সেখানে যে কার্য্য হয় তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণোপলক্ষে ৫৪০১৮৷৶১০ টাকা এবং সর্ব্বসমেত ৪৮৮২০৸৶১৫ খরচ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ গীতা, ৪।১৩ ॥

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলচেন, গুণ এবং কর্ম্মের অনুযায়ী আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র) সৃষ্টি করেছি, এখন প্রশ্ন হচ্চে এই গুণ এবং কর্ম্ম জাতিগত (কোনও বিশেষ জাতিতে জন্মালেই সেই বর্ণের বিশেষ গুণ তাতে থাকবেই)?—না জন্ম-গত? এর উত্তরে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলচেন,—

ত্রিবিধাভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ১৭।২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১৭।৩ ॥

দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী—এই তিন প্রকারই হয়ে থাকে, উহা স্বভাব-সম্ভূত অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার হতে জাত; সেই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা শ্রবণ কর। হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারিনী; এই সংসারী জীব শ্রদ্ধাময়, যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিল, সে এই জন্মে তাদৃশই শ্রদ্ধাযুক্ত হয়।

এখন যে যেমন শ্রদ্ধা নিয়ে জন্মায় তার সেই রকম গুণ ও কর্ম্ম প্রকাশ পাবেই। তখন চাতুর্ব্বর্ণ্যকে জাতিগত কি করে বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ত সেই লোকে সাত্ত্বিকগুণ দেখা

যায় না; কাজে কাজেই সত্ত্বগুণ ও কর্ম্মানুযায়ী ব্রাহ্মণই ধর্ম্মগুরু, শিক্ষক, সুনীতির পথপ্রদর্শক, বিধিব্যবস্থাদির নিয়ামকরূপে সমাজের নেতৃত্ব করে এসেছেন। ইউরোপে পূর্ব্বে জমীদাররূপ এক অভিজাত সম্প্রদায় (Aristocracy) সমাজের ওপর প্রভুত্ব করে। পরে সেখানে ব্যবসায়িক এক নব অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা Aristocracy না বলে Plutocracyও বলতে পারি; তাঁরাই পরে সমাজের শাসন ভার গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু ভারতে কথনও সে রকম কোনও অভিজাত শক্তি সমাজ শাসন করেনি। জ্ঞানে ও চরিত্রে শ্রেষ্ঠ এক অভিজাত শক্তিই চিরকাল ভারতীয় সমাজ শাসন করে এসেছে। একে আমরা ইংরেজীতে An Aristocracy of learning, wisdom, and spirituality বলতে পারি। কিন্তু ক্রমে সাধারণের প্রদত্ত বৃত্তির প্রাচুর্য্যে, বিষয় সম্পত্তি লইয়া অধিক সময় ক্ষেপ করায় তাঁদের স্থান সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অধিকার করে নেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের আধিক্যই জন্মগত ব্রাহ্মণ জাতিগত হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু ব্রাহ্মণের কুলে জন্মালেই যে ব্রাহ্মণ-বৃত্তি-সম্পন্ন হবে এমন কোনও নিয়ম না থাকায় পরবর্ত্তী স্মৃতিকারদের ব্রাহ্মণের নানারূপ উচ্চনীচ ব্যাখ্যা করতে হয়েচে। অত্রি সংহিতাতে ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত বিভাগ পাওয়া যায়—

দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট।

যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, পূজা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁকে 'দেব' ব্রাহ্মণ বলা হয়।

শাক পত্র ফলমূল ভোজী বনবাসী এবং নিত্য শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ 'মুনি' নামে কথিত হন।

যিনি প্রত্যহ বেদান্তপাঠী, সর্ব্বসঙ্গ-ত্যাগী, সাংখ্য ও যোগের তাৎপর্য্য বিচারশীল তিনি 'দ্বিজ' ব্রাহ্মণ।

যিনি সমরস্থলে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধম্বিদিগকে অস্ত্রদ্বারা আহত ও পরাজিত করেন, তিনি 'ক্ষত্র' ব্রাহ্মণ।

কৃষিজীবী, গোপ্রতিপালক, বাণিজ্য-ব্যবসায়রত ব্রাহ্মণ 'বৈশ্য' সংজ্ঞক। যে লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, বা মাংস বিক্রয় করে সেই ব্রাহ্মণ 'শূদ্র'। চৌর, তস্কর, সূচক (কুপরামর্শদাতা) দংশক (কটুভাষী) এবং সর্ব্বদা মৎস্য মাংস লোভী ব্রাহ্মণ 'নিষাদ" নামে পরিচিত।

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব কিছুই জানে না, অথচ ব্রহ্মসূত্রের (পৈতার) গর্ব্ব করে, সেই ব্রাহ্মণ 'পশু' বলে খ্যাত।

যে ব্রাহ্মণ নিঃশঙ্কভাবে কূপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (park) রুদ্ধ করে সে 'ম্লেচ্ছ' পদবাচ্য।

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ 'চণ্ডাল' বলে গণ্য হয়।

পুরুষসূক্তে যে চারি বর্ণে বিরাটের দেহ কল্পনা করা হয়েছে— তাও অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পর—জাতিপর নয়।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যকৃতঃ।
উরুযদস্য তদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

(পুরুষসূক্ত দ্বাদশ মন্ত্র)

ইঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হল। বাহুযুগল রাজন্যকে করা হল। ইঁহার উরুযুগল বৈশ্য এবং পাদ-যুগল থেকে শূদ্র হল। এঁরা হলেন বিরাটের ঐ সকল স্থানের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। যেমন বিরাটের মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা চন্দ্র, চক্ষুর আদিত্য, বলের ইন্দ্র। সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি চার রকম গুণ কর্ম্মের অধিপতি দেবতা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য-দেব, নৃদেব, অর্য্য বা গুপ্ত-দেব এবং দাস-দেব। চার রকম বিভিন্ন গুণ-কর্ম্ম যে যে মনুষ্য-শরীরে যেমন যেমন প্রকাশ পায়, তদনুযায়ী ঐ সকল দেবতাদেরও সেই সেই শরীরে আবির্ভাব হয়। সেই জন্য মহাভারতকার বলচেন, "আগে মানবগণের মধ্যে কোনও বর্ণই ছিল না, পরে কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হল"। পুরুষ-সূক্তের ব্রাহ্মণাদি জাতি নয়, দেবতা। সায়ণ, ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যাখ্যা করছেন—"ব্রহ্মণ্যদেব বিধাতার মুখ-স্বরূপ হলেন বা মুখ

থেকে প্রাদুর্ভূত হলেন"। গুণ-কর্ম্মের অভাব হলে, সেই সেই গুণ-কর্ম্মের অধিপতি দেবতারা সেই সেই শরীর থেকে অন্তর্ধান হন। তা না হলে মনু মহারাজ এ কথা বলতেন না যে—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুর্গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

যে দ্বিজ নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিধায়ক বেদ পাঠ আগে না করে অন্য কিছু অধ্যয়ন করে, সে অতি শীঘ্র ইহজন্মে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। তবে মনু মহারাজ যে বলচেন, "ব্রাহ্মণ কখন শূদ্র হয় না, শূদ্রও কখন ব্রাহ্মণ হয় না"—এ কথা খুবই ঠিক। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যে কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাঁর ব্রহ্মত্ব নষ্ট হবে না। বা তমোধিক শূদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করলেই তার শূদ্রত্ব ঘুচবে না। মহর্ষি পতঞ্জলিও পাণিনী ব্যাকরণের ৫ম অধ্যায়ের প্রথম পাদের—"তেন তুল্যং ক্রিয়াচেদ্ বতিঃ"—১১৮ সূত্রের মহাভাষ্যে বিশেষ বিচার করেছেন। "সর্ব্বে এতে শব্দাঃ গুণ-সমুদায়েষু বর্ত্তন্তে, ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্র ইতি অতশ্চ গুণ সমুদায়ে। এবং হ্যাহ—তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণস্য কারণম্"। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র শব্দগুলি কতকগুলো গুণ-সমষ্টির বাচক। তপঃ, শ্রুত এবং সৎকুলে জন্ম ব্রাহ্মণত্বের কারণ। যে মানবের বেদাধ্যয়ন এবং তপস্যা নেই তিনি জাতি ব্রাহ্মণ মাত্র।

এরপর সকলেই ব্রাহ্মণাদি জাতি সম্বন্ধে নিজ নিজ বুদ্ধির পরিচালনা করুন।

স্বামি প্রেমানন্দের পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

বেলুড়মঠ

২৯।৬।১৫

কল্যাণবরেষু,—

কদিন হলো "ল" তোমার এক post card পেয়েছি। তোমরা নিষ্কামভাবে কত অনাথ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে পেয়ে ধন্য হচ্চো। পূজ্যপাদ স্বামিজী বলতেন—তোমাদের চিত্তশুদ্ধি করবার জন্যে ঐসব দরিদ্র-নারায়ণ কঙ্কালসাররূপ মুখোস পরে তোমাদের নিকট—উপস্থিত হয়েছেন। মনে করোনা তোমরা তাদের উপকার করবে, পরন্তু তোমরাই উপকৃত হচ্ছ জানবে। ভিতরে ভাব থাকা চাই। নইলে অভিমান এসে পতনের আশঙ্কা আছে, এ তোমাদের একটা মহাসাধন হচ্ছে। কিন্তু খুঁটি ছেড়ো না। সর্ব্বদা ঠাকুর ও স্বামিজীকে স্মরণ করবে। দক্ষিণেশ্বরে যে শক্তি প্রভুর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, স্বামিজীর মধ্যেও সেই শক্তিই প্রবেশ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছিল। এই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারাই বুঝতে পারবে তোমাদের কত কল্যাণ হচ্ছে, কত ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। তোমাদের এই বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী-দের আদর্শ-ত্যাগী, আদর্শ-সংযমী, আদর্শ-ভক্ত হতে হবে। মহা কঠোর সাধনা চাই, নইলে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে ভক্তি-বিশ্বাস আসা অসম্ভব। অভিমান, অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, একেবারে দূর করতে হবে। প্রাণ থেকে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করবে, প্রভুর আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছ তখন তোমাদের ভয় নাই, শঙ্কা নাই, বিশ্বাস কর প্রভু আমাদের অন্তর বাহির সব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকে ফাঁকি—দেবার যো নাই। তোমাদের খুব ভক্তি-বিশ্বাস হক এই আমার শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণে নিয়ত প্রার্থনা। মানুষ হয়ে

যাও, দেবতা হয়ে যাও লোকে তোমাদের চরিত্র দেখে অবাক হয়ে যাক, এই চাই, এই চাই। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানবে, ও "উঃ" প্রভৃতিকে জানাবে। আমি ভাল আছি, তোমরা কেমন থাক মাঝে মাঝে লিখবে। ইতি—শুভানুধ্যায়ী

প্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

বেলুড়মঠ

২৪।৪।১৬

পরম স্নেহাস্পদেষু—

তোমার চিঠি সময় মত পেয়েছি, লোকমুখে তোমাদের সকল সংবাদ প্রায়ই পাই, সে জন্য আর লিখিনা। তোমার উপর কেহ বিরূপ নয়। তবে একটু স্থির-চিত্ত হতে চেষ্টা কর, ইহার নামই যোগ। গতকল্য মহারাজ, শিবানন্দস্বামী প্রভৃতি আমরা ইটিলি উৎসবে গিয়েছিলাম। তথায় সর্ব্বানন্দের বক্তৃতা হল, তার ঢাকায় যাবার কথা ছিল কিন্তু ঘটে ওঠেনি। * * *

যখন সাধু হয়েছ তখন বেদান্ত-ভাষ্যাদি খুব পড়া দরকার, এতে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সঙ্গে সঙ্গে চাই বিবেক বৈরাগ্য, সকলকে আপনার করে যদি না নিতে পার তবে গৃহী হওয়া উচিত ছিল। 'আমি' 'আমার' ত্যাগ করাইত সাধুত্ব। ঠাকুরের নাম নিয়ে যদি প্রকৃত সাধু না হতে পাল্লে তবে তোমাদের জীবন বৃথা। যে লোক এই জীবন্ত জীবের মধ্যে শিবত্ব দেখ্‌তে চেষ্টা না করে, তার সাধুর ভেক পরা বিড়ম্বনা মাত্র। সে আপনিও ঠকচে আর সংসারকেও ঠকাচ্ছে। কেবল Lecture ব্যাখ্যা বক্তৃতা দিলেই কি বড় সাধু হল? তবে আর স্বামিজী ও ঠাকুরের জীবনে তোরা শিখলি কি? ভালবাসা, নিস্বার্থরূপে জীব জগৎকে ভালবাস, ছেড়েদাও ক্ষুদ্র আপনাকে অতি হীন আমিত্বকে। ধর এই অদ্ভুত অপরূপ আশ্চর্য্য আদর্শকে। এমনটি আর হয়নি। স্বার্থ কর

জীবন, ছেড়ে দাও আপন। আমাদের ভালবাসা · কে জানাবে ও তোমরা সকলে জানবে। ইতি— শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

বেলুড়মঠ
২৭।১০।১৩

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার p. c. যথা সময়ে পেয়েছি, আজ আবার প্রভুর ভোগের জন্য ৫৲ টাকা পেলাম।

আমি দি, র সহিত দেখা করতে পারিনি। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাব বিজয়ার পর তারও অবকাশ কৈ? এক অ তারও মাঝে মাঝে অসুখ হচ্চে. যাই কেমন করে। সবাই আপন আপন ফিকিরে ফির্চ্ছে বাবা। স্বার্থপূর্ণ এ সংসার মনে করেছ ছাড়িয়ে যাব, যো কি ধন, গেরুয়া কাপড় কিংবা একটা নাম বদলালেই কি মোহমায়ার হাত থেকে এড়ান চলে? অসম্ভব! 'বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাম্ প্রপদ্যতে"। হরি হরি বল আর কি! তোমার কোন অপরাধ আমি দেখি নি, তুমি সুখে থাক, ভাল থাক, আনন্দে থাক, এই প্রভুর নিকট প্রার্থনা। 'দি' কে আমার প্রণাম জানাবে, আমার কিছুদিন বিশ্রাম দরকার, কিন্তু ঠাকুরের কাছে বলছি প্রভু চির বিশ্রাম দাও, আর না। কাজ ক্রমে বাধ হয়ে আস্‌ছে। যদু বলে একটি ছেলে যে শ্রীশ্রীমার দেশ হতে মালোয়ারী নিয়ে কাশী বৃন্দাবন হয়ে কনখলে ছিল, সেটি গত বুধবারে ইহলোক ত্যাগ করেছে। বেঁচেছে, এখন যেতে পারলেই মঙ্গল দেখ্‌ছি। সাধুর এদোর ওদোর ঘোরাও কি কম লাঞ্ছনা, সাধুগিরি থ্যাক থু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ধোকা কাটিয়ে দাও ঠাকুর ধোকা কাটিয়ে দাও। আর না প্রভু অনেক হয়েছে। সাধু হয়ে আবার ঘর বাড়ী করে থাকা (যেমন আমি কচ্ছি) এ ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার বিষম প্যাঁচ। এ থেকে ঠাকুর না বাঁচালে ত আর উপায় দেখ্‌ছি না। অবিদ্যা কত রকমের ফাঁদই পেতে

খেলাচ্ছেন তার ইতি নাই, অন্ত নাই। রক্ষা কর, ঠাকুর, রক্ষা কর, দিব্য চক্ষু দাও নাথ, নেশা কাটিয়ে দাও, ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও, দেব। আপনার দোষ দেখাই সাধুত্ব। আমরা অপরের দোষ দেখতে যেমন মজবুত, নিজের দোষ যেন নাই, যেন সবটাই গুণ, এরই নাম মোহ! দয়াময়, দয়া করে এই মোহ নাশ না কল্লে জীব কি করবে। তার কি শক্তি, কি সাধ্য। এইখানে ঈশ্বরের কৃপা দরকার, এ মোহ জাল থেকে তিনি না বাঁচালে জীবের রক্ষা নেই, উপায় নেই।—কে আমার ভাল বাসা জানাবে, আর এই মোহ জাল থেকে যাতে বাঁচি তার জন্য প্রার্থনা কর্‌তে বল্‌বে।

এখানকার আর সকলে এক রকম আছে, আমিও ঐ রকম, তুমি আমাদের ভালবাসা জান্‌বে। তোমার কি এখন ভদ্রকে কিছুদিন থাকা হবে? মাষ্টার মশায় কয়েক দিন হতে এখানে আছেন। আর সব মঙ্গল ইতি।—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ—

তত্ত্ব কথা

(১)

কৃষ্ণ কিংবা কালী বড় সমস্যা কঠিন।
শাক্ত আর বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চিরদিন॥
কেবা কৃষ্ণ কেবা কালী সে ধারণা নাই।
ছোট বড় ভেদবুদ্ধি করেন সবাই॥
কালী, কৃষ্ণ ভিন্ন নয়, অভিন্ন স্বরূপ।
নহে ছোট বড়, ভাব ভেদে ভিন্নরূপ॥
কৃষ্ণ কালী ভেদবুদ্ধি করে যেইজন।
শাক্ত কি বৈষ্ণব নয় অজ্ঞান সেজন॥

—বিজ্ঞানী

রাজযোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় পাঠ

১

কুণ্ডলিনী। আত্মাকে জড় বলে জানলে চলবে না, তার যথার্থ স্বরূপ জানতে হবে। আমরা আত্মাকে দেহ বলে ভাবচি, কিন্তু একে ইন্দ্রিয় ও চিন্তা থেকে পৃথক করে ফেলতে হবে; তবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, আমরা অমৃত-স্বরূপ। যা কিছু পরিবর্ত্তন সব কার্য্য-কারণ নিয়ে, আর যা পরিবর্ত্তনশীল তাই নশ্বর। সুতরাং দেহ বা মন অবিনাশী হতে পারে না, কেন না তারা চির পরিবর্ত্তনশীল। যা অপরিবর্ত্তনীয় তাই অবিনাশী, কেন না তার ওপর আর কেউ ক্রিয়া করতে পারে না।

পূর্ব্বে সত্য-স্বরূপ ছিলুম না, এখন হলুম—এ নয়, চিরকালই আমরা সত্যস্বরূপ। আমাদের কাজ হচ্চে, যে অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন আমাদের কাছ থেকে সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে তাকে কেবল সরিয়ে দেওয়া। দেহটা চিন্তার পরিণতি। সূর্য্য (পিঙ্গলা) চন্দ্রের (ঈড়া) গতি দেহের সর্ব্বাংশে শক্তিসঞ্চার কচ্চে এবং অবশিষ্ট শক্তি সুষুম্নার অন্তর্গত বিভিন্ন চক্রে (plexuses), সাধারণ ভাষায় স্নায়বিক কেন্দ্রে, সঞ্চিত থাকে।

ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি মৃত দেহে দেখা যায় না, কেবল সপ্রাণ সবল শরীরেই থাকে।

যোগীরা যে শুধু এদের অনুভব করেন তা নয় এদের দেখতেও পান। এরা প্রানবন্ত জ্যোতির্ম্ময়। চক্রগুলোও ঠিক তাই।

কার্য্য সাধারনত জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই ভূমি থেকেই হয়। যোগীদের

আর একটা ভূমি আছে, সেটা হল জ্ঞানাতীত; এই জ্ঞানাতীত ভূমি হচ্ছে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সমস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস, সহজাত জ্ঞানের যত ক্রম বিকাশ হবে তত আমরা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব। জ্ঞানাতীত অবস্থায় কোন ভুল হয় না; কিন্তু সহজাত জ্ঞানের পূর্ণতা হলেও সেটা যেন যন্ত্রবৎ হয়ে যায়, কারণ তাতে জ্ঞানের ক্রিয়া থাকে না। এই জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থানকেই "ভাব মুখে থাকা" বলে, যোগীরা বলেন, "এই ভূমিতে যাবার শক্তি সব মানুষেরই আছে," আর, কালে সকলেই এই ভূমিতে পৌছায়।

চন্দ্র ও সূর্য্যের (ঈড়া ও পিঙ্গলা) গতিকে একটা নূতন দিকে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ সুষুম্নার মুখ খুলে দিয়ে তাদের একটা নূতন রাস্তা দেখিয়ে দিতে হবে। যখন সুষুম্নার মধ্য দিয়ে তাদের গতি সহস্রার (Pineal gland) পর্য্যন্ত পৌঁছবে তখন কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের দেহজ্ঞান একেবারে চলে যাবে।

মেরুদণ্ডের তলদেশে যে মূলাধার চক্র (Sacrum) আছে তা খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ। এই জায়গা হচ্ছে প্রজনন-শক্তি-বীজের (Sexual energies) বা বীর্য্যের (Generative substance) আধার। একটা ত্রিকোণ স্থানে একটি ছোট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, যোগীরা এই প্রতীকে একে প্রকাশ করেছেন। এই নিদ্রিত সাপই কুণ্ডলিনী, এরই ঘুম ভাঙ্গানো হচ্ছে সমস্ত রাজযোগের উদ্দেশ্য।

পাশব কার্য্য থেকে যে যৌন শক্তির উৎপত্তি হয় তাকে উর্দ্ধদিকে নর-শরীরের মহা বিদ্যুতাধারে অর্থাৎ মস্তিষ্কে চালাতে পারলে সেখানে সঞ্চিত হয়ে তা ওজঃ বা আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত হয়। সমস্ত সৎ চিন্তা, সমস্ত প্রার্থনা ঐ পশু-শক্তিকে ওজেঃ পরিণত করতে সাহায্য করে, আর তাই থেকে আমরা আধ্যাত্মিক শক্তিও লাভ করি। এই ওজঃই হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, আর একমাত্র মনুষ্য শরীরেই এই শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। যিনি সমস্ত পশু-শক্তিকে ওজেঃ পরিণত করতে পেরেছেন তিনি দেবতা। তাঁর কথায় অমোঘ শক্তি, তাঁর কথায় নূতন জগতের সৃষ্টি হয়।

যোগীরা মনে মনে কল্পনা করেন যে, এই কুণ্ডলিনী সর্প সুষুম্না-পথে স্তরে স্তরে চক্রের পর চক্র ভেদ করে সহস্রারে (Pineal Gland) উপস্থিত হন। যৌন শক্তি, যা হচ্ছে মনুষ্য শরীরের সার অংশ সেটা যদি ওজঃ শক্তিতে পরিণত না হয় তাহলে স্ত্রীলোকই বল আর পুরুষই বল, কেউই ধর্ম্মলাভ করতে পারে না।

কোন শক্তিই সৃষ্টি করা যায় না, তবে তাকে ঠিক ঠিক পথে নিয়োজিত করা যেতে পারে। সেই জন্যে যে অদ্ভুত শক্তি আমাদের হাতে আছে তাকে আয়ত্ত করতে শিখে, তারপর প্রবল ইচ্ছা শক্তির দ্বারা ঐ শক্তিকে পাশব হতে না দিয়ে দেবময় করে ফেলতে হবে। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে, পবিত্রতাই সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি। বিশেষতঃ রাজযোগে কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা চাই-ই তা সে বিয়েই করুক আর নাই করুক, দেহের সার অংশ যদি বৃথা নষ্ট করে দেয় তাহলে কখনও ধর্ম্ম লাভ করতে পারবে না।

ইতিহাস বলে, সর্ব্বযুগের বড় বড় দ্রষ্টা পুরুষরা হয় সাধু সন্ন্যাসী, নয় যারা বিবাহিত জীবনের ব্যবহার ত্যাগ করেছেন। পবিত্রাত্মারাই কেবল ভগবানের দর্শন পান।

প্রাণায়ামের পূর্ব্বে ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলকে ধ্যানে দেখবার চেষ্টা কর। চোখ বন্ধ করে এর ছবি মনে মনে স্পষ্টরূপে কল্পনা করবে। ভাব, এর চারিপাশে আগুনের শিখা আর তার মাঝখানে কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে রয়েছেন। ধ্যানে যখন এই কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার চক্রে (Spine) স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন তাকে জাগাবার জন্যে কুম্ভক করে সেই বায়ুকে সবলে তাঁর মস্তকে আঘাত করবে। যাঁর কল্পনা-শক্তি যত বেশী, তিনি ফলও তত শীগ্‌গীর পান, আর তার কুণ্ডলিনীও তত শীগ্‌গীর জাগেন। যতদিন তিনি না জাগেন ততদিন ভাব তিনি জেগেছেন। আর ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি অনুভব করবার চেষ্টা করে জোর করে তাদের সুষুম্না পথে চালাতে সচেষ্ট হও। এতে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হবে।

চতুর্থ পাঠ

মনকে সংযত করবার পূর্ব্বে মন কি তা জানা চাই।

চঞ্চল মনকে পাকড়াও করে তার ঘাড় ধরে বিষয় থেকে টেনে এনে একটা ভাবে তাকে বেঁধে রাখতে হবে। এই রকম বার বার করতে হবে। ইচ্ছা শক্তি দিয়ে মনকে সংযত করে ভগবানের মহিমা চিন্তা কর।

মনকে স্থির করবার সব চাইতে সোজা উপায় একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে যেখানে সে ভেসে যেতে চায় সেখানে খানিক ক্ষণের জন্যে তাকে যেতে দাও। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখবে, আমি দ্রষ্টা—সাক্ষিবৎ বসে বসে মনের ভাসাডোবা দেখছি। আমি মন নই। তারপর মনটাকে দেখ। ভাব, মন থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। ভগবানের সঙ্গে নিজের অভেদ চিন্তা কর, জড়বস্তু বা মনের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেল না।

ভাব, মন যেন একটা নিস্তরঙ্গ হ্রদ, চিন্তাগুলো তার বুদ্‌বুদ্—উঠছে আর তার বুকে লয় হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাগুলোকে রুদ্ধ করবার কোন চেষ্টা করো না, কল্পনার চক্ষে কেবল দেখে যাও কেমন করে তারা ভেসে চলেছে। একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন প্রথমে খুব ঘন ঘন তরঙ্গ ওঠে তারপর তরঙ্গের পরিধি যত বেড়ে যায়, তার উৎপত্তিও তত কমে আসে তেমনি মনকে ঐ ভাবে ছেড়ে দিলে তার বৃত্তের পরিধি যত বেড়ে যাবে মনোবৃত্তির নব নব সৃষ্টিও তত কমে আসবে। কিন্তু আমরা ঠিক এর উল্টো উপায় অবলম্বন করবো, প্রথমে একটা বড় চিন্তার বৃত্ত থেকে আরম্ভ করে সেটাকে ছোট করতে করতে যখন মন একটা বিন্দুতে আসবে তখন তাকে সেখানে স্থির করে রাখতে হবে। এই ভাবে খুব দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকবে——আমি মন নই, আমি দেখছি যে আমি চিন্তা করছি, আমি আমার মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছি, এই রকম অভ্যাস করতে করতে নিজের সঙ্গে মনের যে একত্ব বোধ তা প্রত্যহই কমে আসবে, তারপর মন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে ফেলতে পারবে, অবশেষে ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে মন ও তুমি এক নও।

এটা যখন হয়ে যাবে তখন মন তোমার চাকর, তাকে তুমি ইচ্ছা মত বশীভূত করতে পারবে। যোগী হওয়ার প্রথম ধাপ—ইন্দ্রিয়ের বাইরে যাওয়া ; আর শেষ ধাপ—মনোজিত হওয়া।

যতদূর সম্ভব একলা থাকবে আসন নাতি উচ্চ হওয়া উচিত ; প্রথমে কুশাসন, তারপর অজিন, তার ওপর পট্টবস্ত্র বিছাবে। হেলান দেবার জায়গা না থাকাই ভাল, আর আসনটা যেন না নড়ে।

সমস্ত চিন্তা বর্জ্জন করে মনকে খালি রাখবে ; যখনই কোন চিন্তা মনে উঠবে তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবে ; এই করতে গেলে দেহরূপ জড় বস্তুকে অতিক্রম করে যেতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সমস্ত জীবনই ঐ অবস্থা আনবার একটি অবিরাম চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তাগুলো ছবি, আমরা তাদের তৈরী করি না। প্রত্যেক শব্দের অর্থ আছে ; আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এরা জড়িত।

আমাদের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছেন ভগবান্। তাঁকেই ধ্যান কর। আমরা জ্ঞাতাকে জানতে পারি না, কারণ আমরা যে তাই।

অনর্থের সৃষ্টি আমরা নিজেরাই করি। আমরা যা, তাই বাইরে দেখি, কেননা জগৎটা আমাদের আয়নার মত। এই ছোট দেহটা আমাদের সৃষ্ট একখানি ছোট আয়না, কিন্তু সারা বিশ্বটা হচ্ছে আমাদের শরীর। সর্ব্বক্ষণ এই চিন্তা করলে বুঝতে পারবো আমরা মরি না বা কাকেও মারতে পারি না, কারণ সে যে আমিই। আমাদের জন্ম নেই মৃত্যুও নেই, কেবল সকলকে আমাদের ভালবেসে যাওয়া উচিত।

"সারা বিশ্বটা আমার শরীর ; সমস্ত স্বাস্থ্য, সমস্ত আনন্দ আমারই, কারণ সবই যে বিশ্বের ভেতর।" বল, "আমি—বিশ্ব।" আয়নার ওপর যা প্রতিফলিত হচ্ছে সে সব আয়নারই কাজ তা শেষে বুঝতে পারব।

যদিও আমাদের ছোট তরঙ্গের মত বোধ হচ্ছে কিন্তু আমাদের সকলের পশ্চাতেই এক বিরাট সিন্ধু ; সেই জন্যে আমরা সকলেই এক। সমুদ্র ছাড়া তরঙ্গ থাকতে পারে না। কল্পনাকে ঠিক ঠিক নিয়োজিত

করতে পারলে তা আমাদের পরমবন্ধুর কাজ করে। কল্পনা, যুক্তির রাজ্য ছাড়িয়ে যায়, সেই আলোকই কেবল আমাদের সর্ব্বত্র নিয়ে যেতে পারে।

প্রেরণা আমাদের ভেতর থেকেই ওঠে না, বলে মহৎগুণের দ্বারা আমাদের মনকে সেই প্রেরণীর উপযোগী করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

প্রেমের সন্ধানে

থাকনা তুমি যেথায় সেথায়
চাইনে তোমার দেখা।
তোমার প্রেমে সরস করে,
মন খানি মোর দিও ভরে,
থাকব আমি একা।
একলা বসে খেলব খেলা,
কাটবে আমার সারা বেলা,
আসবে যখন রাতি।
আঁধার মাঝে জ্বালিয়ে দেব
তোমার প্রেমের বাতি॥
রাতের আঁধার যাবে কেটে
উঠবে কোটী শশি।
জ্যোৎস্নালোকে দেখবো তোমায়
আপন ঘরে বসি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক

রোঁমা রোলাঁর চিঠি

৪ঠা মার্চ্চ
১৯২৮

প্রিয় স্বামী—

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্চি। পুজনীয় স্বামী শিবানন্দের বহুমূল্য স্মৃতি ব্যাখ্যা-পূর্ণ পত্রে আমার হৃদয়কে ভাবময় করেছে। আমি আশা করি শীঘ্রই আমি তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে পারব। যে কাজ হাতে নিয়েছি, আমি যা ভেবেছিলুম তার চাইতে বেশী সময় নেওয়ায়, আমার মনকে অন্য দিকে নিয়োগ করতে দেই নি। আমি বীথভেনের নামে যে গ্রন্থ উৎসর্গ করব তার প্রথম ভাগ এই মাত্র শেষ হল, এখন আমি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিজেকে নিয়োগ করতে পারব।

আশা করি অনিচ্ছাকৃত এই দুটো নামের একত্র সমাবেশ দেখে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন না। বৎসরাবধি সূক্ষ্ম ভাবে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা এবং সংগঠনী ব্যক্তিত্ব অধ্যয়নে, আমি পূর্ব্ব পত্রে যা লিখেছিলুম তা সুন্দরতররূপে নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছি; আমাদের দেশের বীথভেনের মত ভাবাবেশযুক্ত শ্রেষ্ঠ গীত-জ্ঞদের সঙ্গে ভারতের দ্রষ্টা ঋষিদের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা যেতে পারে। তাঁরা সকলেই ঈশ্বরীয় ভাবের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং বীথভেন সর্ব্বদা যোগস্থ (ভাবস্থ) থাকতেন। তবে ভারতের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে আমাদের অধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপূর্ণ, যুক্তি যুক্ত কোনও স্থায়ী ইতিবৃত্ত নেই, এবং এই জন্যে আমাদের প্রত্যেক, অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণই বিবিক্ত-সেবী এবং তাঁরা অন্য প্রকারে, পথপ্রদর্শক রহিত হয়ে, সাধনার সমস্ত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই জন্যে তাঁদের জীবনের একটা ব্যাপার

আমি আবিষ্কার করেছি যে তাঁরা প্রায় সকলেই জগৎ সম্বন্ধে বধির এবং সেই জন্য জীবন্ত অবস্থাতেই প্রাচীরাবদ্ধের মত থাকায় তাঁদের মস্তিষ্কের এমন বিকার উপস্থিত করেছে যে সেই অধ্যাত্ম সংগীতের ভাবাবস্থাই তাঁদের সন্ন্যাস রোগের নিকটস্থ করে দিয়েছে। সত্য বাণীর স্পষ্ট শ্রুতির তীব্র অনুভবের মধ্যে বাস করায় তাঁদের কাছে অবশিষ্ট জগৎ না থাকার মধ্যেই হয়ে যেত; তাঁদের তীব্র ইচ্ছা শক্তি কেবল ঈশ্বরীয়-জ্ঞান ধারণার জন্য নিয়োজিত থাকত এবং সেই ধারণাই তাঁদের বিলীন করে দিত। বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারত ইউরোপকে জানতে পেরেছে কেবল এ্যাংলো স্যাক্সান জাতির মধ্য দিয়ে, যারা ইউরোপীদের মধ্যে সংগীত ও রহস্য বিদ্যা সম্বন্ধে সব চাইতে গরীব, কঠোর ও বাস্তব; দুই একজন ছাড়া, যারা কেবল কার্য্য-ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় খুব বড়। ভারত যদি প্রাচীন জারমানীর গভীর আত্মার খবর রাখত; যদি মধ্য যুগের ফ্রাঁসের অন্তর জীবনের (এখনও যা, জন ক্রষ্টোফরের ভাষায়, "চৌরঙ্গীর বাজারের গোলমালের" মধ্যে লুকান রয়েচে) সন্ধান পেত, তাহলে উভয় জাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্ব সে অনুভব করতে পারত।

বিগত ফেব্রুয়ারীর প্রবুদ্ধ ভারতে দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে আমার যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা পড়লুম।......পড়ে বড় দুঃখিত হলুম।......তিনি আমার ওপর কতকগুলো এমন অযথা মতামত চাপিয়েচেন যা আমার যথার্থ মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ তারই গোটা কতক আমি এখানে উল্লেখ করব।

প্রথম একটা উদ্দেশ্য আমার ওপর চাপান হয়েচে যে মুখার্জি "যে বই খানি বের করেছেন, তাইতে যে "হিংসা ও গাত্রদাহ" উপস্থিত হয়েচে, তার বিরুদ্ধে লেখা। আমি সে রকম কিছুই বলিনি। আমি বলেছিলুম, তাঁর "নীরবতার সম্মুখে" বইখানি প্রথম আমার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করেছিল এবং সেজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্তু মুখার্জ্জিকে সমর্থন করবার

জন্য ভারতের মহচ্চিন্তা সম্বন্ধে আমি কোনও বই লিখতে যাচ্ছি না। মুখার্জ্জি সম্বন্ধে কোনও কথাই হয় নি, রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেই হয়েছিল। আপনাদের তর্ক-বিতর্ক সম্বন্ধে আমি আমাকে মিশুতে চাই না। ভারতের এই দেবমানব আমার কাছে যেরূপে প্রকাশ হয়েচেন তাই আমি পাশ্চাত্যবাসীর নিকট উপস্থাপিত করব।

দ্বিতীয়—রায় আমার ওপর এই কথাগুলি আরোপ করেছেন, "আমাদের দেশের লোক ক্রমশঃ এশিয়ার সমস্ত মহাপুরুষদের ছোট করবার চেষ্টা করচে এবং এসিয়া সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারে তারা ধীরে ধীরে ঔৎসুক্য হারাচ্চে।" সত্য থেকে এ সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। এসিয়া সম্বন্ধে ইয়োরোপীরা আর কখনও এমন উৎসাহী হয় নি, এসিয়ার মহা-পুরুষদের মোহনীয় আলোকের প্রতি তারা আর কখনও এমন আকর্ষণ অনুভব করে নি। এই সত্যই আজ প্রতীচ্য জাতীয়-দলের (Nationalist) মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, যার জন্যে আজ জাতীয় ও প্রতি-ক্রিয় (reactionary) দলের অতিবাদী (ultra) ফরাসী লেখক হেনরী মার্শি (Henry Massis), "প্রতীচ্যের সমর্থন" নামক বই লিখতে বাধ্য হচ্চেন। লোকে নিজেকে সমর্থন করে কখন?—যখন সে নিজেকে সঙ্কটাপন্ন মনে করে। প্রতীচ্যের এই প্রাচ্যকে আক্রমণের মনোগত ভাবই জানিয়ে দিচ্চে যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের স্থান অধিকার করতে বসেছে।

তৃতীয়—রায়, সোপেনহাওয়ার সমিতি সম্বন্ধেও আমার ওপর কতক-গুলো নিষ্ঠুর অভিযোগ চাপিয়েছেন। তিনি আমার ভাবগুলো এমন ভাবে উল্টে দিয়েচেন যা আমার ভেতর যন্ত্রণার সৃষ্টি করেচে। সোপেন হাওয়ার সমিতির ওপর আমার সহানুভূতি খুব বেশী এবং ইউরোপের সমগ্র মহৎ দার্শনিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, ভারত সম্বন্ধে এই সমিতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসুক। এদের বিগত বর্ষের আন্তর্জাতিক মহাসভা ভারতের জন্যই নিয়োজিত হয়েছিল। এর নতুন "জাহার বাস" (Jaharbuch) ইদানীং প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে এঁদের সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণী আছে। এই সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ এবং ড্যানজিক স্বাধীন

নগরের (free-town) রাজনৈতিক মহাসভার একজন সভ্য (Senator) অধ্যাপক হ্যানস্ জিনট্‌কে আপনাদের নিকট একখানি কার্য্য বিবরণী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেছি। এতে আপনারা ইউরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত অধিবেশন এবং তাতে তাদের ভারত সম্বন্ধীয় মতামত জানতে পারবেন। বিবেকানন্দ এবং পলডুসেন সম্বন্ধেও আমি তাতে যৎসামান্য কয়েকপাতা যোগ করেছি। যে সমিতি তার আচার্য্যের ভক্তি-পূজা এখনও বর্ত্তমান রেখেছে, যিনি ইউরোপের প্রথম মুনি, যাঁর ধমনীতে ভারতীয় চিন্তা স্রোত অনুক্ষণ বইত, যে সমিতি কাঁত এবং অপরাপর জার্ম্মাণ দার্শনিক-পন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্বেও ইউরোপ, এসিয়া এবং জগতের অন্যান্য চিন্তাধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পক্ষপাতী—তারা নিশ্চয়ই সহানুভূতি ও সন্মানার্হ। আমি রায়ের কথায় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি, কেন না তার কথা সত্য হলে, সোপেনহাওয়ার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পলডুসেন, যখন বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তাঁর অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ করতেন এবং তাঁর পরিদর্শন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভুলে যেতেন। আমি যাদের সম্মান ও প্রশংসা করি তাদের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া আমার মোটেই অভিপ্রেত হতে পারে না। পক্ষান্তরে যখন ঐ সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হ্যানস্ জিনট্ আমার প্রবন্ধের মধ্যে বিবেকানন্দের উদ্ধৃত বচনগুলি পাঠ করেন তখন তাঁর মুখে যে ভাবোন্মাদনা ফুটে উঠেছিল তাতে আমি মন্তব্য প্রকাশ করেছিলুম।

চতুর্থ—সাধারণের উন্নতি কল্পে সমাজ সেবা বিষয়ে রায় গান্ধী সম্বন্ধে আমার ওপর আর একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়েছেন। তিনি আমাকে দিয়ে বলিয়েছেন, "গান্ধীর মত তোমাদের দেশ-নেতারা সর্ব্বাগ্রে সামনের এই বিশেষ কাজটার ওপর বেশী জোর দেন না কেন?" এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি হয়ত দার্শনিকতা, উদার চিন্তাশীলতা, বা শিল্প সাহিত্যের গভীরতার অভাব সম্বন্ধে গান্ধী সম্বন্ধে অভিযোগ আনতে পারতুম কিন্তু সমাজ সেবা সম্বন্ধে তার প্রতি কোনও অভিযোগ আনা মানে, যিনি আজীবন যথাসাধ্য ঐ কাজে ব্রতী

তাঁকে বলা যে তাঁর ঐ বিষয়ে কোনও ঔৎসুক্যই নেই। যদি গান্ধীর মধ্যে কোনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পবিত্রতা, নিজেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার, সমগ্র 'আমি'টার পরিপূর্ণ উৎসর্গ বলে কিছু বিকাশ হয়ে থাকে তা তাঁর সমাজসেবার মধ্যেই ফুটে উঠেছে। ঐ সব সদ্‌গুণের যিনি উদাহরণ তাঁর নিকট অবনত মস্তকে আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করি। এই রকম করে রায় আমার যথার্থ ভাব যা, তার ঠিক বিপরীত কথাই আমার ওপর চাপিয়েচেন। আরও অনেক ছোট ছোট ভুলের কথা বলা যেতে পারে। এতেই প্রমাণ হচ্চে যে তাঁর সাক্ষাৎটা সম্পূর্ণ ভুল। এবং তিনি আমার যে সব কথা লিখতে ভুলে গ্যাছেন সে সব কথাও আমি কখনও বলি নি।

আমি ডি, কে রায়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করছি না এবং সে সম্বন্ধে কোনও তর্কবিতর্কও আমি করতে দিতে ইচ্ছুক নই। এবং তাঁর কথার যে প্রতিবাদ করতে হল তার জন্তও আমি দুঃখিত। ডি, রায়ের সম্বন্ধে অভিযোগ আনাটা আমার কাছে বড় অপ্রিয় ব্যাপার। তাঁর ব্যক্তিত্ব বড় মুগ্ধকরী, তিনি একজন সুন্দর গায়ক, তাঁর অনেক সদগুণ আছে এবং তিনি শুভেচ্ছাসম্পন্ন। তিনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই সহানুভূতি জানিয়েছেন, যার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি সদ্ বিশ্বাসের ওপরই লিখেছিলেন......।

প্রিয় স্বামী—,অনুগ্রহ করে আপনার ভায়ের শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

রোমা রোলাঁ

আলোক ও আঁধার

আলোক বলে 'আঁধার, শীঘ্র সরে যাও'।
আঁধার বলে 'যাই, পথটা ছেড়ে দাও।'

—বিজ্ঞানী

বৈদিক ভারত

(ঋগ্বেদীয় যুগ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০। ঋগ্বেদে সমুদ্রের বহুল উল্লেখ

ঋগ্বেদে সমুদ্রযাত্রী বণিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রের অর্থ এইরূপ :—

"ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ সকল দিক্ সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকলদিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।" (ঋগ্বেদ ১।৫৬।২)

মূল মন্ত্রটির প্রথমাংশ এইরূপ :—

"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসং সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।"

সায়ণাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন :—"গূর্ত্তয়ঃ স্তোতারো নেমন্নিষো নমস্কারপূর্ব্বে গচ্ছন্তঃ। যদ্ধ নীতহবিষ্কাঃ পরীণসঃ পরিতো ব্যাপ্নুবন্তঃ। এবং গুণবিশিষ্টা যজমানা স্তমিন্দ্রং স্তুতিভিরধিরোহন্তি স্তুবন্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সনিষ্যবঃ সনিং ধনমাত্মন ইচ্ছন্তো বণিজো ধনার্থং সঞ্চরণে সঞ্চারে নিমিত্তভূতে সতি সমুদ্রং ন। যথা নাবা সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং স্তোতারোঽপি স্বাভিমত ধনলাভায়েন্দ্রং স্তুবন্তীতি ভাবঃ।

আর একটি মন্ত্র এইরূপ :—

"উবাসোষা উচ্ছব্ব নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ॥

(ঋ ১।৪৮।৩)

সায়ণাচার্য্যের টীকা এইরূপ :—

"উষা দেব্যুবাস। পুরা নিবাসমকরোৎ। প্রভাতং কৃতবতীত্যর্থঃ। চ নু অদ্যাপুচ্ছাৎ ব্যুচ্ছতি। প্রভাতং করোতি। কীদৃশী দেবী। রথানাং জীরা প্রেরয়িত্রী। উষঃকালেহি রথাঃ প্রের্য্যন্তে। অস্যা উষস আচরণেষ্বা গমনেষু যে রথা দেধ্রিরে। ধৃতা সজ্জীকৃতা ভবন্তি তেষাং রথানামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ। রথপ্রেরণে দৃষ্টান্তঃ। শ্রবস্যবো ধনকামাঃ সমুদ্রে ন। যথা সমুদ্রমধ্যে নাবঃ সজ্জীকৃত্য প্রেরয়ন্তি তদ্বৎ।"

উদ্ধৃত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"উষা পুরাকালে প্রভাত করিতেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনলুব্ধ লোকেরা যেরূপ সমুদ্রে নৌকাসমূহ প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তৎসমুদায় সেইরূপ প্রেরণ করেন।"

(রঃ দঃ)

ধনার্থী বণিকেরা যখন সমুদ্রে পোতসমূহ প্রেরণ করিতেন, তখন তাহাদের রক্ষার জন্য সমুদ্রের স্তুতিও করিতেন। নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে :—

"নূ রোদসী অহিনা বুধ্ন্যেন স্তুবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবো ঘর্ম্মস্বরসো নদ্যোঽঅপব্রন্॥

(ঋঃ ৪।৫৫।৬)

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"হে দ্যাবা পৃথিবী দেবীদ্বয়, যেমন ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সমুদ্র মধ্যে গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেইরূপ আমি অভিলষিত কার্য্য-লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি। সেই দেবগণ দীপ্তধ্বনি যুক্ত নদীসকলকে অপাবৃত করুন।" (রঃ দঃ)

এই সমুদ্রের আকার প্রকারের বর্ণনাও একটি মন্ত্রে আছে :—

"অনারম্ভণে তদবীরয়েথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্॥

(ঋঃ ১।১১৬।৫)

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা অবলম্বন-রহিত, ভূপ্রদেশ-রহিত, গ্রহণীয় বস্তু-রহিত সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড় যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।" (রঃ দঃ)

সায়নাচার্য্য "অনারম্ভণে"র অর্থে "অবলম্বন-রহিতে," "অনাস্থানে"র অর্থে "অস্থীয়তেঽস্মিন্নিত্যাস্থানো ভূপ্রদেশঃ তদ্রহিতে স্থাতুমশক্যে জলে," এবং "অগ্রভণে"র অর্থে "অগ্রহণে হস্তেন গ্রাহ্যং শাকাদিকমপি যত্র নাস্তি তাস্মিনিত্যর্থঃ" লিখিয়াছেন।

সমুদ্রে কোনও আশ্রয় নাই, দ্বীপ ব্যতীত কোনও ভূপ্রদেশ নাই, গ্রহণ যোগ্য একটি তৃণও নাই; চারিদিকে কেবল জল আর জল। শত-অরিত্র (দাঁড়) যুক্ত নৌকা ব্যতীত সমুদ্রে সঞ্চরণ করা যায় না। আর যে নৌকার দাঁড় শতসংখ্যক, সেই নৌকাও যে সুবৃহৎ এবং সমুদ্রযাত্রার উপযোগিনী ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ নৌকা যে কেবল শতারিত্র দ্বারাই বাহিত হইত, তাহা নহে। তাহার "পক্ষ" অর্থাৎ পালও ছিল। পালে বায়ু লাগিয়া তাহাকে গন্তব্য পথে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।* এইরূপ সুবৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া ভুজ্যু তাঁহার পিতা রাজর্ষি তুগ্রের আদেশে দ্বীপান্তরবর্ত্তী দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য সৈন্যগণের সহিত সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদ্রে ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া ভুজ্যুর নৌকাকে জলে নিমগ্ন করে। তখন বিপন্ন ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলে, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাঁহার পিতা তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য ১।১১৬।৩ মন্ত্রের টীকায় এই আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই আখ্যায়িকাটি ১।১১৬।৩ এবং ৪ ঋকেও সূচিত হইয়াছে। তাহাদের অনুবাদ যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া গেল:—

* ঋগ্বেদ ১০।১৪৩।৫:—"ভুজ্যু নামক ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, তরঙ্গের উপর আন্দোলিত হইতেছিল; তোমরা পক্ষ-যুক্ত নৌকা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে।" ইত্যাদি, মূলে আছে:— "অচ্ছা পতত্রিভিঃ," সায়ণাচার্য্য তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন "অচ্ছাভিঃ পতত্রিভিঃ পক্ষোপেতৈঃ নৌবিশেষৈঃ সহ।"

"কোন ম্রিয়মান মনুষ্য যেরূপ ধনত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র অতি-কষ্টে তাঁহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আপনাদিগের নৌকা সমূহদ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে। সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না। (রঃ দঃ)

মূল মন্ত্রটি এইরূপ :—

"তুগ্রো হ ভুজ্যুমশ্বিনোদ মেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিরপোদ কাভিঃ। (১।১১৬।৩)

উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের টীকা এইরূপ :—

"হ শব্দ প্রসিদ্ধৌ। তুগ্রঃ খলু পূর্ব্বং শত্রুভিঃ পীড়িতঃ সন্ তজ্জয়ার্থ মুদমেঘে উদকৈর্ম্মিহ্যতে সিচ্যতে ইত্যুদকমেঘঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ ভুজ্যুমেতৎ সংজ্ঞং প্রিয়ং পুত্রং অবাহাঃ। নাবা গন্তুং পর্য্যতাক্ষীৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মমৃবান্ ম্রিয়মাণঃ সন্ধনলোভী কশ্চিন্মহষ্যো রয়িং ন যথা ধনং ত্যজতি তদ্বৎ। হে অশ্বিনৌ তং চ ভুজ্যং মধ্যে সমুদ্রে নিমগ্নং নৌভিঃ পিতৃসমীপে মূহথুঃ। যুবাং প্রাপিতবন্তৌ। কীদৃশীভিঃ আত্মন্বতিভিঃ। আত্মীয়াভিঃ। যুবয়োঃ স্বভূতাভিরিত্যর্থঃ। যদ্বা ধৃতিরাত্মা ধারণবতীভিরিত্যর্থঃ। অন্তরিক্ষপ্রুদ্ভিঃ অতিস্বস্থত্বাদন্তরিক্ষে জলস্যোপরিষ্টাদেব গন্ত্রীভিঃ। অপোদকাভিঃ। সুশ্লিষ্টত্বাদপগতোদকাভিঃ। অপ্রবিষ্টো দকাভিরিত্যর্থঃ।"

উক্ত মণ্ডল ও সূক্তের চতুর্থ ঋকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"হে নাসত্যদ্বয়, তোমরা তিনখানি শীঘ্রগামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্ অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে; সে রথ তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল।" (রঃ দঃ)

মূলমন্ত্রটি এইরূপ :—

"তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতি ব্রজদ্ভির্ণাসত্যা ভুজ্যু মূহথুঃ পতঙ্গৈঃ। সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষড়শ্বৈঃ॥ (১।১১৬।৪)

উক্ত মন্ত্র সম্বন্ধে সায়ণাচার্য্যের টীকা এইরূপ :—

"হে নাসত্যৌ, সেনয়া সহোদকে নিমগ্নং ভুজ্যুং তিস্রঃ ক্ষপ স্ত্রি-সংখ্যাকা রাত্রী স্ত্রিরহা ত্রিবারমাবৃত্তান্যহানি চাতিব্রজদ্ভি রতিক্রম্য

গচ্ছন্তি রেতাবন্তং কালমতিবাপ্য ।বর্ত্তমানৈঃ পতঙ্গৈঃ পতন্তিস্ত্রিভিস্ত্রিসংখ্যাকৈঃ রথৈঃ রূহথুঃ । যুবামূঢ়বন্তৌ । কেভিরেবং উচ্যতে । সমুদ্রস্যাম্বুরাশের্মধ্যে ধন্বন্ ধন্বনি জলবর্জ্জিতে প্রদেশে । আর্দ্রস্যোদ কেনাক্রীভূতস্য সমুদ্রস্য পারে তীরদেশে চ । কথম্ভূতৈঃ রথৈঃ । শতপদ্ভিঃ শতসংখ্যাকৈশ্চক্রলক্ষণে পাদৈরুপেতৈঃ ষড়শ্বৈঃ । ষট্‌ভিরশ্বৈর্যুক্তৈঃ ॥"

শেষোক্ত মন্ত্রে তিনখানি শতচক্রবিশিষ্ট ও ষড়শ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে তিন দিন তিন রাত্রি বহন করার উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্য এই মন্ত্রে রথত্রয় বা ছয়টি অশ্বসম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই। পূর্ব্বমন্ত্রে অশ্বিদ্বয় "নৌভিঃ" অর্থাৎ নৌকাদ্বারা সমুদ্রনিমগ্ন ভুজ্যুকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। আর এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে তাঁহারা শতচক্রবিশিষ্ট ও ষড়শ্বযুক্ত তিনটি রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এই দুইটি মন্ত্রের মধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "সমুদ্রের উপর রথ চলিবে কিরূপে ?" কিন্তু মন্ত্রে "সমুদ্রস্য ধন্বন্" এই পদ আছে। সায়ণাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "সমুদ্রস্যাম্বুরাসের্মধ্যে ধন্বন্ ধন্বনি জলবর্জ্জিতে প্রদেশে", অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে যে জলবর্জ্জিত প্রদেশ, অর্থাৎ স্থলভাগ বা দ্বীপ ছিল, সেই প্রদেশে এবং সমুদ্রের পারে বা তীরদেশে ভুজ্যুকে বহন করিবার জন্য রথ চালাইয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিয়া মনে হইতেছে। অশ্বিদ্বয় সমুদ্রনিমগ্ন ভুজ্যুকে প্রথমে শতারিত্র বিশিষ্ট নৌকায় তুলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে সমুদ্রের মধ্যে জলবর্জ্জিত প্রদেশ বা দ্বীপ প্রাপ্ত হইলে, এবং সমুদ্রের পারে উপস্থিত হইলে, স্থলভাগের উপর শতচক্রবিশিষ্ট ও ষড়শ্বযুক্ত রথ চালাইয়া ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা উভয় মন্ত্রের মধ্যে অর্থের অসঙ্গতি পরিহার করিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহাই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য। পরবর্ত্তী ঋকে (৫ম ঋকে) আবার শতারিত্রবিশিষ্ট নৌকার উল্লেখ আছে।*

* শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই ঋকের ব্যাখ্যায় এক

ঋগ্বেদে সমুদ্রের মধ্যে "দ্বীপেরও উল্লেখ আছে। ১।১৬৯।৩ ঋকে "ন দ্বীপং দধতি পয়াংসি" অর্থাৎ জলসমূহ যেরূপ দ্বীপকে ধারণ করে, এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য একটি মন্ত্রেও (১০।১০।১) সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত মন্ত্রে "তিরঃ পুরু চিৎ অর্ণবং জগন্বান্" বাক্য আছে। সায়ণাচার্য্য তাহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ—"তিরঃ অন্তর্হিতং অপ্রকাশমানং নির্জ্জন-প্রদেশঃ ইত্যর্থঃ। পুরুচিৎ বহ্বপি বিস্তীর্ণং চ অর্ণবং চ অর্ণবং সমুদ্রৈকদেশং অবান্তরদ্বীপং জগন্বান্ গতবতী যমী।"

প্রাচীন আর্য্যগণ পোতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করিতেন, ঋগ্বেদে তাহারও প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদের ৬।২০।১২ ঋকে উক্ত হইয়াছেঃ—

"প্র যৎ সমুদ্রমতি শূর পর্ষি পারয়া তুর্ব্বশং যদুং স্বস্তি। সায়ণাচার্য্য টীকায় লিখিয়াছেন "হে শূর, বীরেন্দ্র, যৎ যদা সমুদ্রমতিক্রম্য, প্রপর্ষি প্রতীর্ণো ভবসি, তদা সমুদ্রপারে, তিষ্ঠন্তৌ তুর্ব্বশং যদুঞ্চ পারয়ঃ সমুদ্রমতারয়ঃ।"

অর্থাৎ, "হে বীর যৎকালে তুমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলে, তখন সমুদ্রপারে অবস্থিত তুর্ব্বশ ও যদুকে সমুদ্রপার করাইয়াছিলে।" (রঃ দঃ)

অন্য একটি মন্ত্রেও এই বিষয়ের উল্লেখ আছেঃ—

স্থলে বলিয়াছেনঃ—"এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'শতপদ্ভিঃ' এবং 'ষড়শ্বৈঃ' পদ উপলক্ষে অশ্বিদ্বয় যে বাস্পীয় পোত পরিচালনা করিয়াছিলেন, এবং শতচক্রবিশিষ্ট ষড়শ্বশক্তিতে পরিচালিত বাস্পীয় পোত সকল যে তদুপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।" সায়ণাচার্য্যের টীকা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এইরূপ উৎকট অনুমানের কোনও কারণ নাই। অশ্বিদ্বয় জলনিমগ্ন ভুজ্যকে প্রথমে তাঁহাদের নৌকায় বহন করিয়া পরে স্থলভাগে ষড়শ্ববাহিত শতচক্রবিশিষ্ট রথে বহন করিয়াছিলেন। এই অর্থই সুসঙ্গত।

"উত ত্যা তুর্ব্বশাযদু অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্ধাঁ অপারয়ৎ। (৪।৩০।১৭)

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ:—যজ্ঞপতি, বিদ্বান্ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে (সমুদ্র সমুত্তীর্ণ করিয়া) অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন।"

উদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, যদু ও তুর্ব্বশ অনভিষিক্ত থাকিয়া সমুদ্রপারে গিয়া বাস করিতেছিলেন। পরে ইন্দ্র স্বয়ং সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্র-সমুত্তরণ-পূর্ব্বক সপ্তসিন্ধু দেশে আগমন করেন ও তাঁহাদিগকে অভিষেক করিয়া রাজা করিয়াছিলেন।*

এই সমুদ্র সম্ভবতঃ "রাজপুতানা সমুদ্র" ছিল। তাহার পরপারবর্ত্তী গুর্জ্জরদেশে গিয়া যদু ও তুর্ব্বশ রাজা হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা অনার্য্যদেশে গমন করায় যজ্ঞাদি দ্বারা অনভিষিক্ত ছিলেন। এই কারণে ইন্দ্র সমুদ্রপারে গিয়া তাঁহাদিগকে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে লইয়া আসিয়া অভিষিক্ত রাজা করেন। গুর্জ্জরদেশের সমুদ্রতটে যদুবংশের রাজধানী দ্বারকার উল্লেখ মহাভারত ও পুরাণাদিতে দেখা যায়। মনে হয়, বৈদিক যুগে যদুগণ গুর্জ্জরদেশে গমনপূর্ব্বক রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাহা অনার্য্যাধ্যুষিত দেশ থাকায়, সম্ভবতঃ যদু ও তুর্ব্বশ বৈদিক ধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সপ্তসিন্ধু দেশে পুনর্ব্বার লইয়া আসিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। (১।৫৪।৬) বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত অথবা বৈদিক ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে "দাস"-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কারণেই বোধ হয় যদু ও তুর্ব্বশ ঋগ্বেদের ১০।৬২।১০ ঋকে "দাসাঃ" এই বিশেষণে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

---

* পুরাণে যদু ও তুর্ব্বশু যযাতি রাজার পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যযাতি তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করায়, সম্ভবতঃ তাঁহারা অনভিষিক্ত অবস্থায় সমুদ্রপারে গিয়াছিলেন।

টমাস বেকেট

ইংল্যাণ্ডে হেনরীর রাজত্ব কালে টমাস বেকেট নামে একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। রাজা তার গুনে মুগ্ধ হয়ে তার বন্ধুত্ব স্বীকার করেন এবং তার উপদেশ মত রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন।

বেকেটের ন্যায় চতুর, কার্য্যদক্ষ ও বুদ্ধিমান লোক ইংল্যাণ্ডে তখন খুব কমই ছিল। এদিকে আবার তার অখ্যাতিও ছিল কম নয়। প্রভুত্ব প্রিয়তা নিষ্ঠুরতা, অমিতব্যয়িতা, প্রজা উৎপীড়নের কাহিনী, অহংকার, সাধারণ-অর্থের অপব্যবহার তার জীবনীর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভরা।

১১৫৪ খৃঃ অব্দে বেকেট ক্যান্টরবেরীর প্রধান-ডিয়েকন হন। তখন ইউরোপীয় রাজ্য গুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টজগতের একছত্র সম্রাট্ ছিলেন পোপ্ এবং দেশের মালিক ছিলেন বিভিন্ন রাজন্যবর্গ। হেনরী দেখলেন এই দ্বিধা বিভক্ত শক্তিকে এক করে রাজ শক্তির অধীনে আনতে পারলে একটি বিরাট রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। তাই তিনি বেকেটকে তার অভিলায পুরণের অস্ত্ররূপে ধরলেন। প্রধান-ডিয়েকন হয়ে বেকেটও সমস্ত গীর্জ্জা সংঘবদ্ধ করে কতকটা রাজ অধীনে আনতে সমর্থ হলেন।

হেনরী তখন বেকেটকে আরও ক্ষমতা দিয়ে প্রধান মন্ত্রী করলেন। নূতন মন্ত্রী সদ্য-সংস্কৃত গীর্জ্জাগুলি থেকে বহু অর্থ শুল্ক আদায় করে, যুদ্ধ বিগ্রহ চালাতে লাগলেন এবং নব নব উপায়ে হেনরীর বহু অর্থাগমের সুবিধা করে দিলেন। বেকেট নিজে একজন অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন বলে তার একাজে বেশ সাফল্য হল। বলা বাহুল্য হেনরীও খুব সন্তুষ্ট হোলেন; কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। চাকা ঘুরলো!

তারপর গীর্জ্জাগুলিকে রাজ অধিনে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য হেনরী কুক্ষণে বেকেটকে ক্যান্টারবেরীর প্রধান পুরোহিত করলেন। বেকেটের জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজনীতিক গগনও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তুমুল ঝটিকার পূর্ব্বভাষ ধারণ করল। ইতিহাস বদলে গেল। এসব কথা, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে, কিন্তু টমাস বেকেটের ভাগ্যলিপি এখনও লোকের মুখে প্রবাদ আকারে শোনা গিয়ে থাকে।

প্রধান মন্ত্রী থেকে প্রধান পুরোহিত হয়ে বেকেট দুই ক্ষমতাই নিজের হাতে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন রাজার অবর্ত্তমানে রাজ প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা আর প্রধান পুরোহিত ধর্ম্ম জগতের গুরু, পোপের নীচেই তাঁর স্থান। এক কথায় বেকেট হতে চান হেনরীর কাল্পনিক রাষ্ট্রের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। হেনরী তাঁর হাতে কলের পুতুল বইত নন—যখন যেমন করাবেন, তখন তেমনি করবেন। লোকটা ভয়ানক প্রভুত্ব প্রিয়। এবার তিনি চাইলেন রাজ-শক্তিকে দাবিয়ে গীর্জ্জা-শক্তিকে সর্ব্বশীর্ষে স্থান দিতে। এতে হুজুকে ধর্ম্মান্ধের দল তাকে যা সহানুভূতি ও সম্মান-আর্ত্তি করতে লাগল পোপ তা কখনো চোখে দেখেছেন কিনা সন্দেহ।

হেনরী ভয়ানক কুপিত হলেন। দরবার থেকে বেকেটের বহু অর্থ দণ্ড ও অনেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার হুকুম হল। বেকেট তখন বেগতিক দেখে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পোপের জিম্মায় রেখে তাঁর অনুমতি নিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন। এখানে বড় বড় কোম্পানীর ম্যানেজার ডিরেক্টররা যা করেন তাই। বছর ছয়েক 'হোমে' থেকে শুধু দেশের হালচাল সময় সুযোগ লক্ষ্য করে কাটাতে লাগলেন। এর ভিতর ইংল্যাণ্ডে অনেক কিছু হয়ে গেলো। কেউ বললে বেকেট ভালো কেউ বললে হেনরী ভালো। কেউ বললে "ধর্ম্মের জয়" কেউ বললে "রাজার জয়।"

দেখতে দেখতে ছয় বৎসর কেটে গেল। বেকেট চুপ করে থাকবার

পাত্র নন তিনি হাওয়া দেখে দেশে ফেরবার জন্যে পোপের ও রাজার অনুমতি চেয়ে পাঠালেন। তখনও ছাড় পত্রের এত হাঙ্গামা হয়নি, সবেমাত্র বীজাকারে ছিলো। তাই শুধু আমলাতন্ত্রের নয় খোদ রাজারও অতবড় শত্রু টমাস বেকেট ফ্রান্সের উপকূল ছেড়ে নির্ব্বিঘ্নে শান্ত সমুদ্রে ইংল্যাণ্ডাভিমুখে পাড়ি জমাতে পেরেছিলেন। তরী ভাসলো।

শরৎকাল, শান্ত সচ্ছ স্থির নীলাভ লবণাম্বু, নীচে কচি কিশলয়-জিনি শয্যা বিস্তার করেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু গাঢ় গাঢ়তর ইন্দ্রিয়-গ্রাম স্নিগ্ধকারী নিলীমা, একটুও তরঙ্গ ভঙ্গ নেই। এযে কখন দুষ্ট, চঞ্চল ফেনোর্ম্মি ছন্দে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করতে পারে তা কল্পনার অগোচর। ঊর্দ্ধে তদ্রূপ সচ্ছ, নীল, নির্ম্মল শারদাকাশ। ইতস্ততঃ মেঘ শিশুদল ক্রীড়া-চঞ্চলবেগে মাতৃ অঙ্ক থেকে পালিয়ে সঞ্চরন করে বেড়াচ্ছে। তারা দিনের পড়া ভুলে গেছে, রাতের খবরে বাজে মাথা ঘামায় না, শুধু বাঁধন খুলতে চায়। আকাশের কোনে তারা একটা মস্ত থালায় রং গুলেছে। ছুটির মত্ততা তাদের শিশু প্রাণের শিরা উপশিরায় উদ্দামবেগে প্রবাহিত হচ্ছে! কখনও রংএ তারা পরস্পর লাল হয়ে উঠছে, কখনও বালসুলভ ভয়ে ফুল্ল কমল ঈশৎম্লান হয়ে যাচ্ছে। কখনও নীচে সচ্ছ দর্পণে মুখ দেখে আত্মহারা হয়ে পরক্ষণে ঊর্দ্ধে ক্রমঘন নিলীমার অপরূপ সৌন্দর্য্যে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হচ্চে—পরমুহূর্ত্তে আবার রংয়ের থালায় আকৃষ্ট হয়ে সর্ব্বাঙ্গ লালে লাল করে ফেলছে। দুই দিকেই অনন্ত-সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলে দিয়ে অনন্ত অনন্ত-রূপে বিরাজমান। মাঝে মাঝে দলে দলে অথবা যূথভ্রষ্ট দুই চারিটি সমুদ্র পারাবত কখনও ঊর্দ্ধে নীলাকাশে পাখা মেলে স্ফটিক শুভ্ররূপে ভেসে চলেছে কখনও নীচে নীল জলে সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব্ব শিল্পীর অপূর্ব্ব চিত্র পটে অপূর্ব্ব প্রাণের সাড়া। এই নিলীমা পুটিত সৌন্দর্য্যময় অনন্তের মধ্যে বেকেটের অর্ণব-পোতখানি ভেসে চলেছে।

টমাস বেকেট দেশে ফিরলেন। পোপ তাঁকে সপদ সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে রাজার সহিত সদ্ভাবে কাটাতে পরামর্শ দিলেন।

তিনি প্রধান পুরোহিত রইলেন বটে কিন্তু তিনি আর ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী কিনা সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ রইলো। ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করেই বেকেট তাঁর অবর্ত্তমানে এই ছয় বৎসর যা যা হয়েছিলো তা প্রায় সবই বাতিল করে দিলেন। এইবার তাঁর মন্ত্রীত্বের সত্ত্ব পরীক্ষার এক মহা সুযোগ এসে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে রাজা একবার রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র গেলেন। বেকেটও সুযোগ বুঝে প্রথানুযায়ী রাজার অবর্ত্তমানে সাম্রাজ্য পরিদর্শনে খুব ধুমধাম করে বেরিয়ে পড়লেন। পথে রচেষ্টার। রচেষ্টার একটি প্রাসাদ দুর্গ। এই দুর্গ এখন তাঁর একজন শত্রুর কবলে। সেখানে তার বড় একটা সুবিধা হলো না বটে কিন্তু নাগরিকেরা তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা করলে। শোভাযাত্রার দুই পাশে হাঁটু গেড়ে বিরাট জনতা তাঁদের পূর্ব্বতন ধর্ম্ম গুরুর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে লাগলো ধূপধুনোর গন্ধে রাস্তা পল্লী আমোদিত হয়ে উঠলো। সশস্ত্র আহরিত সুসজ্জিত একদল বাহিনী বেকেটের অগ্রপশ্চাৎ চলতে লাগলো শ্বেত বেশভূষায় সজ্জিত যাজক-মণ্ডলী পবিত্র ক্রুস পুরোভাগে স্থাপন করে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। শ্বেতাম্বর শ্বেতশীর্ষ প্রধান পুরোহিত হস্তোত্তলন করে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলেছেন। তার মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ অপার্থিব হাসিতে পরিপূর্ণ! অতি মনোরম দৃশ্য। বিরাট জনতার সমবেত প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণে ব্যাকুল আত্মনিবেদন, যেন তাঁর চরণ তলে পৌঁছে আশীর্ব্বাদ নিয়ে আবার বিপুল বেগে তাদের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সুন্দর ধর্ম্মানুষ্ঠান—কিন্তু সেখানেও গুপ্তচর! একটা বিসদৃশ শব্দ শোনা গেল—নিস্তব্ধ বেকেট শুনলেন—“সাবধান—খোঁড়া ঝুলছে”।

জায়গা মত বাড়িয়ে কমিয়ে টিক্ টিকির খবর রাজার কাণে এলো। রাজা আঁৎকে উঠলেন, “আঃ বিদ্রোহ! এতদূর! আমারই খেয়ে পরে আদর যত্নে মানুষ হয়ে এখন আমারই মুকুট ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়ায়। অসহ! এতগুলো কাপুরুষ ভেড়ার দল পুষছি যে তার মধ্যে একটাও সেই খোঁড়া গাধায় চড়া পুরুতটাকে ধরে আনতে পারলে না!

সারি সারি ছায়া শীতল শোভাময় বৃক্ষ শোভিত রাজবর্ত্ম ক্যান্টারবেরী

অভিমুখে, উচ্চ নীচ বঙ্কিম কুটীল ভুজঙ্গ গতিতে প্রসারিত। দূরে একদল অশ্বারোহী সৈন্য অশ্ব খুরোত্থিত ধূলি পটলে গগন সমাচ্ছন্ন করে বায়ুবেগে ছুটে আসছে। এই দলে পঁচিশ কি তিরিশ জন সৈন্য। পুরোভাগে চার জন যোদ্ধ পুরুষ সুদৃশ্য পোষাকে সজ্জিত ; দেখলেই মনে হয় এরা সমান পদবী সমান যোদ্ধা সমান সম্মানিত রাজপুরুষ, সমসুশ্রী সমতেজস্বী মিশমিশে কালো অশ্বিনীর পৃষ্ঠে সমান পাদক্ষেপে ছুটে চলেছেন। বাকী সব এদেরই সৈন্য সামন্ত। মনে হয় এরা গন্তব্য স্থানে না পৌঁছে কিছুতেই বিশ্রাম নেবে না। রাস্তাটি সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ রোমান রোড। পথে আবার সেই রচেষ্টার। রচেষ্টার দুর্গে এই অশ্বারোহী দল ক্লান্ত অশ্বকে বিমুক্ত করলেন। সৈনিক বেশ পরিত্যাগ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন পরে আবার সজ্জিত হয়ে ক্যাণ্টারবেরী অভিমুখে রওনা হলেন দূরে অশ্বপদধ্বনি ক্রমে ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে দিকবলয়ে মিলিয়ে গেল। অশ্বরোহী দল রেজিনাল্ড ফিজার্স প্রমুখ হেনরীর চার জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও তাদের বাছা বাছা কয়জন সৈন্য। আজ রাজ সভায় অপমানিত হয়ে ধর্ম্মাধ্যক্ষকে দরবারে হাজির করবার জন্য গ্রেপ্তার করতে চলেছেন।

পাঠক চলুন আমরাও আর্চবিশপের সন্ধানে যাই।

প্রায় এক সপ্তাহ হলো বেকেট সাম্রাজ্য পরিদর্শন শেষ করে ভগবান খৃষ্টের জন্ম উপলক্ষে ক্যাণ্টারবেরীতে এসেছেন এবং প্রথানুযায়ী গীর্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দান করছেন। প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী—নতজানু হয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছে। ভগবানের জন্মদিনে গীর্জ্জা পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়েছে। স্থানে স্থানে যুঁই-লতা পুষ্প-স্তবক বুকে এঁটে হাত ধরা ধরি করে ঝুলছে। সবুজ পত্রাবলী শ্বেত পুষ্পে শোভিত হয়ে বলয়াকারে বেদির চতুঃপার্শ্বে দোদুল দুলছে। ফুলের কার্ণিশ, পাতার দেওয়াল, নব প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছে শোভিত উদ্যান, মখমল বিছান অলিন্দ, শারি শারি মখমল মোড়া আসন, কিংখাপের গালিচা ঢাকা বেদি, চতুঃপার্শ্বে অল্প পরিসর স্থান, তাও কিংখাবে আচ্ছাদিত, নানারংঙের আলোর মালা, সুউচ্চ চূড়ায় গুরু গম্ভীর ঘণ্টা নিনাদ সমভাবে সমবিচ্ছেদে গগন বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে, আবার সে শব্দ দূরে আকাশে মিশিয়ে

যাচ্ছে, পুনরায় ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠছে। সামান্য সুঁচেরও পতন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কি অপূর্ব্ব নয়ন-মনস্নিগ্ধকারী গাম্ভীর্য্য।

বিশপ প্রবেশ করলেন। বিশাল ক্রুস আগে আগে চলল। বেদীর পার্শ্বে নির্দ্ধারিত আসনে ধর্ম্মাধ্যক্ষ টমাস বেকেট উপবিষ্ট হলেন, আবার সেই আকাশ বাতাস, প্রকম্পনকারী গম্ভীর ঘণ্টা নিনাদ। বেকেট উঠে তাঁর সেই সর্ব্বপরিচিত গম্ভীর স্বরে ভগবানের বন্দনা গীতি পাঠ করলেন। দুই হাতে, অঞ্জলিবদ্ধ ভাবে বাইবেল ধরা, সম্মুখে প্রসারিত উদাস অনন্ত ছোঁয়া দৃষ্টি; লোকে দেখল যেন মোজেস কৃপায় তাদের ভেতর নেমে এসেছেন। দেখল! নির্নিমেষ পুলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বেকেট বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে তার স্বর বেজে বেজে উঠতে লাগলো। সে স্বরের মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় সম্মুখোপবিষ্ট অতগুলো লোকের হৃদয় তন্ত্রী বেজে উঠতে লাগলো। সকলের চক্ষুই দর বিগলিত ধারা, পুলকে সকলে রোমাঞ্চ কলেবর, এক সুরে যেন তাদের হৃদয় বাঁধা। অতগুলো লোক যেন এক জন লোক, একের চিন্তা প্রত্যেকেরই চিন্তা। অজ্ঞাতে তাদের মন দেশকালের পারে চলে গেল। বেকেট বক্তৃতা শেষ করে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেন। দর্শকের মনে সে দৃশ্য গেঁথে রইলো।

তখন বেলা চারটে। বেকেটের সবে খাওয়া হয়েছে—শোবার ঘরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে তিনি গল্প করছেন। চাকর বাকরেরা তখনও খাচ্ছে একজন যাজক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বেকেটকে বললে "সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজার লোকজন আসছে"। বেকেট পূর্ব্ব থেকেই সব জানতেন, বললেন, "আসুকগে যা পারে করুক আমি গ্রাহ্যিকরি না।" যাজক ফিরে গেল। বেকেট নিয়ম মত সমস্ত কাজ সমাধা করলেন তখনও সন্ধ্যা হয়নি। একজন খবর দিলে চারজন যোদ্ধপুরুষ সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

ফিজার্স প্রমুখ চারজন তাদের লোকজন অস্ত্র-শস্ত্র এক জায়গায় রেখে বিশপভবনে এসে সংবাদ পাঠিয়ে ছিলেন। একজন পরিচারক এসে তাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল।

বিস্তৃত প্রাঙ্গণ চতুঃপার্শ্বে ঘনপত্র শোভিত সুন্দর বৃক্ষশ্রেণী সমস্থান

অধিকার করে ঘিরে রয়েছে তার পরেই ফুলের বাগান উচ্চ দৃঢ় সিংহদ্বার থেকে দেখা যাচ্ছে, মধ্যস্থানে অট্টালিকা এইটিই বিশপের প্রাসাদ। সমস্ত দরজা জানালা উন্মুক্ত, এরা বন্ধ হতে জানে কিনা কেউ জানে না। বড় বড় হলঘর, মাঝে সমান সরল থামগুলি ছাতমাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে, সমস্তই শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল চূণকাম করা। হলের পরেই দরদালান বা প্রাসাদের ভেতর ঘর সংলগ্ন সাধারণ পথ। তার পরেই বিশপের কামরা। দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় বেকেট উপবিষ্ট অভ্যাগত-গণ মেজেয় পাতা গালিচার উপর বসে আছেন বন্ধু জন্ সেলিস্‌বেরী এসেছেন বেকেট তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। এমন সময় যোদ্ধা চতুষ্টয় ঘরে ঢুকলেন।

বিশপ জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মসগুল, সম্ভাষণ দূরে থাক তাদের দিকে ফিরেও চেয়ে দেখলেন না। রাজ অমাত্যগণ অন্যান্য সমাগতদের ন্যায় মেজেয় বসলেন বহুক্ষণ পর বেকেট তাদের একের পর এক আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে লাগলেন। তখন ফিজার্স তাদের মুখপাত্র স্বরূপ উঠে এইরূপে কথা আরম্ভ করলেন।

ফিজার্স। ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন। (সমাগত ব্যক্তিবর্গ চঞ্চল হইয়া উঠলেন; বেকেটের মুখ আরক্তিম ভাব ধারণ করল; ফিজার্স বলতে লাগলেন)। আমরা রাজার কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে আসছি। একাকী শুনবেন না এই সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষেই শুনবেন।

বেকেট। তোমাদের যা খুসী। আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। আমি ওসব গ্রাহ্যিই করি না।

ফিজার্স। বেশ তবে নির্জ্জনে। (লোকজনদের ভয় হল হত্যা করবে নাকি! কিন্তু এদের অস্ত্র শস্ত্র নেই দেখে সে ভাবনা কতকটা দূর হল। একে একে তারা চলে যেতে লাগলো এবং তুমুল তর্ক বিতর্ক শোনা যেতে লাগলো)।

বেকেট। (একজন যাজককে ডাকতে ডাকতে) বলে যাও তোমাদের বক্তব্য।

ফিজার্স। তা হলে শুনুন, রাজা আপনাকে কি বলেছেন। যখন আপনাদের ভেতর সন্ধি হয় রাজা আপনার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। আপনি দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন। ফিরতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি এমনি অকৃতজ্ঞ যে আপনার ব্যবহার আপনার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধকেও লজ্জায় ম্লান করে দিয়েছে। আপনি সন্ধি ভঙ্গ করেছেন। অহংকারে মত্ত হয়ে নিজের প্রভুকেও অগ্রাহ্য করতে আরম্ভ করেছেন। যে সব পুরোহিত রাজার সিংহাসন অধিরোহণের সময় যাজন করেছিলো। তাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যে সমস্ত লোকের সাহায্যে রাজা রাজ্য পরিচালন করেন সেই মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনার উদ্দেশ্য সাংঘাতিক ও সাম্রাজ্যের অনিষ্টকর বলে লোকের ধারণা। এখন আপনি বলুন দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের পক্ষ সমর্থন করবেন কি না? আমরা এই জন্য প্রেরিত হয়েছি।

বেকেট। রাজার অনিষ্ট চিন্তা আমি কোনও দিনই করিনি। জনসাধারণ আমায় ভালবাসে। এতদিনের অদর্শনের পর তারা যদি আমার কাছে আসে, সেটা কি আমার দোষ?

ফিজার্স। ও সব কথা রেখে দিন। এখন রাজাজ্ঞা যা তাই শুনুন। রাজা আপনাকে এই আদেশ করছেন যে, যে সমস্ত পুরোহিতকে আপনি তাড়িয়েছেন তাদের পুনরায় স্ব স্ব পদে স্থাপন করুন আর নিজের ওসব দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ করবার চেষ্টা দেখুন।

বেকেট। (ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে) হাঁ যা ন্যায্য তা করা যাবে। কিন্তু পূর্ব্বেই পষ্টাপষ্টি বলে রাখছি রাজা আমার তরফ থেকে কোনও শপথ টপথ পাবেন না—আমার দলবল কারো কাছ থেকে নয়। পুরুতদের কথা বলছিলে? ঈশ্বরের কৃপায় আমি অনেক প্রবঞ্চককে কাজ থেকে অবসর দিয়েছি। তাঁর ইচ্ছা হলে বাকী গুলোকেও দেবো।

ফিজার্স। তা হলে বুঝলাম আপনি রাজাদেশ মানবেন না, কেমন? যা হক রাজা আপনাকে আরও বলছেন যে, যেসব বিশপকে আপনি তার বিনানুমতিতে কর্ম্মচ্যুত করেছেন তাদের আবার ফিরিয়ে নিন।

বেকেট। পোপ তাদের শাস্তি দিয়েছেন, আমি কে! আমি তার কি জানি। তোমাদের পছন্দ না হয় তাঁর কাছে যাও!

ফিজার্স। আপনি কি পোপকে দিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ান নি?

বেকেট। হাঁ দিয়িছি। রাজাই আমাকে সে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজার সিংহাসন অধিরোহণের সময় এরা আমার অনুমতি না নিয়ে রাজার মাথায় মুকুট পরিয়েছিলো। সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি রাজার কাছে নালিশ করি। তিনি এর বিচারের ভার আমার উপর দেন।

ফিজার্স। রাজা আপনাকে তাঁদের শাস্তি দিতে বলেছিলেন। মতলববাজ বদমাইস্! আপনি রাজাকে এমনি একটা বিশ্বাসঘাতক পেলেন নাকি যে যাঁরা তাঁর হুকুমে কাজ করেছে তাদের শাস্তির জন্যে আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। না! এরকম অপবাদ অসহ্য, নিতান্ত অসহ্য! (জন্ বেকেটকে শান্ত করতে লাগলেন, ফিজার্স বলতে লাগলেন) আপনি যখন তাঁর কোনও আদেশই মানতে রাজী নন তখন আপনার প্রতি রাজার চরম আদেশ হচ্ছে এক্ষুনি আপনার দলবল নিয়ে চিরকালের মত এদেশ ছেড়ে চলে যান। বহুবার আপনি শান্তিভঙ্গ করেছেন আপনাকে আর তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না।

বেকেট। কখনোই যাবো না। কিছুতেই ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবো না। এক মৃত্যু ভিন্ন আর কেউই আমাকে এই গির্জ্জা থেকে এক চুলও নড়াতে পারবে না। শান্তিভঙ্গের কথা বলছো! আমার প্রতি তোমরা যে অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছ লিখলে একখানা মস্ত বড় বই হত। আমাকে যদি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এনে আমার জিনিষ পত্তর দস্যুর মত লুঠতরাজ ও অপমানের একশেষ করা হয়েছে,—অনাস্থা জ্ঞাপন করতে এসেছো লজ্জা করে না। রেনফ ডি ব্রক্ ইচ্ছা করে আমার মদ নষ্ট করে দিয়েছে, রবার্ট ডি ব্রক্ আমার অশ্বতরীর ল্যাজ কেটে দিয়েছিলো। আর এখন দলবেঁধে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছো। ধিক! তোমাদের।

ডি, মরভাইল। আপনার প্রতি যদি অন্যায় করা হয়ে থাকে আপনি মন্ত্রীসভায় জানান !

বেকেট। ঢের করে দেখা গেছে, কিছুই হয় না। প্রতিদিন প্রতি-নিয়ত এত অত্যাচার হচ্ছে যে তা বলে শেষ করা যায় না। আমার ত দরবারে যাওয়াই বন্ধ। যে রাজাই আসুক আমার প্রতি কেউই ন্যায় বিচার করবে না। না, আমি আর এ সহ্য করবো না। প্রধান পুরোহিত হিসাবে আমি এর প্রতিকার করবো। দুনিয়ার কারও বাধা দিতে সাহস থাকে ত আসুক !

ফিজার্স। তা হলে আপনি আমাদের সব্বার উপরেই হুকুম চালাবেন ও সকলকেই বরখাস্ত করবেন। এইত !

জনৈক। না, আমরা বহুৎ সহ্য করেছি আর না। চল, এসো এর একটা ব্যবস্থা করা যাক। (তাঁরা বেরিয়ে যেতে লাগলেন। বেকেটও উঠলেন। যেতে যেতে ১জন যোদ্ধা বেকেটের অনুচরবর্গকে লক্ষ করে বললে "রাজার নামে তোমাদের জানাচ্ছি, দেখো যেন লোকটা না পালায়।"

বেকেট। কী ! ভেবেছো পালিয়ে যাবো। দুনিয়ার কারও ভয়ে নয়। তোমাদের রাজা এলেও নয়। যেতে যেতে শুনে যাও তোমরা মারতে যত না প্রস্তুত, আমি মরতে তার চেয়েও প্রস্তুত জেন। ফিরে এসে আমাকে এইখানেই পাবে।

ফিজার্স তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে এসে সে বাড়ীর দরজায় সশস্ত্র কড়া পাহারা বসিয়ে দিলেন যেন কেউ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে। তার পর খুব তাড়াতাড়ি অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পুনরায় বিশপ ভবনে প্রবেশ করলেন।

তখন চারটে বেজে গেছে। গীর্জ্জায় সন্ধ্যা-আরাধনার ঘড়ি বাজছে। আর্চ বিশপ তার খাস কামরায় বিশ্রাম কর্চ্ছেন। এমন সময় ছুটতে ছুটতে একজন যাজক এসে তাঁকে খবর দিলে "তারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসছে।" বেকেট বললেন "আসুকগে আমি গ্রাহ্যি করি না।" যাজক বেকেটের মত জীবনের প্রতি মমতা শূন্য হয় নি, সে তাড়াতাড়ি হল

ঘরের দরজায় খিল দিলে ও ওরই মধ্যে একটু বাধা দেবার যোগাড় করে রাখলে।

তারা আসছিলো বেকেটকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে কিন্তু ঢুকে দেখলে দরজা বন্ধ। ভেঙ্গে ঢোকা সময় সাপেক্ষ। রবার্ট ডি ব্রক্ এ বাড়ীটার অন্ধিসন্ধি সবই জানতো। তারা তখন তার পরামর্শে সন্ধ্যার আবছায়ায় একটা জানালা দিয়ে পাশের বাগানে লাফিয়ে পড়ল ও বিশপের ঘরসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ির কাছে আসতে লাগল। সিঁড়িটা পূর্ব্বেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিলো বটে কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ কিংবা পালাবার উদ্দেশ্যে একখানা মই সেখানে দাঁড় করান ছিলো। তারা যখন সেই মই বেয়ে উঠতে লাগল তখন ভীত যাজক মণ্ডলী বুঝতে পারলে মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রু নিকটে এসে পড়বে তখনও সময় ছিলো কারণ তারা সরাসরি বেকেটের ঘরের দিকে না এসে আগে তাদের অন্যান্য লোকদের ভেতরে আনবার জন্যে হল ঘরের দরজা খুলে দিতে গেলো। তখনও অত বড় গীর্জ্জার মধ্যে এমন বহু লুকোবার স্থান ছিলো যে সেখান থেকে খুঁজে বের করা যার তার কর্ম্ম নয়। কেন্তু বেকেট মহা অভিমানী। তিনি তাঁদের কথা দিয়েছেন সেখানেই থাকবেন, তিনি পালাতে পারেন না। এদিকে ভীত সন্ত্রস্ত জনতার ভেতর একটা সাড়া পড়ে গেলো "গীর্জ্জা, গীর্জ্জায় চলো, গীর্জ্জায় চলো।" গীর্জ্জা তবুও কিছু নিরাপদ। বেকেটের বন্ধুরা তাঁকে একরকম জোর করেই সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যোগ দিতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েক পা গিয়েই তিনি ক্রশের কথা জিজ্ঞাসা করলেন ক্রশ আনা হয়েছে কিনা। বেকেটের বন্ধুরা তাঁর জীবন রক্ষার জন্যই অতিমাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। ক্রশের কথা তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিছলো। কিন্তু বেকেট ক্রশ না নিয়ে নড়তে চাইলেন না। ভেতরে ভেতরে গৌরবজনক মৃত্যুলাভের তার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিলো, আজ তার উদ্যাপনের বিশেষ সম্ভাবনা। নির্ভীক বেকেট দৃঢ়পদে সেইক্ষণের প্রতীক্ষায় একটা থামের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিজার্স ও তার অনুচরেরা কতকগুলি ভীত, সন্ত্রস্ত যাজককে মেষ-পালের ন্যায় তাড়াতে তাড়াতে সেই দিকে নিয়ে আসছিলো। বেকেটের সঙ্গীরা গোলমাল শুনে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। বেকেট তাদের ধমকে উঠলেন "কীঃ! ভয় পেয়েছো? দূর হও কাপুরুষের দল সামনে থেকে! ভগবানের মন্দির কথনো দুর্গ হতে পারে না।" নিজ হাতে দরজা খুলে তিনি সেই সব বিতাড়িত লোকগুলোকে ভেতরে আনলেন। তারা ঢুকেই ইতস্ততঃ পালিয়ে গেলো। এমনকি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যাণ্টারবেরীর উইলিয়াম, বেনিডিক্ট ও জন্ মৃত্যু বরণ করতে পষ্টাপষ্টি তাদের অক্ষমতা জানিয়ে তাঁকে জন্মের মত ত্যাগ করে চলে গেলেন। ফিজষ্টিফেন, রবার্ট মেণ্টন এবং ক্যামব্রিজের এডওয়ার্ডগ্রিম এরা তিন জন, কারও কারও মতে গ্রিম একলাই শেষ অবধি বেকেটের কাছে ছিলেন এবং যা কিছু সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন সময় সসৈন্যে রেজিনাল্ড ফিজার্স প্রভৃতি সেই ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের ভেতর একজন চীৎকার করে ডাকলো "কোথায় সে বিশ্বাস ঘাতক। টমাস বেকেট কোথায়!" এরকম অপমান জনক সম্ভাষণে কোনও ভদ্রলোকের সাড়া দেওয়া চলে না। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। তখন ফিজার্স এগিয়ে এসে "ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোথায়" বলে হাঁক দিলেন।

বেকেট। (তাদের দিকে নেমে আসতে আসতে) এই তোমাদের সামনেই রয়েছি (একেবারে সামনে এসে) কি করতে চাও তোমরা। আমি তোমাদের তলোয়ারের তোয়াক্কা রাখিনে। যা অন্যায় তা কিছুতেই করবো না।

(তারা সব বেকেটকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে)

জনৈক অমাত্য। যে সব পুরুতদের তাড়িয়েছেন তাদের পুনরায় বহাল করুন। দণ্ডাজ্ঞা তুলে নিন্।

বেকেট। কিছুতেই নয়। তারা সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারেনি।

অমাত্য। তাহলে দেখছি তোমার যম ঘনিয়েছে। (একজন তলোয়ারের উল্টোদিক বেকেটের ঘাড়ে ছোঁয়ালে)

ফিজার্স। (বেকেটের কানে কানে) পালাও, নইলে এখনই মরবে।

তখনও উপায় ছিলো, সন্ধ্যার অন্ধকারে গীর্জ্জার শত শত গম্বুজের যে কোনও একটার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যেতো কিন্তু বেকেট সে ধাতের লোক নন।

বেকেট। বেশ তাই হোক। আমি প্রস্তুতই আছি, আমার রক্তে গীর্জ্জার শক্তি, স্বাধীনতা ফিরে আসুক। ঈশ্বরের নামে আমি তোমাদের প্রত্যেককেই অভিযুক্ত করছি! অভিযুক্ত করছি আর কাউকে আঘাত করেছো বলে নয় স্বয়ং ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আঘাত করেছো।

এই সময় বেকেটকে উদ্ধার করবার জন্য বহুলোক গীর্জ্জার ফটকের কাছে জমায়েৎ হলো। ডি, মরভাইল কিছু সৈন্যের সাহায্যে প্রাণপণে তাদের ঢুকতে বাধা দিতে লাগলেন। উচ্চ কোলাহল শোনা যেতে লাগলো।

বেকেটকে বন্দী করবার জন্য ফিজার্স তার হাত ধরলেন। এতক্ষণ বেকেট স্থির ছিলেন, এইবার তার ধৈর্য্যচ্যুতি হলো। জোর করে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ কেশরী গর্জ্জন করে উঠলেন "খবরদার রেজিনাল্ড —ছুয়োনা বলছি, দূর হও এখান থেকে শয়তান।" লি, ব্রেটন ও ফিজার্স পুনরায় ধবস্তাধবস্তি করে বেকেটকে ট্রেসির পিঠে তুলে দেবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগলো। বেকেট এক ধাক্কায় ট্রেসিকে মাটিতে ফেলেদিয়ে উঠে পড়লেন এবং দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালেন। এডওয়ার্ড গ্রিম তাঁকে সাহায্য করলেন। ফিজার্স পুনরায় তাঁকে চুপে চুপে পালিয়ে যেতে বললেন। বেকেট নড়লেন না। তখন ফিজার্স তলোয়ার দিয়ে তাঁর টুপি উড়িয়ে দিলেন আর ট্রেসি ধূলো ঝেড়ে উঠে সোজা সুজি তার মাথায় চোপ মারলেন। গ্রিম্ প্রতিরোধ করতে অস্ত্র তুললেন কিন্তু আটকাতে পারলেন না। ট্রেসির নিষ্ঠুর তরোয়াল নির্ভুল নেমে এলো, অব্যর্থ বেগে গ্রিমের অস্ত্র দ্বিধা বিভক্ত করে অবশিষ্ট বেগে বেকেটের ললাটে গভীর বিদ্ধ হলো। অন্তিম সম্বল গ্রিম্‌ও অকেজো হয়ে গেলেন। ক্ষতস্থান

থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে ধারায় ধারায় সমস্ত গা ভাসিয়ে দিলে। বেকেট মরণ আলিঙ্গনে গলা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন "যীশু ও তাঁর গীর্জ্জার জন্যে আমি প্রাণ দিচ্ছি।" ট্রেসির দ্বিতীয় আঘাত তাঁর অন্তিম প্রার্থনা শেষ করে দিল, তিনি চার হাত পায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এই অবস্থায় লি. ব্রেটন্ তাঁর মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন। মগজগুলো বেরিয়ে পড়লো। এতক্ষণ ডি. ব্রক দরজায় লোক আটকাচ্ছিল, কাজ ফতে দেখে তার নৃশংসতাবৃত্তি জেগে উঠলো, দরজা থেকে ছুটে এসে সেই মৃত সিংহের ঘাড়ের ওপর পা দিয়ে জঘন্য নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করলে। মগজগুলো তলোয়ারের ডগায় করে ঘরময় ছড়িয়ে দিতে দিতে বল্‌লে "বাস্ শেষ, বিশ্বাস ঘাতকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল, চল, ও আর আমাদের জ্বালাবে না।" নিয়তি এতদূরে এই বিচিত্র পঞ্চাঙ্ক জীবন নাটকের সূত্র টেনে দিলেন। বেকেটের বিশ্বাস ঘাতকতার দণ্ড হলো না; বীর-মৃত্যু-গৌরবে তাঁর মহিমা সহস্র সূর্য্য কিরণে মণ্ডিত হয়ে লোক চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল উদাহরণ স্বরূপ হয়ে রইলো,—ভবিষ্যত ঐতিহাসিকগণ তার গবেষণা করবেন। আমরা এই খানে এই প্রসঙ্গের যবণিকা পতন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ

আলো ও ছায়া

আলো আর ছায়া সদা থাকে এক ঠাঁই।
অথচ দুয়ের মাঝে প্রীতি মাত্র নাই॥
আলো চায় সদা ছায়া করিবারে নাশ।
আলোরে নাশিতে সদা ছায়ার প্রয়াস॥

—বিজ্ঞানী

সর্ব্বানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অমাবস্যা-পূর্ণিমা

সেই তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নিশি, হরপ্রিয়ার নখজ্যোতিঃতে অকস্মাৎ বিমল জ্যোৎস্না কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখন দাসরাজা বহির্গত হইয়া অমাবস্যা রজনীতে পূর্ণমাসি দর্শন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় গুরুদেবকে ধ্যান করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, মহাশয়গণ, একি আশ্চর্য্য! গুরু বাক্যে সত্যই পূর্ণিমা হইল! পণ্ডিতগণ নিজ নিজ ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য পঞ্জিকা পুঁথির আশ্রয় গ্রহণ করা সত্বেও প্রত্যক্ষ দর্শনে জ্যোতিষ দৈব শক্তির নিকট প্রমাদ গণিল। সমগ্র পৃথিবী নিঃশব্দ। জনমানব আকাশে ঐ চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অপূর্ব্ব চিন্তায় স্তম্ভিত। এইরূপে, রজনী অবসান হইল। অদ্ভুত দৈবশক্তির প্রতি মানবের চিন্তা প্রধাবিত হইল।

প্রভাত সমাগমে রাজপ্রাসাদে সর্ব্বানন্দ উপস্থিত হইয়া, মহারাজকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

মহারাজ বলিলেন, "গুরুদেব গত রজনীতে কোথা হইতে কি প্রকারে জ্যোৎস্নার আলো দর্শন করিলাম, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন আছি"।

তখন ঠাকুর সর্ব্বানন্দ, নৃপতিকে বলিলেন, "মহারাজ আমি ঐ সব জানি না, পূর্ণ জানে; শীতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি"।

মহারাজ অবিলম্বে দেবতুল্য গুরুদেবকে বহুমূল্য পারস্য দেশীয় শীতবস্ত্র চরণে প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপর ঠাকুর সর্ব্বানন্দ

স্বগৃহে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মহারাজ, পূর্ণদাসের নিকট গতনিশির অপূর্ব্ব ঘটনাবলী জানিতে পারিলেন।

বিতরণ

রাজধানীর চতুর্দ্দিকে প্রমোদ কাননে নানা বর্ণের বহুবিধ কুসুম-বল্লী প্রস্ফুটিত। সমীরণ ধীরে ধীরে সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে। ভ্রমরগণ মধু অভিলাষী হইয়া গুন্ গুন্ করিয়া উঠিতেছে। সেই আনন্দ কাননে সকলে আনন্দ হিল্লোলে মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অদূরস্থিত সরোবরে তরল তরঙ্গগুলি কল কল রবে খেলিতেছে। জলাশয়ের সম্মুখে শত শত বারাঙ্গনা বাসকরে। হঠাৎ এক বৃদ্ধা কুটিনী সর্ব্বানন্দদেবের দেহাবরণ শীত-বস্ত্রপ্রার্থী। তখন তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া রাজপ্রদত্ত শীত বস্ত্র তাহাকে বিতরণ করিলেন। সেই বেশ্যা অতীব আহ্লাদে নিমগ্না হইয়া স্বগৃহে গমন করিল। তিনিও স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এমন সময় রাজ-বৃত্তিভোগী জনৈক পণ্ডিত ঘটনা দেখিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে মহারাজকে উহা জ্ঞাত করিলেন।

রাজা ইহা জানিতে পারিয়া বারবনিতার গৃহ হইতে গুরু প্রদত্ত বস্ত্র নিজ গৃহে আনিয়া প্রতিহারীকে গুরু গৃহে প্রেরণ করিলেন। প্রতিহারী সর্ব্বানন্দ ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বানন্দ ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিল, মহারাজের বিনীত নিবেদন, "আপনি অবিলম্বে রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন"।

তিনি বলিলেন, "প্রহরী তুমি যাও, আমি যাইতেছি"। ভাগিনেয় ষড়ানন্দকে সঙ্গে করিয়া দুইজন রাজবাড়ীতে গমন করিলেন। উভয়ে অচিরে মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ, গুরুদেবকে বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। "গুরুদেব মৎপ্রদত্ত শীতবস্ত্রখানা কোথায় আছে"?

গুরুদেব বলিলেন, "তোমার প্রদত্ত শীতবস্ত্র আমার ঘরে আছে"।

রাজা পুনরায় বলিলেন তাহা দেখিবার বাসনা হইয়াছে।

গুরুদেব বলিলেন, "ভালকথা। তৎপরই তিনি ষড়ানন্দকে আদেশ

করিলেন, "বাবা, তুমি বাড়ী যাও তথায় তোমার ছোট মাতুলানীর নিকট হতে মহারাজ প্রদত্ত শীত বস্ত্রখানা নিয়া শীঘ্র চলিয়া আসিও"।

ষড়ানন্দ, মাতুলের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৃহে গমন করিল।

চারিদিকে নানা প্রকার ফলের ও মাঝে মাঝে পারিজাত ফুলের গাছ রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় একটি তপোবন। তাহার এক পার্শ্বে দুইটি পর্ণশালা। তন্মধ্যে দুইটি কুলবধূ। ঐ গৃহের দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া ষড়ানন্দ ডাকিতেছেন, "মামীমা, মামীমা, মামা বলিয়াছেন "মহারাজের প্রদত্ত শালখানা দিবার জন্য"। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিয়াও মাতুলানীর কোনও প্রকার সাড়াশব্দ না পাইয়া, বিফল মনোরথ হইয়া যখন রাজবাড়ী অভিমুখে ফিরিতেছে, তখন ভক্তবৎসলা দুর্গতিনাশিনী অর্গলের উপর দিয়া ষড়ানন্দের গাত্রোপরি শালখানা নিক্ষেপ করিলেন। হঠাৎ ষড়ানন্দ ভগবতীর অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সম্পন্না করকমল দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সুললিত ছন্দে দেবীর উদ্দেশ্যে বন্দনা করিতে লাগিলেন,—

ষড়ানন্দ উবাচ

ত্বমীশ্বরীপূর্ণশশাঙ্করূপা মেহারদেশেকিলসংপ্রতিষ্ঠা।
রাজ্ঞঃ সুভাগ্যাতিশয় প্রকাশা ধন্যাঃ সমস্তাপুরবাসিলোকাঃ ॥ ১ ॥
ধ্যাত্বাতু তদ্রূপমহর্নিশংতে।
ব্রহ্মাদিযোগীন্দ্রগণাঃ সুশক্তাঃ।
শক্তাঽশক্তাস্তবরূপমানে।
কিং স্তৌমি নিত্যো জড়ধীর্যতোঽহম্ ॥ ২ ॥
ত্বং বিশ্বমাতা জগতঃ প্রসূতা,
ত্বং বিশ্বকর্ত্রী বহুধৈক ধাত্রী।
ত্বং বিশ্বমূলা করুণা নিধানা,
ত্বং বিশ্বধাতা চ বিধের্বিধাতা ॥ ৩ ॥
ত্বং সর্ব্বকর্ত্রী সকলস্যহর্ত্রী।
ত্বং সর্ব্বভর্ত্তা পরমা পরাত্মা ॥

ত্বং সর্ব্ববুদ্ধিঃ কিলচিত্তশুদ্ধিঃ ।

ত্বং সর্ব্বমুক্তা সকলেষু যুক্তা ॥ ৪ ॥

ষড়ানন্দ এই প্রকার স্তুতি করিতে করিতে রাজ পরিষদে উপনীত হইলেন। তাহার এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা দেখিয়া, ঠাকুর সর্ব্বানন্দ বলিলেন, ইহার শ্রীশ্রীদেবীর করকমল দর্শন হইয়াছে। তখন ষড়ানন্দের নিকট শীতবস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ, এই তোমার বহুমূল্য শীতবস্ত্র নিয়া যাও"। মহারাজ পূর্ব্ববস্ত্র ও নবানীত বস্ত্র, উভয়ে বিন্দুমাত্রও প্রভেদ দেখিতে না পাইয়া, মহাত্মার চরণে শরণাগত হইলেন। তিনি, গুরুর প্রতি অবিশ্বাসী মনে করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া, তাহাকে অভিশাপ দান করিলেন, "অবিমৃষ্যকারী মূর্খ! এখন পর্য্যন্তও সেই মিথ্যা মায়াতে ডুবিয়া রহিয়াছ, এখনও মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না? তোমার পঞ্চদশ পুরুষ আগত হইলে, তোমার বংশলোপ হইবে। মেহারস্থ মদ্‌বংশে দ্বাবিংশতি পুরুষ পুনরায় এই সিদ্ধমহাপীঠে দশমহাবিদ্যা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লুপ্ত হইবে"—এই বলিয়াই স্বগৃহে গমন করিলেন।

সর্ব্বানন্দ পত্নী

প্রিয়তমা পত্নী শান্ত স্বভাবাপন্ন পতির আরক্তলোচনদ্বয় দর্শন করিয়া, ভাবিলেন, আজ প্রভুকে এই প্রকার উগ্রশক্তি সম্পন্ন দেখা যাইতেছে কেন, বোধ হয় রাজবাড়ীতে কোনও দৈবদুর্ঘটনা হইয়াছে। আচ্ছা, যাহা হউক, ষড়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করি, "বাবা ষড়ানন্দ, আজ তোমার মামাকে ক্রোধান্বিত দেখা যায় কেন?"

তদুত্তরে ষড়ানন্দ পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল মাতুলানী বল্লভাদেবীকে বলিলেন। তখন বল্লভাদেবী ষড়ানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি চিরজীবী হও। কল্যানময়ী ভগবতী তোমার মঙ্গল বিধান করুণ।

তৎপর ধীরে ধীরে বল্লভাদেবী স্বীয় পতির সম্মুখে কাতর ও বহু দুঃখিতা হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, "হে হৃদয়নাথ, চির দীনহীনা দাসীর নিবেদন শ্রবণ কর।"

সিদ্ধ মহাপুরুষ ঠাকুর সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "তোমার যাহা বক্তব্য তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পার।"

বল্লভাদেবী বলিলেন, "আমি কি বলিব, বলিবারই বা ক্ষমতা কি আছে, তুমি এ দাসীর প্রতি কৃপাকর, দাসীকে চরণে স্থানদাও। আমি অজ্ঞানা, কি দিয়া, তোমার চরণযুগলপূজা করিব. একমাত্রজানি সতীর পতিই সর্ব্বস্ব। আমি অবলা অশক্তা, তুমি দয়াময় করুণার সাগর, আমাকে এই ভবসংসারার্ণব হইতে মুক্তি দাও।"

"হে হৃদয় স্বামী, যে মন্ত্রের দ্বারা মহাযোগীশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তুমিও ঐ মন্ত্রশক্তিরদ্বারা তোমার একমাত্র সন্তান শিবনাথকে দীক্ষিতকর।" বল্লভাদেবীর এই প্রকার কাতর উক্তিতে দয়া পরবশ হইয়া সিদ্ধপুরুষ তাহাকে এই বরপ্রদান করিলেন, "তুমি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে"। অবিলম্বে তিনি স্বীয়পুত্র শিবনাথকে, স্বামীর চরণতলে ফেলিয়া দিলেন।

সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "বাবা শিবনাথ, অবগাহন করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে আমার সম্মুখে এস।"

শিবনাথ পিতৃচরণে বহুবিধস্তুতি করিলেন। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ বলিলেন "বাবা তোমার সুললিত মধুরছন্দের বন্দনায় পরম প্রীতিলাভ করিলাম, এবং অভীষ্ট দেবীও তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। এস, দীক্ষা নাও"। এই বলিয়া শিবপ্রদত্ত মহামন্ত্র তাহার কর্ণকুহরে তিনবার মৃদু মৃদু স্বরে উচ্চারণ করতঃ তাহার মস্তক বাম হস্তেরদ্বারা স্পর্শ করিলেন। শিবনাথ বলিলেন, "বাবা! আমার হৃদয়যন্ত্রে এই মন্ত্র আপনা আপনি ধ্বনিত হইতেছে এবং সম্মুখে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবীও দণ্ডায়মানা, অন্যান্য দৃশ্য বস্তু বলিবার ভাষা পাইতেছিনা।"

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "বাবা! শিবনাথ! তোমাকে কিছু ভবিষ্যৎবাণী বলিতেছি তাহা যত্ন পূর্ব্বক শ্রবণকর। মন্ত্ররূপা আত্মবিদ্যা মদ্‌বংশে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত যথাক্রমে সাধনা করিলে ষড়দলপদ্মে অবস্থান করতঃ দিব্যজ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইবেন ও সাকাররূপে তাহারই নিকট প্রত্যক্ষ দর্শন দিবেন। তবে মদ্‌বংশে দিব্যাচারে কাজ করিবার

লোক ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া পশ্চাচারাবলম্বী হইবে। তাহাদের মধ্যে চতুর্দ্দশ পুরুষে ভক্তিমার্গানুযায়ী অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির কিয়দংশ লাভ করিবে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ পুরুষ বীরাচার ব্যতিরেকেও আত্মবিদ্যা উপলব্ধি করিবে, এবং দিব্যাচারমার্গানুযায়ী কার্য্য করিয়া সপ্তদশপুরুষে জনৈক ব্যক্তি দেবীর অনুগৃহীত ও জন্মগত দৈববলের দ্বারা দেবতাদিগকে মানুষের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শী হইবে এবং তাহার চেষ্টায় ও সাধনায় এই বংশের অনেক উন্নতি সাধন হইবে। পুনরায় এই মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইবেন এবং সেই দশমহাবিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে মেহারবংশস্থ দ্বাবিংশতি পুরুষে লাভ করতঃ লয় প্রাপ্ত হইবে।

বাবা শিবনাথ এই সংবাদ স্মরণ রাখিও এবং বংশানুক্রমে জানাইয়া দিতে বলিও। ইহা জগদম্বারই প্রদত্ত বর জানিও। সাধনা পদ্ধতি পরে প্রচার করিবার ইচ্ছা রহিল। (সর্ব্বোল্লাস তন্ত্রে সাধনার বিস্তারিত জ্ঞাতব্য)

(ক্রমশঃ) শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী

বিদায়

প্রতিকূল বায়ু ভরে ফেনোময় পথোপরে
তরী যথা চলে ধীরে
পশ্চাতে স্মৃতির রেখা ফেনোপরে রয়।
কম্পিত পতাকা তার চাহে ফিরে বারেবার
সেই প্রিয় দেশ পরে যাহে ছেড়ে যায়—
সেইরূপে অনিচ্ছায় ছাড়ি বন্ধু স্বজনায়
ত্যাজিয়া এ স্নেহ বন্ধ লইগো বিদায়।

শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর

পৌরাণিকী

আনপু ও বাটা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তারপর অনেকদিন গত হয়ে গেছে, ছোটভাই একেশিয়ার উপত্যকায় এসে বাস করছে। সে থাকে একলা, সারাদিন মরুভূমিতে শীকার করে সময় কাটায়, সন্ধেবেলায় এসে যে গাছটার ওপরে ফুলের ভেতর তার আত্মা আছে তারই তলায় শোয়। এর পর সেই উপত্যকায় সে একটা ছোট দুর্গ নিজের হাতে নির্ম্মাণ করলে, এবং তাতে সে ভাল ভাল জিনিষ ভর্ত্তি করে রাখলে ; একদিন সে ঘর থেকে বেরিয়ে নজন দেবতাকে দেখতে পেলে যাঁরা সমস্ত দেখবার জন্য বেরিয়েছিলেন। সেই নজন দেবতা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। একজন তাকে দেখতে পেয়ে বল্লেন, "ওহে বাটা তুমি এখানে একলা রয়েছ তোমার বড় ভায়ের স্ত্রীর জন্য তোমাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছে, তা আমরা জানি। শোন, তার স্ত্রীকে সে মেরে ফেলেছে, এবং তোমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হয়ে গেছে।"

সেই দেবতারা তার জন্য খুব দুঃখিত হলেন রা-হারাখ্‌তি খ্নুমুকে (Khnumu) বল্লেন "বাটার জন্য তুমি একটি মেয়ে কর, সে যেন একলা না থাকে।" খ্নুমু তার সঙ্গে বাস করবার জন্য একটি স্ত্রীলোক তৈরীকরে তাকে দিলেন। সমস্ত দেশের মধ্যে তার মত সুন্দরী আর কেউ ছিলনা। সমস্ত দেবতাদের সৌন্দর্য্যের সার তিল তিল করে তাকে দেওয়া হয়েছিল। সাত ভাই হাথরেরা (Hathor) তাকে দেখতে এল, কিন্তু তারা এক বাক্যে বল্লে এর অপঘাতে মৃত্যু হবে।

বাটার সতর্ক বাণী

বাটা তাকে খুব ভাল বাসত। তাকে নিয়ে সে সেই ঘরেই রইল। সারাদিন মরুভূমিতে শীকার করে সে যা পেত এনে তার

কাছে দিত। একদিন সে বল্লে "তুমি বাইরে বেরিও না। হয়ত সুমুদ্দুর তোমাকে কোন দিন ধরে নিয়ে যাবে, তাহলে আমি তোমায় উদ্ধার করতে পারব না, কারণ আমিও তোমার মত স্ত্রীলোক কেন না আমার আত্মা আমার দেহেতে নাই, ওই একেশিয়া গাছের মাথার ওপর যে ফুলটা আছে তাইতে আছে। আজ যদি কেউ একথা টের পায় তাহলে তার সঙ্গে আমার বিবাদ হবে।" এই রকম করে তার হৃদয়ের অতি গোপন কথা সেই স্ত্রীলোকটির কাছে প্রকাশ করলে।

এরপর বাটা যেমন রোজ শীকার করতে যায় তেমনি বেরোল। এদিকে সেই বালিকা তাদের বাড়ীর পাশে সেই একেশিয়া গাছের তলায় বেড়াতে গেল। এদিকে সুমুদ্দুর তাকে একলা দেখে তার ঢেউ গুলো তার দিকে ছুড়ে দিলে। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে প্রাণপণ ছুটে তার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সুমুদ্দুর তখন একেশিয়াকে বল্লে যদি ওই বালিকাকে আমায় ধরে দিতে পারত বেশ হয়। একেশিয়া তার একটা কেশের গুচ্ছ এনে দিলে। সুমুদ্দুর সেটাকে ইজিপ্টে নিয়ে গেল। এবং ফেরোর রজকেরা যেখানে কাপড় কাচে সেইখানে নিয়ে ফেলে দিলে। সেই জলে কাপড় কাচায় কেশের গন্ধ ফেরোর কাপড়ে লাগল। রাজ বাড়ীর লোকেরা ফেরোর কাপড়ে গন্ধ দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা বল্লে ফেরোর কাপড়ে এমন গন্ধ কোথা থেকে এল।

ফেরোর রজক রাজবাড়ীতে গালা গালি খাওয়ায় মন ভাল ছিল না বলে সুমুদ্দুরের ধারে বেড়াতে এল। সে ঠিক যেখানে সেই কেশগুচ্ছ ছিল, তার উল্টো দিকে বালীর উপর দাঁড়ানয় কেশগুচ্ছ তার নজরে পড়ল। তখন সে একজনকে দিয়ে জল থেকে সেই কেশগুচ্ছ তুলে আনালে। এবং তখন সে বুঝতে পারলে কাপড়ে সেই গন্ধ এই কেশেরই জন্য। তখন সেই কেশ গুচ্ছ নিয়ে গিয়ে ফেরোর কাছে দিলে। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে দেশের যত বিজ্ঞ এবং দৈবজ্ঞদের ডেকে পাঠিয়ে সেই কেশের

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা অনেক ভেবে চিন্তে বল্লেন, "এই কেশগুচ্ছ রা হারাখ্তির এক কন্যার। প্রত্যেক দেবতার সার অংশ এই বালিকার মধ্যে আছে। সেই দেশের এই কন্যা তোমার কর স্বরূপ হবে। প্রত্যেক অপরিচিত দেশে দূত প্রেরণ কর। এবং যারা একেশিয়াতে যাবে তারা যেন অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে যায়"। রাজা শুনে বল্লেন, "অতি উত্তম প্রস্তাবই আমার কাছে করা হয়েছে"। তারপর লোক পাঠান হল। অনেকদিন পরে দূতেরা সমস্ত অচেনা দেশে সেই কন্যার সন্ধান না পেয়ে ফিরে এল, ফিরল না কেবল যারা একেশিয়ায় গিয়েছিল। কারণ বাটা তাদের সকলকে যুদ্ধে নিহত করে। রাজা ভাবলেন যে অন্ততঃ তাদের একজনেরও ত আমাকে সংবাদ দিতে ফিরে আসা উচিৎ ছিল। কোন দুর্ঘটনা ভেবে রাজা আরো অনেক লোক, অশ্বারোহী ও সেনা পাঠালেন। বাটা এবার পরাস্ত হয়ে পলায়ন করায়। রাজার লোকেরা সেই কন্যাকে ধরে নিয়ে গেল।

রাণী

রাজা তাকে খুব ভাল বাসতেন। এবং তাকে খুব উচ্চ সম্মানে ভূষিত করলেন। তার স্বামী বর্ত্তমান বলে তাকে বে করতে পারলেন না। কারণ বিগত যুদ্ধে রাজা তার পরিক্রমের বিশেষ ভাবে পরিচয় পেয়েছেন এবং তার ভয়ে সর্ব্বদা চিন্তান্বিত থাকতেন। একদিন তিনি তাকে তার স্বামীর বিষয় জিজ্ঞেষ করলেন। সেই বালিকা রাজ-প্রদত্ত সম্মানে ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার স্বামীর মৃত্যুর সন্ধান দিয়ে দিলে। সে বল্লে তাদের বাড়ীর পাশে যে একেশিয়া গাছ আছে, সেইটি কেটে ফেল্লেই তার স্বামীর মৃত্যু হবে। রাজা তৎক্ষণাৎ বহু সেপাই শান্ত্রী সেই গাছ কাটবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তারা সেই একেশিয়ার কাছে এসে যে ফুলটাতে বাটার আত্মা ছিল সেই ডালটা কেটে ফেল্লে। কাটতেই বাটা হঠাৎ পড়ে মরে গেল।

এদিকে যেদিন সকালে একেসিয়া গাছ কাটা হল, সেদিন বাটার বড় ভাই আনপু সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকলে একজন তাকে এক গ্লাশ বিয়ার মদ দিতেই তা উৎলে পড়ে গেল। আর একজন আর একটা গ্লাশে করে ফের দিলে কিন্তু তাথেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বেরোতে লাগল; তখন সে তার লাঠী ও জুতা নিয়ে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরুলো। অনেক হাঁটতে হাঁটতে একে-শিয়ার উপত্যকায় এসে উপস্থিত হল সেখানে এসে সে তার ছোট ভায়ের দুর্গ গৃহে প্রবেশ করে দেখলে, একখানা মাদুরের উপর তার ছোট ভায়ের মৃত শরীর পড়ে রয়েছে। তাই দেখে সে কাঁদতে লাগল। তারপর যে একেশিয়া ফুলে তার আত্মা ছিল তার সন্ধানে একেশিয়া গাছের তলায় গেল। এই গাছ তলায় তার ছোট ভাই রোজ সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে থাকত। কিন্তু দেখলে সে গাছ কাটা, তার ফুল-ও নেই। তিন বছর ধরে এ বন সে বন ঘুরে বেড়ালে কিন্তু কোথাও সে ফুল খুজে পেলে না। সকাল থেকে উঠে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সে রোজ খুজে বেড়াত একদিন সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে হঠাৎ তার মনে হল আর একবার সেই গাছ তলাটা খুঁজি। দেখলে এক যায়গায় একটা ছোট বীজ পড়ে রয়েছে, সে সেইটি নিয়ে ঘরে এল। এইটি হল তার ছোট ভায়ের আত্মা। সে একবাটি ঠাণ্ডাজল নিয়ে এসে বীজটি তার মধ্যে রেখে রোজ যেমন বসে থাকে, তেমনি বসে রইল। এদিকে রাত্রে বীজের মধ্যে জল ঢোকাতে আত্মা সজীব হয়ে উঠল। সজীব হতেই বাটার দেহ ধড় মড়িয়ে উঠল। সে তার ভায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু আত্মা রইল বাটিতে। তখন আনপু সেই জলের বাটিটা নিয়ে গিয়ে তার ভায়ের মুখের কাছে ধরল। বাটা তা পান করতেই আত্মা তার দেহে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সে পূর্ব্বে যেমন ছিল ঠিক তেমনি হল। তখন দুজনে পরস্পর আলিঙ্গন করে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল।

বাটা তখন তার বড় ভাইকে বলতে লাগল, 'দেখ আমি সুন্দর ষাঁড়ের আকার ধারণ করব। আমি যে বেঁচেছি এর ইতিহাস কেউ

জানে না। তুমি আমার কাঁধে চড় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেখানে আমার স্ত্রী আছে, সেখানে আমরা পৌছব।

পৃথিবীতে যখন আলো এল বাটা তার বড় ভায়ের কাছে যা বলেছিল ঠিক সেই রকম আকার ধারণ করলে। আনপু তার পরের দিন ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত তার পিঠের উপর চড়ে চল্ল। তারপর দিন তারা রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পরিচয় দিলে। তিনি তাদের দেখে খুব আনন্দিত হলেন। অনেক উপঢৌকন দিয়ে বল্লেন, "এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার"। সারা রাজ্যে উৎসবের সাড়া পড়ে গেল। রাজবাড়ীর লোকে বড় ভাইকে অনেক স্বর্ণ রৌপ্য দান করলে, এবং সে তার গ্রামে ফিরে গেল এবং সেই বৃষকে ফেরো অনেক লোক এবং জিনিষ উপহার দিলেন এবং সেটি তার প্রিয় হল।

এই সকল ঘটনার অনেকদিন পরে সেই বৃষ একদিন রাজা যসার যায়গার প্রবেশ করলে। রাণী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। রাণীকে সম্বোধন করে বল্লে, "দেখ আমি এখন ও বেঁচে আছি"। রাণী বল্লেন, "আপনি কে অনুগ্রহ করে বলুন"। সে বল্লে, "আমি বাটা তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ, তা আমি জানতে পেরেছি। ফেরো যে একেসিয়ার গাছ কেটেছিল, যাতে আমার আত্মা ছিল, তার হেতু হচ্ছ তুমি। কিন্তু দেখ আমি বেঁচেছি এখন আমি এই বৃষের আকারে রয়েছি"। সেই সব কথা শুনে তার স্বামীর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে তার বড় ভয় হল। এবং সে বৃষ সেখান থেকে চলে গেল।

এদিকে রাজা প্রাসাদে বসে আমোদ প্রমোদ করছেন। রাণী তাঁর পাশে বসে। রাজা খুব খুসী হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করছেন। হঠাৎ রাণী রাজাকে সম্বোধন করে বল্লেন, "ভগবানের নাম করে শপথ করে এই কথা বল, 'তুমি যা বলবে আমি তোমার জন্য তা পালন করব'। রাজা তার কথায় সায় দিলেন। তখন রাণী বল্লে, "ওই ষাঁড়টার পিত্তিটা আমি খাব, ওটা কোন কাজের নয়"। কিন্তু

ফেরো বৃষটাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে রাণীর কথায় দুঃখিত হলেন। তারপর দিন যখন পৃথিবীতে আলো এল, রাজা এক মস্ত উৎসবের যোগাড় করতে বল্‌লেন এবং বল্লেন সেই ষাঁড়টাকে আজ বলি দেওয়া হবে। রাজবাড়ীর সব চাইতে বড় যে কসাই রাজা তাকে ওই ষাঁড়টাকে দেবোদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য হুকুম দিলেন। ষাঁড় বলি হবার পর লোকেরা যখন তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসছে, তখন হঠাৎ সে কাঁধ ঝাড়া দিতেই হঠাৎ দুফোঁটা রক্ত রাজবাড়ীর সামনের দরজায় গিয়ে পড়ল। এক ফোঁটা পড়ল সিংদরজার এধারে আর এক ফোঁটা ওধারে। সেই রক্তের ফোঁটা থেকে খুব সুন্দর দীর্ঘ দুটো পার্শী গাছ জন্মাল।

পার্শী গাছের তলায়

একজন গিয়ে রাজাকে খবর দিলে, "মহারাজ কি আশ্চর্য্য আপনার সিংদরজার দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড পার্শী গাছ রাত্রের মধ্যে জন্মেছে"। তাই শুনে রাজা রাজ্যমধ্যে উৎসবের হুকুম দিলেন এবং সেই গাছের তলায় অনেক জিনিষ উৎসর্গ করলেন।

বহুদিন পরে একদিন রাজা নীল রংএর মুকুট পরে, সোনার রথে চড়ে, একদিন পার্শী গাছ দেখতে বেরোলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাণীও ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পেছনে পেছনে চল্লেন। রাজা সেখানে গিয়ে একটি পার্শী গাছের তলায় উপবেশন করলেন। তখন সেই পার্শী গাছ রাণীকে লক্ষ্য করে বল্লে, "দেখ তুমি অতি শঠ, আমি হচ্ছি বাটা তোমার এত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও আমি বেঁচে আছি"। এদিকে রাজা রাণীর উপর খুব খুসী। একদিন রাজার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রাণী ফেরোকে সম্বোধন করে বল্লে, "তুমি ভগবানের নামে শপথ করে এই কথা বল, 'রাণী আমাকে যা বল্‌বে আমি তা পালন করব'।" রাজা সে যা বল্লে তার কথা শুন্‌লেন। তিনি হুকুম দিলেন ওই পার্শী গাছ দুটো কেটে সুন্দর সুন্দর তক্তা তৈরী করতে হবে।

ফেরোর উত্তরাধিকারী

এর পর রাজা খুব দক্ষ ছুতরদের সেই পার্শী গাছ কাটবার জন্য পাঠালেন। রাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কাজ হচ্ছিল তা দেখছিলেন। হঠাৎ একটা কাঠের কুটো রাণীর মুখের মধ্যে গিয়ে ঢুকল রাণী তা গিলে ফেল্‌লেন এবং কিছুদিন পরে তাঁর একটি পুত্র জন্মাল। একজন গিয়ে ফেরোকে খবর দিলে 'মহারাজ আপনার একটি পুত্র হয়েছে'। রাজা শুনে ছেলেকে নিয়ে আসতে বল্লেন, এবং তার জন্য ধাত্রী ও কতকগুলি চাকর নিয়োজিত করে দিলেন। সারা দেশময় উৎসবের সাড়া পড়ে গেল,—

এই রকমে অনেকদিন গত হলে ফেরো তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। সেই পুত্র উত্তরাধিকারী হয়ে বহুকাল কাটাবার পর, রাজা একদিন স্বর্গে আরোহন করলেন। তখন সেই উত্তরাধিকারী বল্লেন "সমস্ত বড় বড় জমিদারদের ডেকে পাঠাও, আমি তাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করব।" সমস্ত রাজ পার্ষদেরা একত্র হলে রাণীকেও সেখানে নিয়ে আসা হল। তিনি তাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বলে বিচার করলেন। এবং সমস্ত পার্ষদেরা তাতে মত দিলে। তারপর তার বড় ভাইকে ডেকে পাঠান হল। তিনি তাকে তার সমস্ত রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। এই রকমে বাটা তিরিশবর্ষ ইজিপ্ট শাসন করার পর স্বর্গে গেলেন। তাঁর সমাধির দিন তাঁর বড় ভাই তার স্থান অধিকার করলেন।

(এই কাগজের মালিক এবং লেখক এলেনা। যে কেউ এই কাগজের বিরুদ্ধে বলবে তাহুতি তাকে শাসন করবেন)

শ্রীপ্রভাতী দেবী

রাগ-মালা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সপ্তস্বর

শ্রুতি হইতে সপ্তস্বরের জন্ম হইয়াছে। স্বর সাতটি—খরজ, (ষড়জ) ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ, ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলা যায়। সচরাচর কথোপকথন সময়ে ইহাদের কেবল আদি অক্ষর স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি মাত্র গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে উক্ত স্বর সাতটি পশুগণের ধ্বনি হইতে গৃহীত হইয়াছে;—যথা ময়ূর হইতে ষড়জ, বৃষভ হইতে ঋষভ, ছাগ হইতে গান্ধার, শৃগাল হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত, হস্তী হইতে নিষাদ; কিন্তু ইহা কাল্পনিক বলিয়া অনুমান হয়, তবে মনস্বিগণের বাক্য অপ্রত্যয় করিতেও পারিনা। সুর যতই উচ্চ হইবে ততই নিম্নের প্রত্যেক সুরের সহিত মিলিত হইয়া সাতটির অধিক হইবেনা। যেমন অঙ্কসংখ্যা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু নয়ের অধিক দশসংখ্যা করিতে হইলে পুনরায় একের সহিত বিন্দু সংযোগ করিতে হয়, ইহাও সেই প্রকার সাতটির অধিক সুর করিতে গেলে পুনরায় সেই নীচের ষড়জাদির সহিত ক্রমে সংযোগ হইয়া পড়ে; উক্ত সাতটি সুরের ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম বা আরোহণ এবং নিম্নগতির নাম বিলোম বা অবরোহণ। সচরাচর কথোপকথন কালে ঊর্দ্ধগতিকে আরোহী এবং নিম্নগতিকে অবরোহী হিন্দিভাষাতে ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত সপ্তসুর হইতে পাঁচটি স্বর বিকৃত হইয়া দ্বাদশটি সুর গৃহীত হইয়াছে।

যথা স্বাভাবিক প্রাকৃত স্বর—————স ঋ গ ম প ধ নি

△ △ ◣ △ △

স্বাভাবিক হইতে গৃহীত বিকৃত স্বর—————ঋ গ ম ধ নি।

ষড়্জোঽচলঃ পঞ্চমশ্চ ঋষভশ্চলতি স্বরঃ।
গান্ধারো মধ্যমশ্চার্থ নিষাদো ধৈবতশ্চলঃ॥

(সঙ্গীত-সময়সার এবং সঙ্গীত-রত্নাকর)

তানাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবস্ত্যমী।
অগ্নিষ্টোমিকতানে তু শিবংস্তত্বা শিবো ভবেৎ॥

(সঙ্গীত রত্নাকর)

স ঋ গ ম প ধ নীতি ষড়্জগ্রামস্য মূর্চ্ছনা।
ম প ধ নি স ঋ গেতি মধ্যম গ্রাম মূর্চ্ছনা।
প ধ নি স ঋ গ মেতি গান্ধার গ্রাম মূর্চ্ছনা॥

(সঙ্গীত রত্নাকর)

রাগ এবং রাগিনীকে অধিক মনোহর করিবার জন্য, গমক, কম্পন, আশ, মীঢ়, মূর্চ্ছনা, গিটকারী, প্রভৃতি গুণিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রেও উক্ত বিষয় সকল বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। গিটকারী দুই প্রকার,——সাধারণ এবং সগমক (কোনও স্বর বিশেষের পূর্ব্বে কিংবা পরে অন্য স্বরের সামান্য উচ্চারণ)। নানা জাতীয় স্বরকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাগ ও রাগিনীর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। রাগরাগিণীর দ্বারা মনে আনন্দ উৎপাদন হয়, অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন হয়। রাগ, রঞ্জ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। রঞ্জ ধাতুর অর্থ রঞ্জন অথবা চিত্তবিনোদন। স্বর বিন্যাস দ্বারা যে প্রকার মনে আনন্দ হয়, সেই প্রকারে স্বর বিন্যাস দ্বারা রাগ এবং রাগিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রমাণ যথা—

যস্য শ্রবণ মাত্রেণ রঞ্জতে সকলাঃ প্রজাঃ।
সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগ ইতি স্মৃতঃ॥

(সঙ্গীত সময়সার)

প্রাকৃত স্বর বিবেক

ঋষভকে যদি স্বরগ্রাম করা যায় (অর্থাৎ "ঋ"কে যদি "স" করা যায়) তাহা হইলে নিম্ন লিখিত বিকৃত স্বরের আবশ্যক যথা—

ঋষভ স্থর, গান্ধার ঋষভ, কড়ি মধ্যম গান্ধার, পঞ্চম মধ্যম, ধৈবত পঞ্চম, নিষাদ ধৈবত, কোমল ঋষভ নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম এবং কোমল ঋষভ, এই দুইটি বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে।

গান্ধারকে যদ্যপি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইবে যথা—

গান্ধার স্থর, কড়ি মধ্যম ঋষভ, কোমল ধৈবত গান্ধার, ধৈবত মধ্যম, নিষাদ-পঞ্চম, কোমল ঋষভ ধৈবত, কোমল গান্ধার নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, কোমল ঋষভ কোমল গান্ধার উক্ত চারিটি বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে।

মধ্যমকে যদি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে এইরূপ বিকৃত স্বরের আবশ্যক হইবে—যথা—

মধ্যম স্থর, পঞ্চম ঋষভ, ধৈবত গান্ধার, কোমল নিষাদ মধ্যম, স্থর পঞ্চম, ঋষভ ধৈবত, গান্ধার নিষাদ, ইহাতে কোমল নিষাদ মাত্র বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে।

পঞ্চমকে যদি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে এই প্রকার স্বরের আবশ্যক যথা—পঞ্চম স্থর, ধৈবত ঋষভ, নিষাদ গান্ধার, স্থর মধ্যম, ঋষভ পঞ্চম, গান্ধার ধৈবত, কড়ি মধ্যম নিষাদ। ইহাতে কড়ি মধ্যম মাত্র যোগ করিয়া স্বরগ্রাম স্থির হইবে। ধৈবতকে যদি স্বরগ্রাম করা যায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত স্বরগুলির আবশ্যক হইবে যথা—

ধৈবত স্থর, নিষাদ ঋষভ, কোমল ঋষভ গান্ধার, ঋষভ মধ্যম, গান্ধার পঞ্চম, কড়ি মধ্যম ধৈবত, কোমল ধৈবত নিষাদ। ইহাতে কোমল ঋষভ, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত এই তিনটি বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে।

নিষাদকে যদি স্বরগ্রাম করা যায়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বনে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে যথা—

নিষাদ স্থর, কোমল ঋষভ ঋষভ, কোমল গান্ধার গান্ধার, গান্ধার মধ্যম, কড়ি মধ্যম পঞ্চম, কোমল ধৈবত ধৈবত, কোমল নিষাদ নিষাদ।

ইহাতে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম, কোমল ধৈবত, কোমল নিষাদ এই পাঁচটি বিকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে।

(ইতি প্রাকৃত-স্বর বিবেক)

(সঙ্গীত রত্নাকর)

বিকৃত স্বরের স্বরগ্রাম

কোমল ঋষভকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে ;—যথা—

কোমল ঋষভ, সুর ; কোমল গান্ধার, ঋষভ ; মধ্যম, গান্ধার ; কড়ি মধ্যম, মধ্যম ; কোমল ধৈবত, পঞ্চম ; কোমল নিষাদ, ধৈবত ; সুর, নিষাদ। ইহাতে মধ্যম ও খরজ এই দুইটি প্রাকৃত সুর লাগিবে।

কোমল গান্ধারকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত ও প্রাকৃত স্বরযোগে স্বরগ্রাম স্থির করিতে হইবে ;—যথা,—

কোমল গান্ধার, সুর ; মধ্যম, ঋষভ ; পঞ্চম, গান্ধার ; কোমল ধৈবত, মধ্যম ; কোমল নিষাদ, পঞ্চম ; সুর ধৈবত ; ঋষভ, নিষাদ। ইহাতে প্রাকৃত সুর মধ্যম, পঞ্চম, খরজ ও ঋষভ এই চারিটি মাত্র লাগিবে।

কড়ি মধ্যমকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে স্বর গ্রাম স্থির হইবে যথা—

কড়ি মধ্যম, সুর ; কোমল ধৈবত, ঋষভ ; কোমল নিষাদ, গান্ধার ; নিষাদ,—মধ্যম ; কোমল ঋষভ, পঞ্চম ; কোমল গান্ধার, ধৈবত ; মধ্যম, নিষাদ। ইহাতে মধ্যম এবং নিষাদ এই দুইটি মাত্র প্রাকৃত স্বর লাগিবে। কোমল ধৈবতকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে ; যথা—

কোমল ধৈবত, সুর ; কোমল নিষাদ, ঋষভ ; সুর, গান্ধার ; কোমল ঋষভ, মধ্যম ; কোমল গান্ধার, পঞ্চম ; মধ্যম, ধৈবত ; পঞ্চম, নিষাদ। ইহাতে প্রাকৃত স্বর খরজ, মধ্যম ও পঞ্চম এই তিনটি মাত্র লাগিবে।

কোমল নিষাদকে স্বরগ্রাম করিলে বিকৃত এবং প্রাকৃত স্বর যোগে স্বরগ্রাম স্থির হইবে ; যথা—

কোমল নিষাদ, স্থর ; ঋষভ ; ঋষভ, গান্ধার ; কোমল গান্ধার, মধ্যম ; মধ্যম, পঞ্চম ; পঞ্চম, ধৈবত ; ধৈবত, নিষাদ। ইহাতে প্রাকৃত সুর খরজ, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম, এবং ধৈবত এই পাঁচটি লাগিবে।

(ইতি বিকৃতি স্বর বিবেক।)

(সঙ্গীত সময় সার)

উক্ত স্বর বিবেকের বিষয় ইংরাজী সঙ্গীত অধ্যাপক হ্যামিলটন সাহেব কৃত পিয়ানো শিক্ষা বিধায়কগ্রন্থের সাত পৃষ্ঠার সহিত ঐক্য আছে। আমাদের মতে এবং ইংরাজী মতে স্বর বিবেক প্রণালীর শ্রুতির অনুরোধে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এবং ইংরাজী মতে স্পষ্ট লেখা আছে ষড়জ ব্যতীত তদন্ত ঋষভাদিকে স্বরগ্রাম করিতে গেলে বিকৃত স্বরের অবশ্যই প্রয়োজন হইয়া থাকে ; যগুপি এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ হয়, তবে সেতার অথবা পিয়ানো যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে ; সি অর্থাৎ ষড়জ ব্যতীত, ডি অর্থাৎ ঋষভ ইত্যাদিকে স্বরগ্রাম করিলে কোমল স্বর ব্যতীত কথনই স্বরগ্রাম স্থির হইবে না। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে সপ্ত সুরের মধ্যে মধ্যে শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ষড়জ, ঋষভ, মধ্যম এবং পঞ্চম, পঞ্চম ও ধৈবত ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চারিটি করিয়া শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; ঋষভ ও গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তিনটি করিয়া শ্রুতি আছে, গান্ধার ও মধ্যম, নিষাদ ও খরজ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দুইটি করিয়া শ্রুতি পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত গান্ধার এবং নিষাদ দুইটি সুরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থানদ্বয় অর্দ্ধসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরাজী সঙ্গীত গ্রন্থকারগণ হ্যামিলটন এবং ফ্রান্সিস্ সাহেবও তৃতীয় সুর গান্ধার এবং সপ্তম সুর নিষাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থানদ্বয়কে "সেমিটোন" অর্থাৎ অর্দ্ধসুর স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন, সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তা বার্ণি সাহেব মহোদয় বলেন যে চীন দেশেও এইরূপ

ব্যবহার হইয়া থাকে। সপ্ত সুরের স্বাভাবিক শুদ্ধভাবে অবস্থিতি করার নাম প্রাকৃত ভাব; এই সপ্ত সুরের মধ্যে ষড়জ ও পঞ্চম ব্যতীত অপর গুলিকে কোমল এবং তীব্র করা যায়। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত এবং নিষাদকে কোমল করা যায়; ইহাদের তীব্রভাবের প্রয়োজন হয় না; যে হেতু ঋসভকে তীব্রাকারে পরিণত করিলে যে ফল হয়, গান্ধারকে কোমল করিলেও সেই ফল দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত-রত্নাকর

দেব-জন্ম

কার এ মূরতি রাজেন্দ্র সুঠাম ?
উদাসীর বেশ মন অভিরাম
ত্রস্ত লাজ ভয়ে পদানত কাম
হেরি রূপ স্মরজিত।

জন্ম জরা তাপ, মৃত্যু ভীতি হরে
অরুণ শোনিমা স্ফুরিত অধরে
প্রাণময়ী বাণী অমৃত নিঃসরে
বেণু বীণা বিনিন্দিত।

চরণ চারুতা দিব কার তুল ?
প্রভাতের নব বিকশিত ফুল
গোলাপ করবী পারুল রাতুল
হৃদয় রুধির মাখা !

নীল জলধির মহিমা গভীর,
নব নলিনীর সুষমা মদির

উজ্জল গরিমা উষার রবির,
সে নয়ন কিসে আঁকা ?

কলঙ্কী শশাঙ্ক ত্যজ অভিমান,
ক্ষুদ্র পঙ্কজিনী, কত তোর মান ?
সে মুখ মাধুরী কাহার সমান ?
দেখে যা জড়তা ঘুচে।

কাল স্রোতে চির অটুট অক্ষয়,
চির অমলিন, স্থির জ্যোতির্ম্ময়,
কটাক্ষ পরশি চিত্ত করে জয়,
কিছুতে না যায় মুছে।

সেই পুণ্যাতিথি এসেছে আবার,
সে ধন্য মুহূর্ত্ত সমাগমে যার,
অবিনাশী রূপ হৃদি দেবতার
জাগে নব জ্যোতির্ম্ময়।

চির নিপীড়িত দুঃখার্ত্তের স্বর
কাঁদায়েছে আজ করুণ অন্তর,
মর হিতে ধরি নর কলেবর
অবতীর্ণ মৃত্যুঞ্জয়।

উপেক্ষিয়া ব্রহ্ম সমাধির সুখ,
এসেছে মুছাতে অশ্রুম্লান মুখ,
জুড়া মা ভুবন, পিপাসিত বুক,
দেবশিশু করি কোলে।

দিনেকের তরে রে দুস্থ হৃদয়,
ভুলি রোগ শোক দৈন্য মৃত্যুভয়,
মাতি মহোৎসবে গাহ জয় জয়,
শুভ শঙ্খ কল রোলে।

ভক্ত ভাগ্যবান্ হৃদয়ের ভূপে,
চিনেছ যে এই নরেন্দ্র স্বরূপে,
অভিষেক করি লহ চুপে চুপে
হৃদয়ের কোকনদে।

সমাদরে দিয়ে রাজার আসন,
প্রেমাশ্রুজাহ্নবী সলিল সিঞ্চণ,
ত্যাগ বিল্বদল, শ্রদ্ধার চন্দন,
অর্ঘ্য দাও দেব পদে।

জয় জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, আচার্য্য মহান্
জয় কর্ম্মবীর, পুরুষ প্রধান,
ভক্ত চূড়ামণি, গুরু গত প্রাণ,
বন্ধু সহৃদয় !

জয় অগণন গুণ রত্নাকর,
জয় প্রীতি সিন্ধু ইন্দু উজাগর !
পতিত উদ্ধারে প্রাণান্ত সমর
জয়ী বীরেশ্বর জয় !

জীব কিংবা শিব না চাই জানিতে,
মানব জনম সফল মানিতে
সাধ যায় শুধু হৃদয়ে আনিতে
ওই মহিমার ছবি !

কৃতাঞ্জলি পুটে যাচে তাই দাস
কৃপা কণা দানে করো না নিরাশ,
হে অজ্ঞান-অন্ধ-তিমির-বিনাস,
চির গরিমার রবি !

শ্রীনীহারিকা দেবী

বর্ষা আগমণী

আজিকে শুধিব যতঋণ আছে, মেঘের গরজে পরাণ পেয়েছে ছুটি ;
গোপনে গোপনে জুটেছিল প্রাণে যাহা কিছু, আজি ছড়াইব মুঠি মুঠি !
ওগো নীল মেঘ পূবন বাতাস ! অয়ি ঘন ধারা ওগো কদম্ব কেয়া,
তোমাদের কাছে বিলাইব মোরে নিঃশেষে আজি আকাশে গরজে দেয়া !

দেয়া গরজন করে আবাহন ? মেঘপুরী হতে নামে কোন মহারাণী ?
কার আঁচলের কাঁপন লাগিয়া আকাশ বাতাস পাগল হল না জানি !
ধানের ক্ষেতের শ্যামল উজল শির কার পায়ে নুয়ে পড়ে বারবার,
ধীরে খুলি মুখ হেসে হেসে চায় সন্ধ্যামণি সে সন্ধান পেল কার ?

কালও যার মুখে কথা নাহি ছিল—এক পাশে টানি তনুখানি আপনারি
সরমে চলেছে অতি কুন্ঠিতা—আজ সেই জনা চপলা মুখরা নারী !
আজ তার পায়ে রণিছে নূপুর বাহুতে কাঁকন শত মুখে কলরতা,
দুই কূল হায় হার মেনে যায় বাঁধিতে পারে না ডগমগ দেহলতা !

এরা কোথা ছিল দেখিনি তো কলি, পাতার আড়ালে লুকায়ে আছিল বুঝি,
আজিকে সহসা উঠেছে শিহরি—শত আঁখি খোলে কদম্ব বনরাজি,
কাঁটার বাঁধনে রেখেছিল বাঁধি কালিকে যাহারে ঘন পল্লব ছায়া,
আজি সে বাঁধন টুটিয়া আসিল মদির বাসিতা শুভ্র হসিতা কেয়া !

মেঘ অলকার আসন ত্যজিয়া মর্ত্ত্যে নেমেছে দয়াময়ী মহারাণী,
টুটে বন্দীর বন্ধন পাশ মূকের কণ্ঠে ধ্বনিছে আরতি বাণী ;
দাদুরী মুখরা মর্ম্মরে বন ঝরে ঝঝ'র বাদল দিনের ধারা,
কবির কণ্ঠ গাহে সঙ্গীত ইঙ্গিত করে খুলিল প্রাণের কারা !

এসেছ নিখিল জীবন উৎসা ! কালো মেঘে তব পুলক ঘনায়ে আনে
বজ্র চমক সোণার কাঠিটি জাগায়ে তুলিছে অলস অবশ প্রাণে ;
নদীর বুকের উজ্জল নীলা প্রলেপ লেপিছে তাপিত হিয়ার পরে,
বন মর্ম্মর বর্ষণ গান বাজে একতান সারাটি ভুবন ভরে।

সারা ভুবনের সাথে আজি আমি কণ্ঠ মিলায়ে বন্দনা তব গাহি,
পাগল পবনে অঙ্গ এলায়ে তৃষ্ণাকুল আঁখি মেঘরথ পানে চাহি ;
ওই গরজনি চক্রের ধ্বনি ঝক্ ঝকি উঠে মুকুটের মণিমালা !
অঝোর ঝরণ ঝরিছে করুণা জয় তব জয় ! জুড়াও ভুবন জ্বালা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

পুস্তক-পরিচয়

১। কোতুলপুর হিতসাধন সমিতি কার্য্য বিবরণী (১৩৩২-৩৩) পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে তাঁহারা কতকগুলি দরিদ্র ও নিঃসহায় রোগী ও ছাত্রদের সাহায্য করিতেছেন।

২। শ্যামলা তাল (আলমোড়া) দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য বিবরণীতে (১৯২৬) প্রকাশ যে ১৯১৪ হইতে ১৯২৬এর মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানে ৬৪৮৮ জন রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং তাহার মধ্যে ৬১ জন ইন-ডোর রোগী।

৩। আগ্রা হইতে রামকৃষ্ণ নামক ইংরাজী কাগজ বাহির হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে উহাতে পড়িবার কিছুই নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা উহার উন্নতি কামনা করি।

৪। উপাসনা পুনরায় বাহির হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। প্রবন্ধগুলি (বিশেষত সাহিত্য বিষয়ক) সবই উপাদেয়। ইহার নব প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীযুক্ত মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে, সি, আই, ই এবং সম্পাদক শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

৫। উদ্দীপনা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তিকা, কবিতাগুলি মন্দ নয়। প্রকাশক শ্রীমোহিনীমোহন ঘোষ।

৬। পথিক—৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য সম্প্রদায় পরিচালিত মাসিক। সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। বার্ষিক পাথেয় ৩৲ টাকা।

সংঘ-বার্ত্তা

১। আমাদের দুর্ভিক্ষ কার্য্য বাঁকুড়ার তিনটি কেন্দ্র হইতে চলিতেছে—বড়যোড়া, বাহারকুলিয়া এবং কোয়ালপাড়া। ১২০ খানি গ্রামে ১২৭৫ জন দুস্থকে সাহায্য করা হইতেছে। ধান না কাটা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য চালাইতে হইবে। ইদানীং বালুরঘাটেও একটি কেন্দ্র খুলা হইয়াছে।

২। স্বামী সর্ব্বানন্দ মহিশূর নগরে এক সিয়া মসজিদে ইসলাম ও বেদান্ত সম্বন্ধে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর মুসলমান মসজিদে ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় সকলেই মুগ্ধ।

৩। বেলুড় রামকৃষ্ণ-মিশন শ্রমিক বিদ্যালয়ে তাঁতের কাজ, সূতা কাটা, রং করা, কাপড় ছাপান, কাঠের ও মোজার কাজ, পুস্তক বাঁধাই এবং নিম্ন প্রাথমিক লেখা পড়া প্রায় ২৩ জন গরীব ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাদের আহার ও বাসের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা করেন। বর্ত্তমানে ছাত্রাবাস একটি ভাড়াটিয়া ভাঙ্গা বাড়িতে রাখা হইয়াছে। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের উন্নতি কল্পে প্রায় ১৫০০০ টাকার প্রয়োজন। যাঁহারা এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিবেন তাঁহারা বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্টের নিকট পাঠাইলে বাধিত হইব।

৪। সিংহলের ত্রিন্‌কোমালি নগরে রামকৃষ্ণ-মিশন হিন্দু স্কুল স্থানীয় গভর্ণর কর্ত্তৃক খোলা হইয়াছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দ এবং অবিনাশানন্দ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর, গভর্ণর সিংহলে রামকৃষ্ণ-মিশনের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে প্রশংসা করেন।

কান্দী ও কলম্বো বিবেকানন্দ সোসাইটি হলেও উক্ত স্বামিদ্বয় শ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী সম্বন্ধে উপদেশ করেন।

৫। মান্দ্রাজ মলয়পুরের অগ্নিদাহ কার্য্যে স্থানীয় মিশন হইতে ১৯৭ খানি গৃহ নির্ম্মান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬। সান্‌ফ্রানসিস্কো হইতে স্বামী মাধবানন্দ প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের জন্য মাসিক ১০০্ টাকা করিয়া দান করায়, ডায়মণ্ড হার-বারের অন্তঃপাতী মানকুণ্ডু গ্রামে, কাঁথির নিকট বেলদা গ্রামে, বাকুড়ার অন্তঃপাতী বনমুখা গ্রামে এবং শ্রীহট্টের নিকট হবিগঞ্জে চারিটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং শীঘ্রই ঢাকা জেলায় আর একটি ঐরূপ বিদ্যালয় খোলা হইবে।

জন সাধারণের সাহায্য পাইলে আমরা আরও ঐরূপ বিদ্যালয় খুলিতে ইচ্ছুক।

সারদা

নমস্তে অভয়া বরদা বিজয়া
মোক্ষদা-জ্ঞানদা দেবী সারদে !
নমস্তে অমিতা শক্তি-জ্ঞানাতীতা
অব্যক্ত-অরূপা যোগি-জন-ধ্যানাতীতা
ভক্ত-চিত্ত-হরা বিমলা দেহাতীতা—
অব্যয়-সনাতনী প্রকৃতি সারদে !
নমস্তে ব্যক্তা আকাশ-রূপিণী
অনন্ত কল্যাণী আনন্দ-দায়িনী
জ্যোতিঃ প্রধানা, শক্তি সনাতনী—
বিন্দু নিবাসিনী ইন্দুময়ী সারদে !
নমস্তে মহাশক্তি অনুভূতি রূপিণী
আশা-প্রীতি-তৃষা-লজ্জানুরাগিণী
মদন-মাদন-চেতনা-বিধায়িনী—
কনক-বরণী-উষা অরুণা সারদে !
নমস্তে অমিয়া অমলা কমলা
নিত্য-কুশলা, সকলা শশিকলা
বিপুল-পুলক-ময়ী আলোক উজ্জ্বলা—
মানস-তামস-নাশিনী সারদে !
নমস্তে ব্রহ্মাণী-বৈষ্ণবী-শিবানী
গীতা-গায়ত্রী সাবিত্রী ভবানী
দৃশ্য রূপিণী বিশ্ব-ব্যাপিণী—
ত্রিগুণ-রূপিণী মহামায়া সারদে !

নমস্তে চিন্ময়ী চিতা চিন্তামণি
তন্ত্র মন্ত্রময়ী যন্ত্রনিবাসিনী
কুমারী-যুবতী-বৃদ্ধা-রূপধারিণী—
অনাদি-অশেষ-স্থিতি গতি সারদে !
নমস্তে যোগমায়া শিবে দাক্ষায়ণী
দীক্ষা-দায়িনী দেবী নারায়ণী
কল্প-লতিকা তত্ত্ব-প্রদায়িণী—
জনন-মরণ-বিনাশিনী সারদে !
নমস্তে ভবানী ইন্দ্রাণী উর্ব্বশী
গলিত-কুন্তলা কালী এলোকেশী
অট্টহাসিনী খট্টাঙ্গ-ধারিণী—
দৈত্য-বিমর্দ্দিনী মহাকালী সারদে !
নমস্তে চণ্ডিকা রক্তবীজ-শোষিণী
চামুণ্ডা প্রচণ্ডিকা চণ্ড-মুণ্ড নাশিনী
বিশ্ব-স্তম্ভিনী জৃম্ভণ-কারিণী—
আদিত্য-গণ-বন্দিতা জননী সারদে !
নমস্তে দুর্গা দুর্গম সংসারে
ত্রিলোক-পূজিতা-শক্তি কংসারে
উর্ণা অর্পণা উমা চরাচরে—
নিখিল তেজ ঘন ঘোরা সারদে !
নমস্তে মহালক্ষ্মী পদ্মিনী ধনদা
জয়শ্রী-বাঞ্ছিত-ললিত কামদা
মতি মুক্তি-প্রদা সুন্দরী শ্রীপদা—
ধরণী ধারণি তারিণী সারদে !
নমস্তে সরস্বতী বেদ-বীণা ধারিণী
আদ্য-ভমা সদা জাড্য বিনাশিনী
পরমা প্রকৃতি মহাবিদ্যা দায়িনী—
বিরজা বৈষ্ণবী যমুনা সারদে !

নমস্তে কৌশল্যা কোশল জননী
পাতকী-পাবনী শক্তি, পাষাণ মোচনী
পবিত্রা সুমিত্রা রাম সুখ পরায়ণী—
ভরত-জননী কৈকেয়ী সারদে !

নমস্তে সতীশক্তি মুক্তি বিকাশিনী
বাল্মিকী-প্রতিভা প্রকাশ কারিণী
মহাবীর-নন্দিতা-রাবণ-নিবারিণী—
রঘুবীর গতপ্রাণা-সীতা সারদে !

নমস্তে বেদগম্য শ্রুতি-স্মৃতি-গতমতি
ভরত আশ্রিতা শ্রুতকীর্ত্তি পরারতি—
নির্ম্মলা উর্ম্মিলা ব্রতমতী সতী
রামানুজ-ভাবময়ী সরযূ সারদে !

নমস্তে যোগমায়া দেবী কাত্যায়ণী—
ব্রজ-গোপী-পূজিতা-বাঞ্ছিত দায়িনী
কৃষ্ণ-প্রদায়িণী তৃষ্ণা বিলাসিনী—
কৃষ্ণ সহোদরা দেবী সারদে !

ব্রজে যশোদা তুমি জননী রূপিণী
অনন্ত-বাৎসল্য-সিন্ধু স্বরূপিণী
গোপ গোপাল পালন কারিণী—
সর্ব্ব রস ধারা সুধা সারদে !

শ্যাম-সোহাগিনী, কানু অনুরাগিণী—
নন্দ-নন্দন-আনন্দ প্রদায়িনী
নিষ্কাম-ভাবময়ী, কৃষ্ণপ্রেম দায়িনী
গোপিকা-হ্লাদিকা রাধিকা সারদে !

মূলাধার-বাসিনী-কুল কুণ্ডলিনী
সন্তাপ তারিণী পাতক বিনাশিনী
ভীম-ভয়ানক-নরক ঘাতিনী—
শ্রীকৃষ্ণ-শক্তিময়ী রুক্মিণী সারদে !

কুরুক্ষেত্রে কালরাত্রি বিষ্ণু-বক্ষঃ বাসিনী
ত্রিকাল ব্যাপিনী ত্রিতাপ বিনাশিনী
বৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়া কর্ম্ম পাশ নাশিনী—
কৃষ্ণ-হৃদি বিলাসিনী গীতা সারদে।

রামকৃষ্ণ গতপ্রাণা রামকৃষ্ণ ভাবময়ী
রামকৃষ্ণ রূপা-সক্তা, রামকৃষ্ণ ভক্তিময়ী
রামকৃষ্ণ তেজ যুক্তা, রামকৃষ্ণ নামময়ী
ষোড়শী মহাবিদ্যা দেবী সারদে।

সমস্ত নিয়েছ মা মুক্তি দায়িনী
শক্তি দাও মা প্রাণে মহাশক্তি স্বরূপিণী
ভক্তি দাও মা হৃদে কল্যাণ কারিণী —
সতত পূজিতে তব শ্রীপদ সারদে।

দুঃখ বিনাশ, মাগো দুঃখ বিনাশিনী
দারিদ্র্য দুঃখ হর, সম্পদ দায়িনী
বৈতরণী তরঙ্গ গোষ্পদ কারিণী
ব্রহ্ম বিষ্ণু-পদ, প্রদায়িনী সারদে।

অর্থ দাও মা পরমার্থ দায়িনী —
বাসনা পূর্ণ কর শবাসন ধারিণী
মম চিদাকাশে বিকাশ নীল কমলিনী
আশুতোষ সন্তোষ কারিণী সারদে।

সর্ব্বভূতে বিরাজিতা তুমি মা কেবলা—
কে বলে মা তোমায় দুর্ব্বলা-অবলা—
জনম সূতিকাগারে মরণ জলধি পারে—
কমল-কোমলাবালা-সরলা সারদে!

ভৃগু পদ লাঞ্ছিত বক্ষঃ বিলাসিনী
পশুপতি বাঞ্ছিত রক্ষঃ বিনাসিনী
যোগীন্দ্র আরাধ্যা সতী সনাতনী
মুণীন্দ্র পূজিতা তুমি মা সারদে!

শ্রীমুণীন্দ্রমোহন চাকী

কথা-প্রসঙ্গে

বিজ্ঞান যেমন পাহাড় সমুদ্রের ব্যবধান ভেঙ্গে একটা—মানুষের সমাজ গড়বার চেষ্টা করছে, তেমনি ইউরোপী আর্টের মধ্য দিয়ে যে বর্ত্তমানে একটা বিশ্ব সামাজিকতার সৃষ্টি হচ্চে এ ঋণ স্বীকার সকল জাতই করতে বাধ্য। আজ যে বাংলায় বসে জাপানী, চৈনিক ও ইউরোপী আর্টের আস্বাদ করছি তার হেতু ইউরোপী উদারতা। প্রাচীন ইউরোপ ও আসিয়ায় প্রত্যেক মন্দির ও প্রাসাদকে কেন্দ্র করে শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষিত কারিগর সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল; কিন্তু সে রেখা, বর্ণ, শব্দ ও সুরে যে চিত্র, কাব্য, মূর্ত্তি, নাট্য ও গীতি, সৃষ্টি হয়েছিল তা কেবল জাতীয়তার দৃষ্টান্ত; সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটা ব্যাপক সর্ব্বব্যাপী যোগ ও সমন্বয়, যাকে ওয়াগ্‌নার Stylisation and Synthesis বলেচেন তার রেখাপাত তখনও হয় নি। এক শ্রীবুদ্ধ এবং খৃষ্টের model ছাড়া যা শীল্প সাহিত্যে গৃহীত হয়েছিল, সবই কেবল দেশচর্য্যা, প্রতিহিংসা, বিচার বা শাস্তিরই প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাও কেবল ভাবের ঐক্যের মধ্যেই ঐক্যের সৃষ্টিই (One-man-system) করা হয়েছিল, বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার মণি-সূত্রের নির্দ্দেশ (Art of Ensemble) ভারতীয় দর্শন ছাড়া আর কোনও প্রাচীন শিল্প সাহিত্যে দেখা যায় নি।

কিন্তু ইউরোপে আর এক শ্রেণীর কর্ম্মী আছেন তাঁরা চির পরিবর্ত্তনের উপাসক বলে, সেকালের সকল আচার বিচারকে প্রত্নতত্ত্বের যাদুঘরে লুপ্তজীবের কঙ্কালের মত স্তূপীকৃত করে রাখতে চান। তাঁরা বলেন সৃষ্টিকে যন্ত্রবদ্ধ করা বা বজ্র মুষ্টির আয়ত্তে রাখা সম্ভব নয়। বার্গসোঁর উপদেশ, 'সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্ত্তনটাই একটা মুখ্য সত্য' (Creative Evolution)। হুফার বিদ্রূপ করে বল্লেন "প্রকৃতিকে

পেরেক মেরে যদি গেঁথে রাখা যায় তা হলে প্রি-র‍্যাফেলাইটরা অপরিবর্ত্তনকে তুলিকার স্পর্শ দিতে পারবে। দেখ, রাস্কিনের শত চেষ্টাও প্রি-র‍্যাফেলাইটদের ধরে রাখতে পারে নি"।

সত্য কথা। এই ভাঙার যুগে প্রাচীন বা অতীতের কথা বল্‌তে যাওয়া ধৃষ্টতা। এবং এ কথাও সত্য যে ভাঙার একটা আনন্দ আছে। ইবসেন বা ভেয়ারলেইন, জীবনের কোন দিক থেকে ভাঙার বিপ্লব সৃষ্টি করেচেন, কেন ভাঙার আনন্দ আজ আর্টে উচ্ছলিত, জানা না থাকলে সে আর্ট কেবল অল্প বুদ্ধি নরনারীর ইন্দ্রিয়ের বিলাসই বাড়িয়ে দেবে। বোসান্‌কোয়ের কথা আমরা ঘুরিয়ে বলতে পারি, 'রম্য পরীরাজ্য ছেড়ে সরল ও সহজ কল্পনা বহির্মুখী না করে আত্মাভিমুখী করতে হবে। পরীরাজ্য থেকে লোকের মন ঘরে ছুটে আসছে; কিন্তু বাহিরের ঘরে বসে থাকলে চলবে না অন্দরে ঢুকতে হবে'। যদিও বর্ত্তমানকে ছোট করবার উৎসাহ আমাদের একেবারেই নেই বা প্রাচীনতার অস্পষ্ট ইতিহাসকে স্পষ্ট করে, বর্ত্তমানকে অস্পষ্ট করে তোলবার রুচির আমাদের একান্ত অভাব, তবুও আত্মম্ভরিতার স্বাধীন চেষ্টাকে আমরা তুচ্ছ করি, কারণ জানি অতীতকে বাদ দিয়ে, খণ্ড সৌন্দর্য্যের উপাসক সম্প্রদায়ের নিকট অখণ্ড-সৌন্দর্য্যের সিংহদ্বার চিরকালই অর্গলাবদ্ধ থাকবে। খণ্ড ধর্ম্ম যেমন নির্ব্বাণের রাজ্যে আগুন জ্বালিয়েছে, খণ্ড সামাজিকতা যেমন সম্পূর্ণ মানবতাকে অবহেলার চাপনে পিষে মারলে, তেমনি খণ্ড আনন্দ-বিজ্ঞান (Æsthetics) আনুশীলনিক একতার (Cultural Unity) পরিবর্ত্তে আনুশীলনিক বিরোধিতারই (Cultural Conflict) সৃষ্টি করবে। তাই বলি স্বাধীন মনন এবং স্বচ্ছন্দ-রস গ্রহণ করবার পূর্ব্বে পদ্ধতিগত (Conventional) এবং প্রত্নতাত্ত্বিক (archaeological) আর্ট বোঝা বিশেষ দরকার।

আজ শিক্ষার ব্যাভিচারই আদর্শ বা আচার্য্যের নিকট বিনীত আত্মসমর্পণ মানা করেছে। সকলকে অবজ্ঞা করা একটা যেন মস্তবড় মনুষ্যত্ব। বর্ণপরিচয়েরও যখন গুরু দরকার তখন উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার স্থান কোথায়? প্রাচীন নইলে নবীন জন্মাল কিরূপে? এ সত্য

বুঝতে না পারায়, নতুনের অবজ্ঞায় অতীতের কত কোমল শিল্প-সাহিত্য আগত-ঐশ্বর্য্যের কঠিন স্পর্শে চূর্ণ হয়ে হারিয়ে গ্যাছে—যেমন প্রতীচ্যের সংঘর্ষে ভারতের সকল শিল্প-সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞান হারিয়ে যেতে বসেছিল। কারণ স্বদেশীরা বুঝতে পারেনি জামালপুরের কঠিন হৃদয় ভেদ করে টনেল তৈরী করা বা পদ্মার উর্ম্মি-ভঙ্গকে স্তম্ভিত করে সেতু নির্ম্মাণ অপেক্ষা ভাব রাজ্যের একটা পদ্মকে ফুটিয়ে তুলে প্রতিফলিত করা অনেক কঠিন।

ক্রোশ বলেন, "ইতিহাস বা অতীত হচ্ছে অনন্ত বর্ত্তমান (Eternal-present)। বর্ত্তমানকে তা অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে আছে ; ব্যক্তিগত মনের দিক হতেও তা অপরিহার্য্য"। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই ছন্দে বলেছেন—

অতীত

যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে,
কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর
কল কল ভাষ নীরব তাহার,—
তরঙ্গ হীন ভীষণ মৌন !
তুমি তারে কোথা লও !

স্মৃতি

কত কি যে আসে কত কি যে যায়
বহিয়া চেতনা-বাহিনী
আঁধারে আড়ালে গোপনে নিয়ত
হেথা হোথা তার পড়ে থাকে কত,—
ছিন্ন সূত্র বাছি শত শত

তুমি গাঁথ বসে কাহিনী
ওগো একমনা, ওগো অগোচরা
ওগো স্মৃতি অবগাহিনী।

অতীতই স্মৃতি রূপে বর্ত্তমান। আচার্য্য শংকর তাই সংস্কার অনাদি বলেচেন। নইলে জন্মগত মনটা যদি একটা লকের (Tabula rasa) সাদা বোর্ডের মত হত, তা হলে চিত্তের বিকাশ অব্যক্তই থেকে যেত।

দেখাও যাচ্চে অ-কাল্পনিক বাস্তবতার দ্বিপ্রহরের রাজপথেও অতীতের রাহাজানি। নইলে কি হুইটম্যান দুঃখ করে বলতেন, "এ যুগে আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার সীমার ভেতর যে সমস্ত ভাব এসেছে ও আসছে তার কোনটাই আমাদের নয়, সব বাহিরের। নানা রকমের কাজের লোক আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু খাঁটি ভাবে জাতির হৃদয় কষে দেখতে গেলে তাদের চেষ্টার স্বার্থকতা এক মুহূর্ত্তও টেঁকে না। আমি বলছি আমি এমন আর্টিষ্ট, লেখক বা বক্তাকে দেখিনি যিনি এ যুগের গভীর স্তরে প্রবাহিত অশ্রান্ত উচ্ছাস ও কল্পনাকে অনুকূল ভাব ও পরিচ্ছদে বর্ত্তমান আর্টের ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।"

বর্ত্তমানকে বুঝতে হলে অতীতের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনই অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই মৃত্যুস্নানে অতীত নবীন জীবনে দেখা দিচ্চে। মনস্তাত্ত্বিকেরাই স্মৃতির মূল্য জানেন। স্মৃতি যে অতীতকে কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে অমর করে রেখেছে। 'সময় যে সৌন্দর্য্যে ভুলে রূপহীন মরণকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রাখছে'। 'স্মৃতির সহস্রদল যে অতীতের অসংখ্য পরাগে পূর্ণ। কত জ্যোৎস্নালোক, কত ধূসর গোধূলির সংস্কার নতুন কবির চিত্তনীড়ে অমর আসন রচনা করে রেখেছে তা সে নিজেও জানে না'।

যে বাস্তবতা ও তার পরিণামের নজির দেখিয়ে লড়াই বাধিয়েছ তার সার্থকতা কোথায়? প্রকৃতিকে নিয়েইত তোমার বাস্তবতা। কিন্তু সেই প্রকৃতির গর্ভে আত্মা জন্মায়নি, আত্মাই প্রকৃতির জীবন দান করেছে—সৃষ্টি জন্ম নিলে অস্রষ্টাতে। দ্রষ্টা আছেন বলেই দৃশ্য আছে।

বাহ্য অন্তরেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্তরই বাহ্য ক্রমের এক একটা বিশেষ ধর্ম্মদান করছে। চিত্ত মৃণালেই ত সৃষ্টির শতদল ফুটে ওঠে, আবার তাইতেই বীজরূপে আপনাকে লুকিয়ে রাখে; কল্পান্তে তাই আবার রূপান্তরিত হয়ে বিকশিত হয়। নিৎসে (Nietzche) এই বৈদিক সত্য বুঝতে পেরে স্বামিজীর কথার প্রতিধ্বনি করে বলছেন, "মানুষ ভাবছে, দুনিয়া সৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে কিন্তু সে ভুলে যায়, যে তার কারণ সে নিজেই। সে নিজেই তাকে সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করেছে...... .. বাস্তবিক, মানুষ সৃষ্টিপর্য্যায়ে নিজের ছবিই দেখে, নিজের অনুরূপ হলেই তাকে সুন্দর মনে করে। সংসার কি বাস্তবিক সুন্দর?—মানুষ মনে করে বলেই তা সুন্দর। মানুষ তাকে মানবরসে পূর্ণ করেছে—এই হচ্চে কথা (The Twilight of the Idols. Nietzche)।

কথা-প্রসঙ্গে এ কথাও আমাদের বলতে হয় মানবতার কোন স্তরেই পৌত্তলিকতা বলে কোনও জিনিস ছিল না। যত বড়ই কিস্তুতকিমাকার মূর্ত্তিই হোক না কেন, একটা না একটা ভাব ছিল তার প্রাণ। কার্লাইল ঠিকই বলেছেন, "মরুভূমির মধ্যে আরবেরা যে ভাবে নক্ষত্র গুলোকে দেখতো, আমরা কি সেই চোখে তা এখন দেখতে পারি" (Hero-worship)! মোদ্দা কথা, পড়ে শুনে এই বোধ হয়, যে পৌত্তিলকতার স্রষ্টা আদিম যুগে আহুদী মুসা, আর আধুনিক বাঙালী রাজা রামমোহন রায়! পৌত্তলিক কথাটার অর্থ অনুধাবন হিন্দুর কাছে পূর্ব্বে ত অজ্ঞাত ছিলই এখনও দুর্ব্বোধ্য। কেন না প্রতিমা বা প্রতীক উপাসনা যদি পৌত্তিলকতা হয়, তাহলে আর্ট জিনিষটাই পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হয় এবং এমন কে নিষ্ঠুর সভ্য আছে যে সুচিত্রিত ছায়াপাতে বা রূপায়ত মর্ম্মরে শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা মানস পূজা না করে?

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

(১৭)

ইংরাজীর অনুবাদ

সুইজারল্যাণ্ড,

২৬শে আগষ্ট, ১৮৯৬

প্রিয় ন—

এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। খুব ঘুরচি। আল্‌প্স পাহাড়ে খুব চড়াই করচি আর বরফান্ পার হচ্চি। এখন যাচ্চি জার্ম্মানী। প্রফেসর ডয়সন্ কীয়েলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। সেখান থেকে ইংলণ্ড যাব। সম্ভবতঃ আগামী শীতে ভারতে ফিরব।

মলাটের ছবির নমুনা সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে, তাতে বড্ড বেশী রং চড়ান; আর তা ছাড়া অনাবশ্যক এক গাদা মূর্ত্তির সমাবেশ করা হয়েচে। এই ধরণের ছবি খুব সাদাসিদে, ছোটখাট, অথচ ভাবের প্রতীক স্বরূপ হওয়া চাই। * * *

আমি খুব খুসী যে, কাজ সুন্দর চলেচে।

* * * যা হোক, একটা কথা আপনাকে বলে রাখচি, ভারতে সংঘবদ্ধভাবে আমরা যে সব কাজ করি তা একটা দোষে সব পণ্ড হয়ে যায়। আমরা এখনও ঐ রকম কাজের ধারা ঠিক ঠিক শিখিনি। কাজ——কাজ, তার ভেতর বন্ধুত্ব বা চক্ষু লজ্জার স্থান নেই। যার ওপর কাজের ভার সে টাকা কড়ির খুটিনাটি সব হিসেব রাখবে, এমন কি যদি কারুকে না খেয়েও মরতে হয় তবুও 'শাকের কড়ি মাছে' বা 'মাছের কড়ি শাকে' কিছুতেই দেবে না। একেই বলে সাঁচ্চা কাজ।

তারপর চাই—অদম্য উৎসাহ। যখন যা করবেন তখনকার মত তাই হবে আপনার ভগবৎ সেবা। এই পত্রিকাটি এখনকার মত আপনার ভগবান হোক, তা হলেই আপনি সফলকাম হবেন।

যখন এই পত্রিকাটি দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন, তখন তামিল, তেলেগু, ক্যানারী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ঠিক ঐ ভাবের আরো কয়েকখানা কাগজ বের করুন। মাদ্রাজীরা খুব সৎ, উৎসাহী, তবে আমার মনে হয়, শংকরের জন্মভূমি তাদের ভাব হারিয়ে ফেলেচে।

অপরে যেখান থেকে হটে আসবে, আমার ছেলেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা দেবে, সংসারের সব ভয় তারা ত্যাগ করবে, তবেই ত কাজ শক্ত বনেদের ওপর দাঁড়াবে।

বীরের মত কাজ করে যান, ছবিটবি এখন চুলোয় যাক---ঘোড়া হলে জিনের জন্যে আটকাবে না। আমরণ কাজ করুন—আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে রয়েচি, শরীর চলে গেলেও আমার শক্তি আপনাদের ভেতর কাজ করবে।

এ জীবন আসে যায়—ধন, মান, ইন্দ্রিয়ভোগ সবই দুদিনের জন্যে। ক্ষুদ্র সংসারী কীটের মত মরার চাইতে, কাজ করতে গিয়ে সত্যের জন্যে মরা ঢের—ঢের ভাল।

চলুন—এগিয়ে চলুন।

ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

আপনাদের—

বিবেকানন্দ

রাজযোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পঞ্চম পাঠ

প্রত্যাহার ও ধারণা। কৃষ্ণ বলছেন, "যে যে রাস্তা দিয়েই যাক্ আমার কাছেই পৌঁছাবে—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" "সকলেই আমার কাছে আসবে।" প্রত্যাহার হচ্ছে মনকে গুটিয়ে এনে কোন বিশেষ বস্তুতে একীভূত করবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ—মনকে ছেড়ে দিয়ে তার ওপর নজর রাখা, আর সেটা কি ভাবে, তাই দেখা। যেই কোন চিন্তার ওপর বিশেষ নজর দেবে অমনি সেটা বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু চিন্তাটাকে জোর করে বন্ধ করবার চেষ্টা করো না, কেবল সাক্ষী হয়ে দেখে যাও। মন ত আর আত্মা নয়, এটা হচ্ছে জড়ের একটু সূক্ষ্ম অবস্থা মাত্র। স্নায়বিক শক্তি দিয়ে একে আয়ত্ত করে তারপর ইচ্ছানুযায়ী আমরা তার ব্যবহার করে নিতে পারি।

দেহটা হচ্ছে মনের বহিঃপ্রকাশ (objective view)। কিন্তু আমরা দেহ মনের অতীত, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনশীল, সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। দেহটা—চিন্তারসের দানা।

যখন বাঁ নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়বে তখন বিশ্রামের সময়, যখন ডান নাক দিয়ে পড়বে তখন কাজের সময়, যখন দুই নাক দিয়েই পড়বে তখন ধ্যানের সময়। যখন দেহ মন শান্ত হয়ে আসবে আর দুই নাক দিয়েই সমানভাবে নিঃশ্বাস পড়বে তখন বুঝতে হবে ঠিক ঠিক ধ্যানের অবস্থা হয়েছে। প্রথম প্রথম জোর করে মনকে একাগ্র করবার চেষ্টা করলেও কোন ফল হয় না। মনের নিরোধ আপনিই হবে।

বুড়ো আঙুল ও অনামিকার সাহায্যে বহুদিন ধরে শ্বাস রোধ কর-

বার পর, কেবল চিন্তার মধ্য দিয়ে ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই ঐ রকম করা যেতে পারে।

প্রণায়ামের এইবার একটু পরিবর্ত্তন দরকার। যে সব সাধকের ইষ্ট মন্ত্র লাভ হয়েছে, তারা রেচক ও পূরকের সময় "ওঁ"কারের পরিবর্ত্তে ইষ্ট মন্ত্র আর কুম্ভকের সময় "হুঁ" মন্ত্র জপ করবে।

কুম্ভকের সময় যখন "হুঁ" মন্ত্র জপ করবে তখন মনে মনে কল্পনা করবে সেই ধৃত নিঃশ্বাস পুনঃ পুনঃ কুণ্ডলিনীর মাথায় আঘাত কচ্ছে এবং তার দ্বারা তিনি যেন জাগরিত হচ্ছেন। ঈশ্বরের সহিত নিজের একত্ব চিন্তা কর। জাগ্রত ভূমিতে যেমন আমরা দেখতে পাই যে একটা লোক আসছে তেমনি ধ্যান করবার কিছুক্ষণ পরে আমরা বুঝতে পারব যে, চিন্তাগুলো আসছে; কি করে চিন্তাগুলো উঠছে আর আমরা কিই বা চিন্তা করতে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারব। যখন আমরা মন থেকে আত্মাকে তফাৎ করতে পারব, যখন আমরা বুঝতে পারব যে আমরা ও আমাদের চিন্তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। তখনই বুঝতে হবে ঐ অবস্থায় আমরা পৌঁচেছি। চিন্তা গুলো তোমাদের পেয়ে না বসে; সর্ব্বদা তাদের পাশ কাটাবে, তা হলেই তারা আপনি বিলীন হয়ে যাবে।

এই সৎ চিন্তাগুলির অনুসরণ কর; তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাও, যখন তারা স্তিমিত হয়ে যাবে তখন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন পাবে। এই হচ্ছে তুরীয় অবস্থা। ভাব যখন স্তিমিত হয়ে আসবে তখন তার অনুসরণ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও বিলীন হয়ে যাও।

দ্যুতি হচ্ছে অন্তর্জ্যোতিঃ প্রতীক, যোগীরা তা দেখতে পান। কখন কখনও এমন মুখ আমরা দেখতে পাই যেন জ্যোতিঃ দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে আমরা চরিত্র পাঠ এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভাব-চক্ষে হয়ত ইষ্ট মূর্ত্তি আমাদের সামনে আসতে পারেন, তাঁকে সহজেই প্রতীক স্বরূপ নিয়ে আমরা মনকে সম্পূর্ণরূপে একাগ্র করতে পারি।

যদিও আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে চিন্তা করি কিন্তু তার অধিকাংশই হচ্ছে চোখের কাজ। এমন কি চিন্তাগুলো পর্য্যন্ত অর্দ্ধ জড়। কথা

ফিরিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ছবি ছাড়া চিন্তাই করা যায় না। পশুরা চিন্তা করে বলে বোধ হয়। কিন্তু তাদের যখন ভাষা নেই তখন মনে হয়—ভাবগুলির মধ্যে কোন বিশেষ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নেই। যোগের সময় কল্পনাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করবে কিন্তু সাবধান তা যেন পবিত্র হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই কল্পনা ধারার বৈশিষ্ট্য আছে; তোমার পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেইটেই কর, সেইটেই তোমার সোজা হবে।

বহুজীবনব্যাপী কর্ম্মের শেষ ফল আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন। "এক প্রদীপ থেকে যেমন আর এক প্রদীপ জ্বলে ওঠে"—এ কথা বৌদ্ধরা বলেন। প্রদীপ আলাদা কিন্তু আলো সেই একই।

সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও নির্ভীক থাকবে, রোজ স্নান করবে; ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়, এই সব থাকলে ঠিক ঠিক যোগী হতে পারবে। কখনও তাড়াতাড়ি করো না। অলৌকিক শক্তি এলে মনে করবে তারা বিপথ; তোমায় যেন তারা লুব্ধ করে আসল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে না যায়। তাদের দূর করে দিয়ে তোমার যে একমাত্র লক্ষ্য – ভগবান, তাঁকেই ধরে থাকবে। কেবল সেই চিরন্তনকে খোঁজ, যাঁর সন্ধান পেলে আমাদের চির বিশ্রাম লাভ। পূর্ণকে যদি লাভ করা যায় তবে চেষ্টা আর কিসের জন্য থাকবে? পূর্ণকে লাভ করলে আমরা চির-কালের মত মুক্ত হলুম, অমরত্ব লাভ করলুম।

পূর্ণ সৎ পূর্ণ চিৎ পূর্ণ আনন্দ।

ষষ্ঠ পাঠ

সবিকল্প ও সুষুম্না। সুষুম্নার ধ্যান করা বিশেষ প্রয়োজন। যদি ভাব-চক্ষে কখনো এঁর দর্শন পাও তাহলে তাঁরই ধ্যান করা সব চাইতে ভাল। , বহুক্ষণ এর ধ্যান করবে। সুষুম্না একটি সূক্ষ্ম, জ্যোতি-র্ম্ময়, সূত্রাকারে প্রাণময় পথ মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে চলেছে। কুণ্ডলিনীকে এই মোক্ষ বা ব্রহ্মমার্গ দিয়ে জাগাতে হবে।

যোগীদের ভাষায় সুষুম্নার দুটো দিক দুটো পক্ষের সঙ্গে জোড়া

রয়েছে। নীচের দিকে কুণ্ডলিনীর ত্রিকোণ চক্র যে-পক্ষের ভিতর, তার সঙ্গে, আর ওপরের দিকে—ব্রহ্মরন্ধ্রে ; এই দুটোর মাঝখানে আরও পাঁচটি পদ্ম আছে।

ওপরের দিক থেকে নিম্নগতি হিসেবে বিভিন্ন চক্র বা পদ্মের নাম,—

সপ্তম—সহস্রার (Pineal Gland)

ষষ্ঠ—আজ্ঞাচক্র (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে)

পঞ্চম—বিশুদ্ধাক্ষ (কণ্ঠে)

চতুর্থ—অনাহত (বক্ষে)

তৃতীয়—মণিপুর (নাভি দেশে)

দ্বিতীয়—স্বাধিষ্ঠান (উদর-নিম্নে)

প্রথম—মূলাধার (মেরুদণ্ডের নিম্নে)

প্রথমে কুণ্ডলিনীকে জাগান চাই, তারপর একটির পর একটি পদ্ম ভেদ করে মস্তিষ্কে নিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক ভূমি হচ্ছে মনের নব নব স্তর।

[স্বামী বিবেকানন্দ কৃত রাজযোগের (Six Lessons on Raj yoga) ভাষান্তর সম্পূর্ণ]

তত্ত্বকথা

সাকার কি নিরাকার ব্রহ্মবস্তু হয়।
এই তর্ক নিয়ে মত্ত জীব সমুদয়॥
ভাব নাই, ভক্তি নাই, তর্ক শুধু সার।
তর্কেতে পাবে না তাঁরে, তর্কের সে পার॥
সাকার কি নিরাকার পায়না ভাবিয়া।
আন্তরিক ডাক তাঁরে ভাব ভক্তি নিয়া॥
ভাব ভক্তি নিয়া তাঁরে ডাকিবে যখন।
তখনি পাইবে সেই ভাবগ্রাহী জন॥

—বিজ্ঞানী

শক্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বেদ

পূর্ব্বে যা বলা হয়েছে তা ছাড়াও বেদের নানাস্থানে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশের কথা বলা হয়েছে।

অগ্নে যত্তে দিবি বর্চ্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষপ্‌ স্বা যজত্র।
যেনান্তরিক্ষ মুর্ব্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণ বো নৃ চক্ষাঃ॥

(ঋক্‌ ৩।২২।২)

হে পরমদেব দ্যুলোকে যে তেজঃ শক্তি বিদ্যমান তাহা তোমারই জ্যোতিঃ, পৃথিবীতে দাহ পাকাদি ক্রিয়া নিষ্পাদকরূপে যে তেজ দেখতে পাই, তাও তোমারই তেজ, বৃক্ষাদিতে যে তেজ বিদ্যমান, বনস্পতি প্রভৃতিতে যে সামান্য তেজ আছে, জলে যে উর্ব্ব তেজ আছে, তাও তোমারই তেজ। তুমিই বায়ুরূপে সমগ্র আকাশে তপঃ স্বরূপে বর্ত্তমান আছো।

অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টব সৌষধীরনুরুধ্যসে।
গর্ভে সঞ্জায়সে পুনঃ॥ ঋক্‌ ৮।৪৩।৯

হে অগ্নি! তুমিই জলে প্রবেশ কর, তুমিই ঔষধি সমূহের সৃষ্টি করে তাদের গর্ভে প্রবেশ করে থাকে, তুমিই আবার তাদের অপত্য-রূপে জন্মাও।

দিবং পৃথিবীমন্তরীক্ষং যে বিদ্যুতমনু সঞ্চরন্তি।
যে দিক্ষ্বন্তর্যো বাতে অন্তস্তেভ্যোঽগ্নিভ্যোহুতমাস্ত্বেতৎ॥

অথর্ব্ববেদ ৩।২১।৭

দ্যুলোকে, ভূলোকে এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোকে

যিনি প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চরণ করেন, যিনি তড়িতের আকারে প্রকাশিত হন, যিনি জ্যোতিশ্চক্রে সঞ্চরণ করেন, যিনি ত্রিলোকব্যাপী দিক্‌সকল ব্যাপিয়া আছেন, যিনি সর্ব্ব জগতের আধার, যিনি সূত্রাত্মারূপে বায়ুতে বিদ্যমান, আমরা বিশ্বজগতের অনুগ্রাহক সেই অগ্নির হোম করি।

এই মন্ত্রগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায় ঋগ্বেদের ঋষিরা শক্তির একত্ব—সম্বন্ধ (Unity of forces) বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। একই শক্তি কখন চেতন কখনও অচেতনরূপে প্রকাশ পান। আচার্য্য শংকর তাঁর ভাষ্যে সাংখ্য মত খণ্ডনে স্পষ্ট ভাষায় বেদের এ অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। শক্তির একত্ব ও পৃথকত্ব (Unity and Transformation of forces) আধুনিক বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। এই সূক্ষ্ম দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত চণ্ডীতে রূপকে বর্ণিত হয়েছে। জড়-বিজ্ঞানীরা যাঁকে বিশ্বশক্তি (Cosmo physical Energy) বলেন, আস্তিক দর্শন যাঁকে বিশ্ব-প্রাণশক্তি (Cosmo-psychical Energy) বলে ব্যাখ্যা করেন, হারবার্ট স্পেনসার যাঁকে অজ্ঞেয় মহাশক্তি (Inscrutable Power) নাম দিয়েছেন, গ্যানো ও নর্মী যাঁকে স্থিতির গতি (Accelerating) এবং গতির স্থিতি (Retarding) বিধায়িনী শক্তি নাম দিয়েছেন, কারলাইলের কাছে যিনি ফোর্স (Force): যাঁর অপর প্রতিশব্দ পাওয়ার (Power), এনার্জী (Energy), এ্যাকসন (Action) তিনিই বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু।

হলম্যানের ফোর্স বা এনার্জী নানা ভাগে বিভক্ত—গতিশক্তি (Energy of motion), ক্রিয়মান শক্তি (Kinetic Energy), মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Energy of Gravitation), তাপ (Heat) স্থিতি স্থাপকতা শক্তি (Energy of Elasticity) সংঘাত শক্তি (Co-hersion Energy) এবং তাড়িত শক্তি (Electrical Energy)।

গ্র্যাণ্টের পাওয়ার আবার অন্য ভাবে বিভক্ত—যোগাকর্ষণ শক্তি (Aggregative Power), বিপ্রকর্ষণ শক্তি (Separative Power), সংস্থানিক শক্তি (Molar Power), আণবিক শক্তি (Molecular Power), পারমাণবিক শক্তি (Atomic Power), তাড়িত শক্তি

(Electric), মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitation) এবং রাসায়নিক শক্তি (Chemical Affinity)।

হলম্যান এবং গ্রান্টের পাওয়ার এখন স্যার অলিভার লজের বিদ্যুতিন শক্তিতে (Electronic force) পরিসমাপ্ত। এবং হারবার্ট স্পেনসার যাকে, Force as we know it, can be regarded only as certain conditioned effect of the unconditioned cause অর্থাৎ শক্তির মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানবার উপায় নেই, তবে এইটুকু জানা যেতে পারে যে একটা কোনও অপরিচ্ছিন্ন মহা-শক্তির পরিচ্ছিন্ন অবস্থা। আইন্‌ষ্টিনের অপেক্ষিকতায় (Relativity) মিশে গ্যাছে।

বৈশেষিক

বৈশেষিকেরা (Hindu Physicists) বলেন শক্তি দ্রব্যগুণ ক্রিয়া-নিষ্ঠ বস্তুস্তর বিশেষ। দ্রব্য, গুণ এবং ক্রিয়া এই তিনটি পদার্থের শক্তি প্রত্যেকে বিভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট হলেও কারও কোনও শক্তির বিকাশ করতে হলে পরস্পরের সাহায্য দরকার। যেমন আগুন ধরান ছাড়া কাঠের অগ্নির দাহিকা শক্তির বিকাশ হতে পারে না। কটুরস (Acid) কোনও দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত না হলে তার জ্বলন শক্তির বিকাশ হতে পারে না। উৎক্ষেপন ক্রিয়া, অবক্ষেপন ক্রিয়া কোন দুটো জিনিষের ওপর না হলে, তাদের চূর্ণ করবার শক্তির বিকাশ হতে পারে না।

বৈশেষিক মতে পাঁচটি কর্ম্ম শক্তি—উৎক্ষেপণ (Upward motion) অবক্ষেপণ (Downward motion), আকুঞ্চন (Contraction), প্রসারণ (Extention) ও গমন (Curvilinear motion)। এদের আবার বহু কারণ ও বিভাগ আছে।

যোগবাশিষ্ঠ

উক্ত গ্রন্থের লেখক বশিষ্ঠ বলেন, শক্তিই দ্রব্যগুণ কর্ম্ম প্রভৃতি*

বিবিধ নামে পরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থগুলি শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষ। আকাশ, দেশ, কাল, দিক, পরমাযু, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন—ইহারা এক অপরিচ্ছিন্ন শক্তিরই বিভিন্ন পরিচ্ছিন্ন অবস্থা।

শব্দ শাস্ত্র

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান—কোষাপ্ত বাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ (প্রাঞ্চ)—শব্দের শক্তি অর্থাৎ এই শব্দ থেকে এইরূপ অর্থই বুঝতে হবে, শব্দের এমন একটি ঈশ্বরেচ্ছা শক্তি, যা ব্যাকরণ, উপমান, আপ্ত-বাক্য ও লৌকিক ব্যবহার থেকে উপলব্ধি হয়। এই ইচ্ছাত্মক কল্পিত সংকেত বা শব্দ তার অর্থ-শক্তি তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন রূঢ়ি—ঘট, যৌগিক—পাচক এবং যোগারূঢ়ি—পঙ্কজ।

বাক্য-পদীয়

ভর্ত্তৃহরি তাঁর বাক্য-পদীয় গ্রন্থে শক্তি শব্দের এক বিশেষ ব্যবহার করেছেন—

একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তি ব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেহপি শক্তিভ্যঃ পৃথকত্বেনেব বর্ত্ততে॥

শব্দব্রহ্মে একত্বের অবিরোধিনী, পরস্পর পৃথক আত্মভূতা শক্তি-সমূহ বিরাজমানা। এই সকল শক্তির ভেদারোপ নিমিত্ত শক্তিসমূহ হতে যদিও মূলতঃ পৃথক নন তবুও ব্রহ্মের পৃথকত্ব আরোপ হয়ে থাকে।

আর এক জায়গায় শক্তির অপ্রকাশের হেতু বলচেন—

নিজ্ঞাতে শক্তেদ্রিব্যাণ্ড তাং তামর্থ ক্রিয়াং প্রতি।
বিশিষ্ট দ্রব্যসম্বন্ধে সা শক্তি প্রতিবধ্যতে॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত দ্রব্য-শক্তি অন্য কোনও রূপ বিশিষ্ট-দ্রব্য-সম্বন্ধ হলে, তা নিজের ধর্ম্মানুসারে কাজ করতে পারে না। এই শক্তি-প্রতিবাধাই (Counter-action or Neutralisation of Forces) শক্তির অপ্রকাশের হেতু।

প্রাভাকর এবং মীমাংসক

এরা তাঁদের অষ্ট-বিধ পদার্থের মধ্যে শক্তিকে ধরেচেন। প্রাভাকরদের আটটি পদার্থ এই—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, পারতন্ত্র্য শক্তি ও নিয়োগ এবং মীমাংসকদের আটটি পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি ও সাদৃশ্য।

প্রাভাকরদের মতে শক্তি প্রত্যক্ষ হয় না অনুমান-গ্রাহ্য—যেমন ঈশ্বর। বৈশেষিকেরা বলেন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে শক্তি থাকে সেই জন্য শক্তি পদার্থ এদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাভাকরেরা বলেন যেহেতু শক্তি সামান্যাদি পদার্থের ন্যায় স্থির বা নিত্য নয় সেইজন্য একে ওদের মধ্যে ফেলা যেতে পারে না। তা ছাড়া যার দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় তাই তার কার্য্য সাধিকা শক্তি। কিন্তু যখন দেখা যাচ্চে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত যে বস্তু-শক্তি, অনেক স্থলে যথাযোগ্য কার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না—যেমন, অনলের দাহিকা শক্তি, বিষের প্রভাব, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বত্রই ক্রিয়া প্রকাশে সমর্থ হয় না, তখন বলতে হয় যার অভাবে কার্য্যের অভাব হয় তাই দ্রব্য-নিষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু অঙ্কুরোৎপাদনের অভাবেও যখন বীজ সম্ভব তখন উৎপাদন ধর্ম্ম হতে পারে না, ওটা একটা বিভিন্ন পদার্থ শক্তি। (তত্ত্ব চিন্তা-অনুষ্ঠান পরিশিষ্ট)

কিন্তু এর উত্তর ভর্তৃহরি তাঁর শক্তি প্রতিবাধার ব্যাখ্যায় দিয়েচেন।

ন্যায় কুসুমাঞ্জলি

উদয়নাচার্য্য উক্ত গ্রন্থে বলেন গোতম তাঁর ন্যায়ে শক্তি শব্দ স্বীকার করেন নি। তাঁর যুক্তি এইরূপ—

প্রশ্ন—অথ শক্তি নিষেধে কিং প্রমাণং?—শক্তির নিষেধের কি প্রমাণ আছে?

উত্তর—ন কিঞ্চিৎ?—কিছুই কি নেই?

প্রশ্ন—তৎ কিমস্ত্যেব?—তা হলে কি আছে?

উত্তর—বাঢ়ং নহি নো দর্শনে শক্তি পদার্থ এব নাস্তি—না, আমাদের দর্শনে (ন্যায়ে) শক্তি পদার্থের অনস্তিত্ব নেই।

প্রশ্ন—কোঽসৌ ?—তা হলে সেটা কি ?

উত্তর—কারণম্—কারণত্ব।

সপ্তপদার্থী সংহিতা

ঐ গ্রন্থ বলচেন—শক্তির্দ্রব্যাদিকস্বরূপমেব—শক্তি দ্রব্যাদির স্বরূপ।

পাণিনি

জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ পা ১।৪।২০—উপাদান (জনি) কারণই প্রকৃতি।

এই প্রকৃতিকেও শক্তি বলতে হয়, কেন না যার দ্বারা কোনও কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, যাতে কার্য্য সাধনের যোগ্যতা আছে তাই শক্তি। প্রকৃতি শব্দের যৌগিক অর্থও ঐ। প্র—প্রকৃষ্টরূপে, কৃ—উৎপাদন করে, কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তি = প্রকৃতি। এজন্যে প্রকৃতির অপর পর্য্যায় শক্তি। এর অপরাপর নাম—অজা, প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, তমঃ, অবিদ্যা।

তন্ত্র ও পুরাণ। এই সত্যকেই তন্ত্র-পুরাণ নিজের ইচ্ছারূপ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, রূপকে—সাত্বিকী—ব্রাহ্মী, রাজসী—বৈষ্ণবী এবং তামসী রৌদ্রী বলেচেন (বরাহ পুরাণ)। আবার কেউ সাত্বিকী—বৈষ্ণবী, রাজসী ব্রাহ্মী এবং তামসী—রৌদ্রী বলেচেন। আবার কেউ বলেচেন ওসব ব্যাখ্যা ঠিক নয়—ঠিক্ ঠিক্ রং অনুযায়ী ব্যাখ্যা এইরূপ—শ্বেতবর্ণা মাহেশ্বরী শক্তি—সাত্বিকী, লোহিতবর্ণা ব্রাহ্মী—রাজসী এবং কৃষ্ণবর্ণা বৈষ্ণবী তামসী। আবার ক্রিয়া-সার তন্ত্রে আছে বিন্দু—শিব এবং বীজ—শক্তি। গৌরী সংহিতায় বলছেন, ইচ্ছাশক্তি গৌরী, ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মী এবং জ্ঞানশক্তি বৈষ্ণবী। এও ঐ সকল কথার রকম-ফের মাত্র। আসল কথা হল—এক সত্তার এক দিকে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন আর এক দিক দিয়ে নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—নির্ম্মল, নিরঞ্জন ব্রহ্ম।

বাসুদেবানন্দ

বৈদিক ভারত

(ঋগ্বেদীয় যুগ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধীয় প্রমাণ সমূহের বিস্তারিত আলোচনা)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহর্ষি বশিষ্ঠ বরুণের সহিত পোতারোহণ করিয়া একবার সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রটি এইরূপ :—

আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।

অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্রপেঙ্খঈঙ্খয়াবহৈ শুভেকম্॥ ৭।৮৮।৩

উক্ত মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"যখন বরুণ ও আমি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম ও সেই নৌকাকে সমুদ্রের মধ্যে সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং জল-রাশির উপরে অন্যান্য গমনশীল নৌকার সহিত বর্ত্তমান ছিলাম, তখন শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় আমরা সুখে দোলায়মান হইয়াছিলাম।" *

* সায়নাচার্য্যের টীকা এইরূপ :—যৎ যদা বরুণে প্রসন্নে সত্যহং বরুণশ্চোভৌ নাবং ক্রমময়ীং তরণসাধনভূতা মারুহাব উভাবারূঢৌ বভূবিব। তাং চ নাবং যৎ যদা সমুদ্রং মধ্যং সমুদ্রস্য মধ্যং প্রতি প্রেরয়াব, প্রকর্ষেণ গময়াব। যৎ যদা অপামুদকানামধি উপরি স্নুভির্গন্ত্রীভি-রন্যাভিরপি নৌভিশ্চরাব বর্ত্তামহৈ। তদানীং শুভে শোভার্থং প্রেঙ্খে নৌরূপায়াং দোলায়ামেব প্রেঙ্খয়াবহৈ। নিম্নোন্নতৈস্তরঙ্গৈরিতশ্চেতশ্চ প্রবিচলন্তৌ সংক্রীড়াবহৈ। কমিতি পূরকঃ। যদ্বা ক্রিয়াবিশেষণম্। কং সুখং যথা-ভবতি তথেত্যর্থঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষি বশিষ্ঠ বহু নৌকার সহিত, অর্থাৎ নৌকার বহর (fleet) লইয়া একবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গমালার উপর তাঁহার নৌকা দোলার ন্যায় আন্দোলিত হইয়াছিল, এবং তিনি নৌকাতে দোলায়মান হইয়া অতিশয় আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন।

বরুণের কৃপাতেই সমুদ্রযাত্রী বশিষ্ঠের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। কেননা মেধাবী বরুণ গমনশীল দিন ও রাত্রি সমূহকে বিস্তার করিয়া দিনসমূহের মধ্যে সুদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা দ্বারা সুকর্ম্মা করিয়াছিলেন। * বশিষ্ঠের সমুদ্র-যাত্রা যে বহুদিন-ব্যাপিনী ছিল এবং একটি শুভদিনে যে তিনি সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝা যাইতেছে।

এই বরুণদেব সমুদ্রের অধিপতি ছিলেন; কারণ তিনিই সমুদ্রকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। + অর্থাৎ সমুদ্র যাহাতে বেলাভূমি অতিক্রম না করে; তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রে অবস্থিত হইয়া নৌকাসমূহের পথও জানিতেন। নদীতে নৌকার পথ জানা আবশ্যক হয় না। কিন্তু সমুদ্রে তাহা জানা নিতান্ত আবশ্যক হয়। নতুবা নৌকা অপথে গিয়া সমুদ্র-নিমগ্ন পর্ব্বতাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া জলে নিমগ্ন হইতে পারে, কিংবা গন্তব্য দেশে উপনীত না হইয়া অন্যত্রও উপনীত হইতে পারে। এই কারণে সামুদ্রিক নাবিকগণ সমুদ্রের উপর নির্দ্দিষ্ট পথেই পোতচালনা করিয়া থাকে। এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট পথ

---

* মূলমন্ত্রটি এইরূপ :—

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং বকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ ॥

(৭।৮৮।৪)

+ "অবসিন্ধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাৎ" (৭।৮৭।৬) সায়ণাচার্য্যের টীকা :—"দ্যৌরিব সূর্য্য ইব দীপ্তো বরুণঃ সিন্ধুং সমুদ্রং অবস্থাৎ। বেলায়ামবস্থাপয়তি। যথা বেলাং নাতিক্রমতি তথা করোতীত্যর্থঃ।"

সমুদ্রাধিপ বরুণদেব জানিতেন। তাহা এই পৃষ্ঠার নিম্নে উদ্ধৃত মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। *

বৈদিক আর্য্যগণের সমুদ্র সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, এবং তাঁহারা ও আর্য্য বণিক্‌গণও যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-সমূহ পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ঋগ্বেদে সমুদ্র ও সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে এত সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে বৈদিক আর্য্যগণের সমুদ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না, এবং ঋগ্বেদের মন্ত্র-সমূহের রচনাকালে তাঁহারা অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইবার অবসর পান নাই। এইরূপ উক্তি যে নিতান্ত অলীক, অসার ও ভিত্তিহীন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এইরূপ উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, এবং আমরাও অবিচারিত চিত্তে এই ঐতিহাসিক অসত্যগুলিকে অভ্রান্ত সত্য মনে করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছি ও পণ্ডিতম্মন্য হইতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রভাব আমাদের মনের উপর এরূপ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে, আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রান্তমত-খণ্ডনের চেষ্টাকে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা, দুঃসাহস ও বাতুলতা মনে করিয়া থাকেন। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণা আমাদের মধ্যে একপ্রকার নাই বলিলেও চলে। ক্রীতদাসের মনোবৃত্তি (Slave mentality) লইয়াই আমরা আজিও সন্তুষ্ট আছি ও সন্তুষ্ট-চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।

---

* "বেদা যঃ বীণাং পদমন্তরিক্ষেণ পততাং। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ।" (১।২৫।৭) সায়ণাচার্য্যের টীকা :—"অন্তরিক্ষেণ পততামাকাশ-মার্গেন গচ্ছতাং বীণাং পক্ষিণাং পদং যো বরুণো বেদ। তথা সমুদ্রিয়ঃ সমুদ্রেঽবস্থিতো বরুণো নাবো জলে গচ্ছন্ত্যাঃ পদং বেদ জানাতি।"

১১। চতুঃসমুদ্র সম্বন্ধে আর্য্যগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান

সে যাহা হউক, বৈদিক আর্য্যগণের সমুদ্রসম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান থাকা যখন ঋগ্বেদে প্রমাণিত হইতেছে, তখন কোন্ সমুদ্রসম্বন্ধে তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান ছিল, তাহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। প্রাচীন সপ্তসিন্ধুদেশের তিনদিকে তিনটি সমুদ্র এবং উত্তর দিকে মধ্যএসিয়ার মধ্যে একটি বড় ভূমধ্যসাগর বিদ্যমান থাকায়, তাঁহারা এই চারিটি সমুদ্রেরই সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই চতুঃসমুদ্রের উল্লেখ এইরূপ আছে :—

রায়ঃ সমুদ্রাংশ্চতুরোঽস্মভ্যং সোম বিশ্বতঃ।
আপবস্ব সহস্রিণঃ॥ (৯।৩৩।৬)

সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের টীকায় লিখিয়াছেন :—

"রায়ো ধনস্য সম্বন্ধিনঃ চতুরঃ সমুদ্রান্ ধনপূর্ণান্ ইত্যর্থঃ। তাদৃশান্ সমুদ্রানস্মভ্যমর্থায় হে সোম বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ আপবস্ব। তথা সহস্রিণঃ অপরিমিতান্ কামান্ আ পবস্ব। আগচ্ছ।"

ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"হে সোম, ধনসম্বন্ধীয় অর্থাৎ ধনপূর্ণ চরিটি সমুদ্রকে চারিদিক্ হইতে আমাদের নিকট আনয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কর।"

দেখা যাইতেছে যে, এই চারিটি সমুদ্রই ধনসম্বন্ধীয় বা ধনপূর্ণ। অর্থাৎ এই সমুদ্র-চতুষ্টয় হইতে বাণিজ্য দ্বারা বহু ধনরত্ন সপ্তসিন্ধুদেশে আনীত হইত, এবং সেগুলি ধনরত্নের আকরও ছিল। উদ্ধৃত মন্ত্রে ধনপূর্ণ চারিটি সমুদ্রকে আনিয়া দিবার জন্য, অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় ধনলাভের জন্যই সোমকে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

চতুঃসমুদ্র সম্বন্ধে আর একটি মন্ত্র এইরূপ :—

"স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং ধরুণং রয়ীণাম্।
চর্কৃত্যং শংস্যং ভূরিবারমস্মভ্যং চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ॥"
(১০।৪৭।২)

এই সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে "চিত্রং বৃষণং রয়িং দাঃ", এই প্রার্থনা আছে। ইহাই যেন প্রত্যেক মন্ত্রের "ধূয়া" (burden of song)। ইহার অর্থ কি? সায়ণাচার্য্য টীকায় লিখিয়াছেন :—"চিত্রং চায়ণীয়ং বৃষণং বর্ষকং রয়িং ধনং দাঃ দেহি।" অর্থাৎ "আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী সম্পত্তি প্রদান কর"। অতএব, ইন্দ্রের নিকট প্রভূত ধন প্রার্থনা করাই যে এই সূক্তের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত মন্ত্রে "স্বায়ুধং স্ববসং সুনীথং চতুঃসমুদ্রং" প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণ। অর্থাৎ, ইন্দ্র উৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী, উৎকৃষ্ট রক্ষক, সুন্দরনয়নবিশিষ্ট (সুনীথং) "চতুঃসমুদ্রং" অর্থাৎ ("চতুরঃ সমুদ্রান্ যো পয়সা ব্যাপ্নোতি তম্"। (সায়ণ) যিনি চারি সমুদ্রকে জলে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এবং "ধরুণং রয়ীণাম্" "ধরুণং ধারকং তেষাং রয়ীনাং ধনানাম্"। (সায়ণ) অর্থাৎ যিনি নানাবিধ ধন ধারণ করেন, এমন যে ইন্দ্র, তাঁহাকে আমরা জানি। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগকে নানাবিধ অভিলাষসিদ্ধিকারী ধন প্রদান কর।

উদ্ধৃত মন্ত্রে "চতুঃসমুদ্রং" এই বিশেষণের সার্থকতা কি? ইন্দ্র চারিসমুদ্রকে জলে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এই অর্থ গ্রহণ করিলে, ইন্দ্রের শক্তিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার পরেই "ধরুণং রয়ীণাং" অর্থাৎ "ধনসমূহের ধারক" এই বিশেষণ থাকায়, মনে হয় যে, চতুঃসমুদ্র ধনের আকর বা "রত্নাকর" বলিয়াই যেন ঋষি ইন্দ্রকে বলিয়াছেন "চতুঃসমুদ্রম্"—অর্থাৎ যিনি ধনরত্নের আকর চারিটি সমুদ্রের অধিপতি। এই অর্থ গ্রহণ করিলেও কোনও দোষ হয় না। যাহা হউক, ধনরত্নের আকর চারিটি সমুদ্রের উল্লেখ দ্বারা সপ্তসিন্ধুদেশের বা আর্য্যভূমির চারিদিকে চারিটি সমুদ্রের অস্তিত্ব যে প্রমাণিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই চতুঃসমুদ্র-পরিবৃত ভূভাগই আর্য্যগণের অধ্যুষিত দেশ ছিল।

১২। ভূতত্ত্ববিৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মত

পুরাকালে যে এই চারিটি সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই পুরাকালটিকে আমরা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে পারি? ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মিঃ এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ (Mr. H. G. Wells) তাঁহার "Outline of History" নামক পুস্তকে ৩৫০০০ হইতে ৫০০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপ ও এসিয়ার জলস্থলের যেরূপ সংস্থান ছিল, ভূতত্ত্ব-পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহার দুইটি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমি সেই দুইটি মানচিত্র তাঁহার অনুমতিক্রমে মৎপ্রণীত "Rigvedic Culture" নামক পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। কৌতূহলী পাঠকবর্গ তাঁহার প্রথম মানচিত্রটি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন যে, মিঃ ওয়েল্‌সের মতে চতুর্থ হিমযুগে অর্থাৎ আধুনিক সময় হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সপ্ত-সিন্ধুদেশ ও হিমালয় পর্ব্বতমালা দক্ষিণাপথ হইতে একটি বিস্তীর্ণ সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং ইহাদের মধ্যে কোথাও ভূমি-সংযোগ ছিল না। এই সমুদ্রটি পশ্চিম দিকে আরবসাগর হইতে পূর্ব্ব-দিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অর্থাৎ আধুনিক রাজ-পুতানা প্রদেশ ও সমগ্র গাঙ্গেয় প্রদেশ তৎকালে সমুদ্রজলে সমাচ্ছন্ন ছিল। গঙ্গা নদীও হিমালয় হইতে আধুনিক হরিদ্বারের নিকট সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াই সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। মধ্য এসিয়াতেও একটি প্রকাণ্ড ভূমধ্যসাগর বিদ্যমান ছিল। ইয়োরোপের আধুনিক তুর্কীদেশ ও গ্রীসদেশের সহিত এসিয়া মাইনর সংযুক্ত ছিল। ইয়োরোপের ভূমধ্যসাগর দুইখণ্ডে বিভক্ত ছিল, এবং উত্তর আফ্রিকার সহিত দক্ষিণ ইয়োরোপেরও ভূমিসংযোগ ছিল। গ্রেট্‌ব্রিটেন্ ও আয়র্ল্যাণ্ড স্বতন্ত্র দ্বীপাকারে না থাকিয়া ইয়োরোপ মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। সেই যুগে ইয়োরোপের সমগ্র উত্তরাংশ, এবং এসিয়ার মধ্যে তিব্বতদেশ, বহ্লীক ও মধ্য-এসিয়ার কিয়দংশ বিস্তীর্ণ তুষার-ক্ষেত্র দ্বারা আবৃত ছিল।

ওয়েল্‌স্ সাহেবের দ্বিতীয় মানচিত্রে বর্ত্তমান সময় হইতে ২৫০০০ হইতে ৩৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এসিয়া ও ইয়োরোপের জলস্থলের সংস্থান

দেখান হইয়াছে। এই মানচিত্র দেখিয়া বুঝা যায় যে, উক্ত সময়ে ভারতের সিন্ধুপ্রদেশে ও রাজপুতানার কিয়দংশে তখনও সমুদ্র ছিল। সম্ভবতঃ সপ্তসিন্ধুদেশের সহিত দক্ষিণাপথের স্থলসংযোগ হইয়াছিল এবং প্রথমোক্ত দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে গাঙ্গেয় প্রদেশের উপর যে সমুদ্র ছিল, তাহাও ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতেছিল. কিন্তু তথাপি আধুনিক সমস্ত যুক্ত-প্রদেশ (United Provinces of Agra and Oudh), বিদেহ, বিহার, অঙ্গ ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন ছিল। মধ্য-এসিয়ার ভূমধ্যসাগর ও ইয়োরোপের ভূমধ্য-সাগরের আকার পূর্ব্ববৎ ছিল। এসিয়া-মাইনর ও উত্তর-আফ্রিকা দক্ষিণ-ইয়োরোপের সহিত, এবং গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লাণ্ড পশ্চিম-ইয়োরোপের সহিত তখনও সংযুক্ত ছিল; তবে ফ্রান্স ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে যেন বর্ত্তমান সমুদ্রের বা চ্যানেলের (Channel) উদ্ভবও হইতে-ছিল। ইয়োরোপের তুষার-ক্ষেত্র-সমূহ ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া যাইতে-ছিল, এবং সমতল ভূমিগুলি তুষারমুক্ত হওয়াতে তৎসমুদায় সুদীর্ঘ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণে গভীর অরণ্যের একটি মেখলাও উদ্ভূত হইয়াছিল।

ওয়েল্‌স্ সাহেবের অঙ্কিত মানচিত্র দেখিবার পূর্ব্বে, ঋগ্বেদোক্ত প্রমাণ পরম্পরা ও ভূতত্ত্ব-সমূহের পর্য্যালোচনা করিয়া ঋগ্বেদীয় যুগে উত্তর-ভারতের জলস্থলের বিভিন্ন সংস্থান দেখাইয়া আমি স্বয়ং যে মানচিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছিলাম, তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মৎপ্রণীত "Rigvedic India" নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ওয়েল্‌স্ সাহেবের মানচিত্র প্রকাশিত হইলে, তাহার সহিত মদঙ্কিত মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলাম যে, উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের জলস্থলের কিরূপ অবস্থান ছিল, তাহা দেখাইয়া ওয়েল্‌স্ সাহেব যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত মদঙ্কিত মানচিত্রের সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিলেও সপ্তসিন্ধুদেশের অব্যবহিত দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগে যে সমুদ্র ছিল, তাহা আমার মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা উভয়েই

একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ওয়েল্‌স্ সাহেব তাঁহার দ্বিতীয় মানচিত্রে উত্তর ভারতের জলস্থলের যে সংস্থান দেখাইয়াছেন, তাহা আমার মতে ঋগ্বেদীয় যুগের পরবর্ত্তী সময়ের অন্তর্গত। কারণ, ঋগ্বেদীয় যুগে সপ্তসিন্ধুদেশের সহিত দক্ষিণাপথের স্থল-সংযোগ ছিল না। তখনও রাজপুতানা প্রদেশের উপর সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। ওয়েল্‌স্ সাহেবের দ্বিতীয় মানচিত্রটি যদি পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বকার সময়ের ভারতের জলস্থলের বিভিন্ন প্রকার সংস্থানের পরিজ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদীয় যুগকে পঁয়ত্রিশ হাজার বৎসরের আরও পূর্ব্বে লইয়া যাইতে হয়, অর্থাৎ তাহা অন্ততঃ চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুগ বা বৎসর গণনা আনুমানিক মাত্র। এইরূপ অনুমানের উপর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। তবে অনুমান ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে প্রাচীনকালে উত্তরভারতে জলস্থলের উক্তপ্রকার বিভিন্ন সংস্থান ও সমাবেশ ছিল, সেই প্রাচীনকালেই ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল। সেইকালটি পঁচিশ হাজার বৎসর কিংবা চল্লিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, অথবা তাহার পরেও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এই কালগণনা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অনুমান সঙ্গত বা অসঙ্গত হউক, ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যে খৃঃ পূঃ ১৫০০ বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, পরন্তু তাহার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে অসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আর ইহাও নিশ্চয় পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, আর্য্যগণ উক্তসময়ে ইয়োরোপ হইতে সপ্তসিন্ধু দেশে আগমন করেন নাই। খৃঃ পূঃ ১৫০০ বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে কেল্ট্, টিউটন্, স্লাভ্ প্রভৃতি জাতীয় মানবগণ অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য অবস্থায় কালযাপন করিত। তাহারা সেই সময়ে লৌহের এবং সম্ভবতঃ তাম্র ব্যতীত অন্য কোনও ধাতুর ব্যবহার জানিত না, এবং বৃহৎ জন্তুর অস্থি ও শৃঙ্গ, কিংবা প্রস্তরসমূহ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। এই শেষোক্ত অস্ত্রগুলি প্রথমে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত

এবং অস্ত্ররূপে ব্যবহার-যোগ্য প্রস্তর মাত্র ছিল। পরে অসভ্য মানবেরা সুদৃঢ় প্রস্তরসমূহকে অন্য প্রস্তর দ্বারা ভাঙ্গিয়া অথবা ঘসিয়া মাজিয়া মনোমত আয়ুধ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে, অসভ্য মানবেরা যে যুগে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত প্রস্তর সমূহকে আয়ুধরূপে ব্যবহার করিত, সেই যুগের নাম প্রত্ন-প্রস্তরায়ুধ যুগ (Palæolithic age)। এই যুগের পরিমাণ বহু সহস্র বা লক্ষাধিক বৎসর। পরে যে যুগে অসভ্য মানবেরা সুদৃঢ় প্রস্তর হইতে মনোমত আয়ুধ প্রস্তুত করিতে শিখিল, সেই যুগের নাম নব্য-প্রস্তরায়ুধ যুগ (Neolithic age)। এই যুগও বহু সহস্রবৎসর-ব্যাপী ছিল। খৃঃ পূঃ ১৫০০ বা ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপে নব্য-প্রস্তরায়ুধ যুগই বিদ্যমান ছিল, তাহা নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন। এই যুগটি তাহারও প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হয়। এই নব্যপ্রস্তরায়ুধযুগে ইয়োরোপবাসী অসভ্য মানবগণ ভূমির মধ্যে গুহাখনন করিয়া ও তাহার উপর কাষ্ঠ ও তৃণ ইত্যাদির আচ্ছাদন দিয়া তন্মধ্যে বাস করিত, অথবা স্বাভাবিক পর্ব্বত-গুহাদিতেও বাস করিত। এই অসভ্য মানবগণের কোনও শাখা গুহাগুলির আয়তন দীর্ঘ এবং কোনও শাখা গোলাকার করিত। প্রথমোক্ত শাখাকে দীর্ঘ গুহাবাসী (Long-barrow men), এবং শেষোক্তকে গোলাকার-গুহাবাসী (Round-barrow men) বলা হয়। এইরূপ গুহাসমূহ ইংলণ্ডে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অভ্যন্তরে অসভ্য মানবগণ যে সকল দ্রব্য ও চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহাদের সভ্যতারও আভাস পাওয়া যায়। এই অসভ্য মানবেরা নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় বাস করিত, এবং দারুণ শীতনিবারণের জন্য পশুচর্ম্মদ্বারা অঙ্গ আবৃত করিত। সম্ভবতঃ তাহারা যাযাবর পশুপালক ছিল। কৃষিকর্ম্ম একেবারেই জানিত না, এবং মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস অথবা বন্যফলমূল ও অযত্নলব্ধ স্বভাবজাত শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিত। তাহারা অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে পারিত, এবং অগ্নির ব্যবহারও জানিত। অনেক গুহার মধ্যে অগ্নি-প্রজ্জ্বালনের

চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহারা কাঁচা মাংস অথবা অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ভক্ষণ করিত, এবং হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া তাহাদের ভিতর হইতে মজ্জা বাহির করিয়াও খাইত। সম্ভবতঃ তাহারা একশত সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিতেও জানিত। * এই যে অসভ্য মানবজাতি, নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে কেল্ট্, টিউটন, স্লাভ্ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের ভাষা আর্য্য ভাষার সদৃশ ছিল বলিয়া

* "It is believed that the speakers of the primitive Aryan tongue were nomad herdsmen who had domesticated the dog, who wandered over the planes of Europe in waggons drawn by oxen, who fashioned canoes out of the trunks of trees, but were ignorant of any metal with the possible exception of native copper. In the summer, they lived in huts, built of branches of trees, and thatched with reeds ; in winter they dwelt in circular pits dug in the earth, and roofed over with poles, covered with the sods of turf, or plastered with the dung of cattle. They were clad in skins sewn together with bone needles ; they were acquainted with fire, which they kindled by means of fire-sticks or pyrites ; and they were able to count up to a hundred. If they practised agriculture which is doubtful, it must have been of a primitive kind ; but they probably collected and pounded in stone mortars the seeds of some wild cereals either spelt or barley. The only social institution was marriage ; but they were polygamists and practised human sacrifice. Whether they ate the bodies of enemies slain in war is doubtful. There were no enclosure, and property consisted in cattle, and not in land. They believed in a future life ; their religion was shamanastic, they had no idols, and probably no gods properly so-called, they reverenced in some vague way the powers of nature." Taylor's *Origin of the Aryans* pp. 132-133.

অনুমান করা হয়, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহারাই আদিম আর্য্যজাতি, এবং ইহাদেরই মধ্য হইতে দুইটি শাখা এসিয়া মহাদেশের দিকে অগ্রসর হইয়া ইরান ও সপ্তসিন্ধু দেশে আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বাস করিয়াছিল!

কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ-পরম্পরা এবং আধুনিক ভূতত্ত্ব-বিদ্যার সিদ্ধান্ত সমূহের আলোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অমূলক ও অযৌক্তিক। ইয়োরোপে আর্য্যগণের আদিবাসভূমি কখনও ছিল না। তবে ইয়োরোপে আর্য্যভাষার যে চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে, তাহার আলোচনা আমরা পরে করিব। এক্ষণে আমাদের ইহাই স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে প্রাচীন সপ্তসিন্ধুদেশেই আর্য্যগণ স্মরণাতীত কাল হইতে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং সম্ভবতঃ এই দেশই তাঁহাদের আদি-নিবাসভূমি ছিল ও এই দেশেই আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল। সপ্তসিন্ধুদেশ যে লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে বিদ্যমান আছে, এবং এই দেশেই যে প্রাথমিক জীবজন্তুর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হইয়াছিল ও একদল মানবেরও উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন।* সুতরাং এই দেশে আর্য্যমানবের উদ্ভব হওয়া কিছু বিচিত্র বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ঋগ্বেদের বহু প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে অন্যবিধ প্রমাণ-সমূহ আছে, তাহার আলোচনা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে করিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

---

* *Imperial Gazetteer of India,* vol. i. p. 53.

সর্ব্বানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মেহার সর্ব্ববিদ্যাবংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বস্থলীর অন্তর্গত সিংহলদী গ্রাম, নদীয়া জিলা, কাটোয়া লাইনে পূর্ব্বস্থলী-ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হয়, (ই, বি, আর)

আদি বাসস্থান সিংহলদী

আদিপুরুষ কাঞ্চনাচার্য্য দক্ষিণরাঢ়ি।

১। তৎপুত্র বাসুদেব ভট্টাচার্য্য

২। " মেহারবাসী শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, তৎপ্রথমপুত্র আগমাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ইহার বংশধরগণ অন্যত্র।

৩। " ২য় দশমহাবিদ্যা সিদ্ধপুরুষ ঠাকুর সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য্য

৪। " শিবনাথ ভট্টাচার্য্য

৫। " হলধর ভট্টাচার্য্য

৬। " যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

৭। " কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য

৮। " মদনমোহন ভট্টাচার্য্য

৯। " ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী

১০। " রামনাথ ভট্টাচার্য্য

১১। " হরিদেব ভট্টাচার্য্য

১২। " কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য

১৩। " রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৪। " কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৫। " গোবিন্দপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৬। " সিদ্ধসন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

১৭। তৎপুত্র বর্ত্তমান শ্রীশ্রীমেহারেশ্বরী সেবক সর্ব্বানন্দমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য]

মেহার-ত্যাগ

শিবনাথকে এই প্রকার উপদেশানন্তর তিনি যখন পূর্ণসহ ৺কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের ক্রন্দনে তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও করুণার সঞ্চার হইল না। বহু নদী গিরি পর্য্যটন করিতে করিতে চারিদিকে সজলা নদীসকল ও প্রমোদ কাননে বেষ্টিত দ্বারে দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত যশোহর রাজ সভাপণ্ডিতের আলয়ে দ্বিপ্রহর সময়ে ক্ষুধার্ত্ত দুইব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট ছাত্রত্বপ্রার্থি-রূপে নিজের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সাগ্রহে উভয়কে স্থান দিলেন ও যথারীতি বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ স্নান আহারাদি সমাধা করিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং তৎপর দিবস হইতে সর্ব্বানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিলেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন অজ্ঞাত নামা সর্ব্ব শাস্ত্রজয়ী জনৈক পণ্ডিত রাজসভা জয় করিবার জন্য আগত, এই সংবাদ অচিরে সভাপণ্ডিতকে জ্ঞাত করান হইল, এবং পরদিবস তৃতীয় প্রহরে বিচারার্থ দ্বার পণ্ডিতকে আহ্বান করা হইল। সর্ব্বজয়ী পণ্ডিতের বিচার শ্রবণের জন্য বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র পণ্ডিত আসিতে আরম্ভ করিল। রাজপরিষদে বহু শাস্ত্রের বহুপ্রকার গবেষণা আরম্ভ হইল। পরিষদের চতুঃপার্শ্বে লোকে লোকারণ্য, এদিকে সভাপণ্ডিত চিন্তায় চিন্তায় আহার নিদ্রা বর্জ্জিত, অন্যমনা হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন। এমন সময় ছাত্র সর্ব্বানন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, আজ দুই দিবস যাবৎ আপনাকে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ দেখি ইহার কারণ কি" ?

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "বাবা, তুমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক তোমায় আভ্যন্তরিক অবস্থা জানাইয়া কি হইবে"।

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "দেব! আপনার মানসিক অবস্থা অকপটচিত্তে আমায় বলুন। কিছু প্রতিকার হইতেও বা পারে"। পণ্ডিতমহাশয় ছাত্রের কথায় আত্মনির্ভর করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "রাজপরিষদে আপনি এই সংবাদ প্রেরণ করুন, আজ আমার মানসিক অসুস্থতানিবন্ধন বিচারার্থ রাজসভায় যাইব না, কল্য বিচার করিব। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাশয়কে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক।" এরূপ করা হইলে পরিষদের পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে একটা কোলাহল সৃষ্টি হইল, এবং পরস্পরে সমালোচনা হইতে লাগিল, অদ্য বিচার না হওয়ার বিশেষ গূঢ়তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে হইবে। পণ্ডিতগণ অদ্যকার জনসভার স্থান ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

নীরব নিশির দ্বিতীয় যামার্দ্ধে সর্ব্বজয়ী পণ্ডিত, স্বকীয় ইষ্টদেব গণেশের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। আরাধ্যদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,--

"বৎস! তুমি সর্ব্বত্র রাজ পরিষদে বিচারে জয়লাভ করিয়াছ সত্য, কিন্তু এই পরিষদে তোমার জয়লাভ অসম্ভব, সুতরাং তুমি এই মুহূর্ত্তে এই স্থান হইতে লুকাইয়া অন্যত্র প্রস্থান কর।"

পণ্ডিত আরাধ্য দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কেন আমার এ সভায় জয়লাভ হইবে না।"

পার্ব্বতীপুত্র গণেশ বলিলেন, "যে পণ্ডিতের সহিত বাক্য যুদ্ধ হইবে তাহার আলয়ে আমার জননীর পুত্র নিয়ত বাস করিতেছে, তাহার শক্তি অসীম ও দুর্দ্দমনীয়, তাহার নিকট তোমার এ ক্ষুদ্র শক্তি ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে।" তৎপরে দিগ্বিজয়ী স্বীয়দেবতার আদেশ অনুযায়ী অন্যত্র নিরুদ্দেশ হইলেন।

রাজসভায় পণ্ডিত

তমসাচ্ছন্ন নিশিকে বিতাড়িত করিয়া সবিতৃমণ্ডল কনক রেখার ন্যায় উদিত হইতে লাগিল। কুসুম গুচ্ছ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধ প্রবাহিত হইতে লাগিল, রাজবাড়ীর কর্ম্মচারিবৃন্দ একে

একে জাগরিত হইল, বন্দিগণ আসিয়া রাজাকে বন্দনা করিতে লাগিল, ব্রাহ্মণগণ আসিয়া "অমোঘং ব্রাহ্মণাশীষং" বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। এদিকে বিশ্বজয়ী পণ্ডিতকে না দেখিতে পাইয়া পণ্ডিতগণ সভাপতিকে আহ্বান করিয়া এ সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং দ্বার পণ্ডিত মহাশয়ও ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এই সংবাদ মহারাজের শ্রুতিগোচর করিলেন। তৎপর তিনি সামান্য সময়েই পরিষদের কার্য্য সমাধা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ছাত্র সর্ব্বানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, একি ব্যাপার ; এ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লুকাইবার হেতু কি ?" সর্ব্বানন্দ নিঃশব্দ ভাবে রহিলেন। পূর্ণানন্দ, সর্ব্বানন্দের প্রতি যে, শ্রীশ্রীজগদম্বার অপূর্ব্বকৃপাবলী তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা শ্রবণে পণ্ডিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন "আজ আমার জন্ম ধন্য, এ জীবন স্বার্থক, ধন্য আমি যে অজ্ঞাত মহাপুরুষ এ দরিদ্রের গৃহে কৃপা করিয়াছেন।" পণ্ডিত বলিলেন ! "বাবা ! সর্ব্বানন্দ তুমি আমার ছাত্ররূপে শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়াছ।" সর্ব্বানন্দ বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ,—

পণ্ডিত বলিলেন, "আমার একটি আদেশ তোমায় রক্ষা করিতে হইবে"।

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "আদেশ করুণ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিব।"

পণ্ডিত বলিলেন, "আমার একমাত্র দুহিতা "স্বয়ম্প্রভার" পাণিগ্রহণ করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিতে হইবে।"

সর্ব্বানন্দ বলিলেন, "তথাস্তু"।

তৎপর শুভদিনে শুভ সময়ে মহাসমারোহে সর্ব্বানন্দ স্বয়ম্প্রভার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং সামান্য কিছুকাল তাহার সহিত বাস করতঃ তাহার নিকট বিদায় নিয়া বারাণসী অভিমুখে গমন করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়

৺কাশীধাম

বর্ষাসমাগমে জাহ্নবী দ্রুতবেগে সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত হইতেছেন।

জনমানবের দুঃখ কষ্টের প্রতি তাকাইতেছেন না। মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টিত সুশীতল স্বচ্ছতোয়া সুরধনি। চারিদিকে বিটপীশ্রেণী মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত জনকে সুশীতলছায়া বিতরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সন্ধ্যারতিতে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত রমণীয় বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা, দেখিলে মনে হয় শিবের দ্বিতীয় কৈলাস-পুরী। চারিদিকে সন্ধ্যারতিতে বেদগানে মুখরিত হইতেছে ও নিঃশব্দে সহস্র সহস্রভক্ত অশ্রুবিগলিত নেত্রে বিশ্বনাথের দিকে তাকাইয়া আছে। সাধনার অপূর্ব্ব শক্তি দেহে সঞ্চারিত হইতেছে। কাশীধামে সাধক সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা সর্ব্বানন্দ সভৃত্য উপস্থিত হইলেন। মণিকর্ণিকায় অবগাহন করিয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের চরণে ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ণকরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। এই প্রকারে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তিনি ভৃত্য পূর্ণকে আদেশ করিলেন, "এখানে মধ্যাহ্ন কৃত্য করিবার জন্য, অদ্য দণ্ডী স্বামিগণকে নিমন্ত্রণ কর"। ভৃত্য তদনুযায়ী কার্য্য করিল। বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইবার প্রাক্‌কালে সমবেত দণ্ডিমণ্ডলী স্ব স্ব আসন ও কমণ্ডলু হস্তে সর্ব্বানন্দ আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগকে যথারীতি পাদ্যার্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশনের জন্য নিবেদন করা হইল এবং তাঁহারাও যথারীতি আসনগ্রহণ করিলেন। তামসিক আহারীয় দ্রব্যাদি তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করা হইলে, তাঁহারা অতি বিরক্তি বোধ করিয়া স্ব স্ব আসন ত্যাগ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। কারণ দণ্ডিগণ সাত্ত্বিক আহার করেন, তাঁহারা তামসিক ও রাজসিক আহারের বিদ্বেষী।

দণ্ডীদের ক্রোধের কারণ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর জ্ঞাত হইয়া পরদিবস দণ্ডীদের জন্য সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করিয়া পুনর্ব্বার নিমন্ত্রণ করিলেন। দণ্ডিগণও তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, এবং যথা সময়ে ভোজনের জন্য উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া যথা স্থানে বসিবার জন্য অনুনয় করা হইল। তাঁহারা তদনুযায়ী নিজ নিজ স্থানে বসিলে পর, সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করা হইল। তাঁহারা যথারীতি

ভোজন আরম্ভ করিলেন, এবং ক্রমশঃই সাত্ত্বিক আহারাদির দ্রব্য তামসিক দ্রব্যে পরিণত হইতে লাগিল, ইহাতে দণ্ডিগণ দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন। পরদিন পুনরায় দণ্ডীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহারা ক্রোধ বশতঃ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করিলেন। তৎপর স্ব স্ব আশ্রমে যখন তাঁহারা সাত্ত্বিক আহারীয় জিনিষ ভোজন করিতেছেন ইতি মধ্যে খাদ্যদ্রব্য সকল তামসিক আহার্য্য হইয়া গেল, এই ভাবে ছয়মাস কাল দণ্ডিগণ ভোগবিরত হইয়া মোক্ষধাম (যেন তেন প্রকারে মরিলে পাইবে মুক্তি, ইহা শিবের উক্তি) পরিত্যাগ করতঃ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। উক্ত ঘটনা হইতেই দণ্ডিগণ ৺কাশীধাম ত্যাগ করেন, ইহার পূর্ব্বে কখনও তাঁহারা বারাণসী হইতে স্থানান্তরিত হন নাই। দণ্ডীদের মধ্যে কেহ হরিদ্বার কেহ বা বদরিকাশ্রম কেহ অন্যান্য তীর্থে গমন করিলেন। জনৈক দণ্ডী চন্দ্রশেখর গমনোদ্দেশ্যে মেহার দাস রাজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় আতিথ্যগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া দ্বারস্থ প্রহরীকে বলিলেন, "প্রহরী, তুমি মহারাজকে আমার সুদূর বারাণসী হইতে আগমন বার্ত্তা জানাইয়া আইস।"

প্রহরী, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, মহারাজকে বলিল, "বারাণসী হইতে ব্রহ্মচারী আগত, রাজদর্শন প্রার্থী"।

মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা আসিতেছি"—এই বলিয়া প্রহরীর পশ্চাৎ যাইয়া দণ্ডী স্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারিন্! বারাণসী ত্যাগ করিয়া এ সুদূর বঙ্গদেশে আসিবার কারণ কি" ?

দণ্ডী বলিলেন, "বঙ্গীয় বীরাচারী এক বিপ্রই আমাদের কাশী ত্যাগের প্রধান কারণ"।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি করিয়াছেন" ?

দণ্ডী বলিলেন, "মনে হয় অপূর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হইয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যই আজন্ম কাশীবাসী দণ্ডীদিগকে তাড়িত করিয়াছে", এবং নিমন্ত্রণাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপর ঘটনা সমূহ বিস্তারিত বিবৃত করিলেন।

রাজা বলিলেন, "প্রভু! আপনি এই নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করুণ,

তিনি দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ আমার গুরুদেব, তিনি যদি কোনও অন্যায় করিয়া থাকেন তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। তখন দণ্ডী বিস্মিত হইয়া রাজাকে বলিলেন, "আপনার গুরুদেবের সিদ্ধি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিজকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি"। মহারাজ ঠাকুর সর্ব্বানন্দের সিদ্ধি বিবরণ দণ্ডীকে শ্রবণ করাইলেন। দণ্ডী তাহা শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রশেখর যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া মহারাজের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন, এবং সর্ব্বানন্দ দর্শনেচ্ছু হইয়া তৎ পরদিবস ৺কাশীধাম গমন করিলেন। ইত্যবসরে সর্ব্বানন্দদেব সভৃত্য গঙ্গোত্তরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দণ্ডী স্বামী বহুস্থান অতিক্রম করিয়া তথায় পৌঁছিয়া মহাত্মাকে আর দেখিতে পাইলেন না। হিমাদ্রি হইতে গঙ্গাবারি প্রবাহিত হইতেছে। হরিদ্বর্ণের বৃক্ষরাজি পরিশোভিত সুবৃহৎ মৎসগণ গঙ্গাজলে অহরহক্রীড়া করিতেছে। ইতিমধ্যে গঙ্গোত্তরী পৌঁছিয়া ঠাকুর সর্ব্বানন্দ কিছুদিন তপশ্চরণ করিয়া স্বেচ্ছায় নশ্বর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

বিদায়

অনেক সর্ব্বানন্দ বংশধর, স্বেচ্ছানুযায়ী গুরু অন্বেষণে বহির্গত হইয়া হিমালয়ের বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে প্রস্রবণের তীরে জটাজূট মণ্ডিত ধ্যান স্তিমিতনেত্রে এক মহাপুরুষকে সমাসীন দেখিয়া নিঃশব্দে তাহার নিকট বহু সময় বসিয়া রহিলেন। তৎপর তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! এত অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বানন্দ বংশে দীক্ষা গুরুর অভাব হইল? যাহা হউক তুমি এই ঝরণায় স্নান করিয়া আইস"। তৎপর তিনি ঐ সন্ন্যাসী হইতে দীক্ষাগ্রহণান্তর পূর্ব্ব স্থানে গমন করিলেন। কিছু দূর যাইয়া মনে করিলেন, "কে, আমায় দীক্ষা দিলেন!" পুনরায় তথায় যাইয়া কাহাকেও আর দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য, সামবেদাচার্য্য শাস্ত্রী

পল্লী-ছবি

সারাদিন ধরি গগনের মাঝে,
আলোকের খেলা করিয়া শেষ।
সাঁঝের বেলায় চলে দিনমণি,
ক্লান্ত শরীরে আপন দেশ।
গ্রামের পথটি আঁধারে ঢাকিছে,
ছেলেরা চলিছে আপন ঘর।
প্রদীপ জ্বালিয়া কে রেখে দিয়েছে,
আলপনা দেওয়া হওয়ার পর।
বধূটি চলিছে ঘোমটায় ঢাকি,
কলসী ভরিয়া লইয়া জল।
সোপান বহিয়া উঠে ধীরে ধীরে,
চরণে তাহার বাজিছে মল।
গগন সাজিল নূতন শোভায়,
পোরে নীল শাড়ী হীরার ফুল।
জ্বলিল আকাশে হীরক প্রদীপ,
আর নাহি হবে পথের ভুল।
খেয়া তরী খানি বাহিয়া এখনি,
আসিবে সবারে করিতে পার।
বলিবে, 'কে যাবি আয় ত্বরা করি,
নাহি কোন ভয় ভাবনা আর'।

শ্রীসুনয়নী দেবী

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্থান—কাশী রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম

১০ই জুলাই ১৯২০, অপরাহ্ন।

মহারাজ গান গাচ্ছিলেন—'সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।' কিছুক্ষণ গেয়ে বল্লেন, এ ভাবটা আজকাল বড্ড ভাল লাগছে। যতই দিন যাচ্ছে, এ ভাবটা ততই ভাল লাগছে। ভাল মন্দ সবই তুমি। তোমাব ইচ্ছায় ভালমন্দ সব হচ্ছে। তিনি যাকে উঠাবেন—তাকে দিয়ে খুব ভাল কাজ করিয়ে নেন—আবার যাকে ফেলবেন তাকে দিয়ে খারাপ কাজ করিয়ে নেন। * হাতীকে পাঁকে আটকিয়ে দাও—আবার পঙ্গুকেও লঙ্ঘাও গিরি।

মন বেচারীর কি দোষ আছে,
বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচাও তেমনি নাচে।

এটা ভাবতেও সুখ যে একটা শক্তি এর পেছনে আছেন—যিনি সব চালাচ্ছেন। যুক্তিবাদীরা কিন্তু ওসব কথা মানবে না। তারা বলবে, কারণ না থাকলে কি কার্য্য হয়। কিন্তু ওরা আবার পাল্টে বলবে, তিনি যে কাবণেরও কারণ।

পূর্ব্বে আমিও ওভাব স্বীকার করতুম না। খুব তর্ক করেছি। লাটু মহারাজের সঙ্গে খুব তর্ক হত। আমি যখন বলতুম যে, যদি ভগবান্ যা খুসী তাই করেন, তা হলে ত তিনি খামখেয়ালী হয়ে গেলেন। তিনি কি দুনিয়ার জীবের মত যথেচ্ছাচারী নাকি? তিনি ন্যায়বান্, দয়ালু, মঙ্গলময়। লাটু মহারাজ বলতেন, 'ছে ভাল,

---

* কৌষীতকী উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্যে উক্তরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে।
এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥

তুমি তোমার ভগবানকে ছে সব দোষ থেকে রক্ষা করছ, ছে বেশ ভাল।' দেখ একবার, কি চমৎকার বলতেন। ওদিক থেকে বলছেন কি না। যুক্তির দিক্ দিয়ে কিন্তু অনেক তর্ক এসে পড়ে। Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) সে উড়িয়ে দিলে। যখন কেবল বাচনিক জ্ঞান হয়েছে তখন ওরকম হলে মুস্কিল। এর পরথ হচ্ছে বেতালে পা পড়বে না।

ছোটকালে পুতুলনাচ দেখতে গিয়ে যখন দেখতুম হয়ত একটা পুঁতুল ক্যাঁ করে উঠল, তখনই মনে হত, সত্যি সত্যি ওরা শব্দ করছে, আর আপন ইচ্ছামত নাচছে। কিন্তু শেষে দেখলাম, ওমা ওযে আড়াল থেকে আর একজন নাচাচ্ছে।

আজকাল মহামায়ার ইচ্ছায় সব হচ্ছে, এই ভাবটা বড্ড ভাল লাগছে। কি চমৎকারই মনে হচ্ছে। মনটা মেনে নিয়েছে কিনা, তাই এখন ওরকম হচ্ছে। স্বামিজীও শেষ বয়সে মহামায়ার ওপর খুব বিশ্বাস করতেন। যন্ত্রচালিতবৎ হয়ে যাওয়া—মুখে বললেই ত হল না। মহামায়ার অনুগত থাকলে তিনি রক্ষা করেই থাকেন। বয়স হয়ে গেলে একটা সময় আসে যখন কার্য্য কারণের দিক্ দিয়ে না গিয়ে মহামায়ার উপর নির্ভর এসে যায়।

গোবিন্দ—গোবিন্দ! ভগবান্! ভগবান্!

১১ই জুলাই ১৯২০, রবিবার।

আজ লোক সমাগম অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে। মহারাজ কথায় কথায় মানবপরিবারের কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—সত্যযুগ কখন হবে কি না হবে তার ঠিকানা না থাকলেও আদর্শটা মন্দ নয়। কবি বলেছেন তখনই জগতে এরকম সম্ভবপর হতে পারে যখন 'পুরুষ হইবে নারী প্রকৃতি সমান।' সুরেন্দ্র মজুমদার খুব লিখেছেন—ভারি চমৎকার ওঁর লেখা। তোমরা ত হাসছ, আমি কিন্তু ছোট বেলায় পড়িছি, আমি ত হাসিনি।

মহারাজ—এতে মেয়েদের কোমলভাবের কথাই বলছে। ভক্ত—নির্বীর্য্যতার কথা বুঝাচ্ছে না ত।

স্বামী তু—নিশ্চয়ই—তার কি আর ভুল আছে। কবি বলছেন—"ভারবাহী পুরুষের এত অহঙ্কার!" তারা ত ভার বয়ে বয়ে মরে। স্ত্রীলোকের মত হওয়া কি সহজ?

ভক্ত—মহারাজ, মেয়েরা নরকের দ্বার প্রভৃতি কথা ত সকলেই বলে থাকে। কিন্তু ওরা যদি লিখত তাহলে পুরুষেরা নরকের দ্বার ওরাও খুব লিখতো।

স্বামী তু—তাত করচেই—ঐ দেখছ না, ওসব দেশে কি ছেড়ে দিচ্ছে? শাস্ত্রও সকল স্ত্রীকে লক্ষ্য করে কিছু বলেন নি। বিদ্যাস্ত্রী অবিদ্যা স্ত্রী তফাৎ করেছেন। ঠাকুরও ওরকম বলতেন। যে স্ত্রী সর্ব্বদা বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই অবিদ্যা স্ত্রী। আর যে স্ত্রী ভগবানের দিকে যেতে সাহায্য করছে সে বিদ্যাস্ত্রী। অবিদ্যা স্ত্রীর ওপরই এসব কথা বলেছেন। কেবল বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া কি ভাল?

তাই শাস্ত্র বলছেন—'স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরতঃ' অবস্থান করতে। দেখনা সঙ্গদোষে কি হয়ে যায়। যখন আমরা স্কুলে পড়তুম তখন কতকগুলি ছেলে বাড়ী ফেরবার কালে মাতালের ভাণ করে গুলির আড্ডায় ঢুকত। মাতাল দেখলে গুলিখোরদের ভারি ভয়। ওরকম করতে করতে একজন ভারি গুলিখোর হয়ে গেল। দেখনা কি কাণ্ড!

সংস্কার একবার পড়ে গেলে সে কি যেতে চায়? সংস্কার কাকে বলে, আর তা কত ভয়ানক। কখনও কখনও নিদ্রাবস্থায় এই সংস্কারের অদ্ভুত কার্য্য দেখা যায়, একে ইংরাজীতে সোমনাম্বুলিজম্ (Somnambulism) বা স্বপ্ন সঞ্চরন বলে। একবার স্বামিজী এ বিষয়ে অনেক গল্প করছিলেন। একটা বিবি কবর খুলে ঘুমের ঘোরে জিনিষপত্র এনে বিছানার তলে রাখত—ঘুম ভেঙ্গে গেলে কিছু জানত না। একটি মেয়ে অক্ষরজ্ঞানও নেই, সে দিব্যি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিত। আমাদের দেশে হলে বলত অপদেবতা পেয়েছে। ওদের দেশ কি না, গবেষণা আরম্ভ হলো। শেষে জানা গেল

১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে মেয়েটি এক বৈজ্ঞানিকের বাড়ীর চাকরাণী ছিল। সেই বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা দেওয়ার ও জোরে পাঠ করার অভ্যাস ছিল। কার্য্যকারণ ঠিক হয়ে গেল।

কলকাতায় খুব একটি ভালছেলে—চরিত্রবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ছেলে,—খারাপ মেয়েদের ভাল করবে বলে কাজে লাগল। শেষে একটা মেয়ে ওর কাছে তার দুঃখের কথা বলে ওকে গলিয়ে দিলে। শেষে ও মেয়েটা ওর ঘাড়ের উপর এসে পড়ে গেল। সাহস কত্তেই নেই—কে জানে বাবা কখন পটকে দেবে।

আমি আর একটি ঘটনা জানি তা অতি আশ্চর্য্য। এ বইয়ে পড়া কথা নয়—এ একেবারে দেখা কথা। একজন বাঙ্গালী সাধু খুব ত্যাগী—বি এ পাশ স্বামিজীর সঙ্গে একত্র পড়ত। সে সম্পর্কে আমাদের সঙ্গেও ভাব ছিল। ওর খুব অহঙ্কার ছিল, আমি কামজিৎ হয়েছি এই ভাব। কারও গণোরিয়া, কুষ্ঠ ইত্যাদি হলে ভিক্ষা করেও শুশ্রূষা করত। আমাদিগকে বলত এক স্বামিজীর মাথা আছে, তোরা সাধু হতে পারিস্, তোদের কারও মাথা নেই। শাস্ত্রাদি মানত না, বলত, আমরা যদি লিখি তাও শাস্ত্র হবে। খুব তর্ক করত। লোকটা খুব সাহসী ছিল। লোকে তাকে খুব বাড়িয়ে দিলে। গুণও বহু ছিল। একবার এলাহাবাদে ওর সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে তার পতনের কথা খুলে বল্লে। আমি বললাম—কি কল্লিরে শালা এই শেষ বয়েসে। দেখ কি কাণ্ড, লজ্জা সঙ্কোচ নেই—সব কথা আমাকে বলে দিলে। একটা মেয়েমানুষ জোর করে এসে এই সব কাণ্ড করলে। আমিও ভাবলুম আমার কাম হবে না তারপর এই হয়েছে। আমি বল্লাম, আরে শালা, ওকে দূর করে দিতে পাল্লি না? অহঙ্কারেই ওর পতন হল। এসব ব্যাপারে সাহস দেখান একদম উচিৎ নয়। এর জন্যই ত বলেছে—'স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গংত্যক্ত্বা দূরতঃ'।

পৌরাণিকী

গণেশ

গণেশ ছোট খাট মোটাসোটা বালকটি; হাতীর মত মুখ, উদরটি দীর্ঘ, কপাল থেকে মদ জল গড়িয়ে পড়ছে, তার সৌরভে আকুল হয়ে ভ্রমরেরা তার গণ্ডস্থলের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। দাঁতের ঘায়ে অরিকুল নাশ করায় তাঁর দেহ তাই সিন্দুরের শোভা; পূর্ব্ব বা পশ্চিমগগনে লাল সাদা মেঘের খেলা দেখলে দিক্‌গজদের অধিপতি গণেশের ধারণা হবে। ইনি বড় সুন্দর দেবতা, ইঁহার শরীরে ক্রোধের লেশমাত্র নেই। ইঁহার আরাধনা করলে বিঘ্ন বিনাশ হয় সিদ্ধিলাভ হয়। এঁর চারখানি হাত, তিনটি নেত্র, ইঁদুর ইঁহার বাহন। আমাদের দেশের কৃষক মহিলাদের বিশ্বাস, বিজয়ার দিন গণেশ ঠাকুরের পায়ে ইঁদুর মাটি দিলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয়।

একদিন নারায়ণ নারদকে একটি মালা উপহার দেন। নারদ সেই মালাটি নিয়ে হরিগুণ গাইতে গাইতে ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, দেবরাজ তাঁর শ্বেত হস্তীর সঙ্গে খেলা করছেন। নারদকে দেখে তিনি সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করতেই তিনি তাঁকে ভগবানের প্রসাদী মালা উপহার দিলেন। ইন্দ্র সেই মালাটি হাতীর দাঁতে পরিয়ে দিলেন এবং তার শোভা অতি সুন্দর হল। নারদ তাই দেখে চটে গিয়ে বললেন, "মূর্খ, ভগবানের প্রসাদী মাল্য আমি তোমায় দিলুম, আর তাই তুমি হাতীর দাঁতে পরালে; ঐ হাতীই তোমার চাইতে বড় হবে"।

এদিকে হরগৌরী অবতারে গৌরীর গর্ভে গণেশের জন্ম হল। সকল দেবতা পার্ব্বতী নন্দনকে দেখতে এলেন, কিন্তু শনি দেবতার দৃষ্টিতে তার মাথা উড়ে গেল। বিষ্ণু বললেন, "উত্তর দিকে যে শুয়ে আছে তার মাথা কেটে আন, এনে জুড়ে দাও"। এখন উত্তর দিকে শুয়েছিল সেই

হাতী। শনির এতে কোনও দোষ ছিল না। শনি স্ত্রীর অভিশাপে যার দিকে তাকাত তাই ভস্ম হয়ে যেত। সেই ভয়ে শনি ঠাকুর কৈলাস পুরীর মধ্যে ঢুকলেন না। দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "শনি কোথায়? এত বড় স্পর্দ্ধা তার, সেকি আমার নেমতন্ন অগ্রাহ্য করলে"? শিব ঠাকুর জেনেও ভয়ে ভয়ে শনিকে ভেতরে আনতে আদেশ করলেন। কাজেকাজেই গ্রহরাজ পার্ব্বতীর কাছে গিয়ে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "অধোবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন"? শনি সব কথা খুলে বললেন, কিন্তু পার্ব্বতী অগ্রাহ্য করায়, তাঁকে গণেশ দেখতে হল। দেখা মাত্রই তাঁর মাথা উড়ে গেল, বিষ্ণু তখন সেই শ্বেত হস্তীর মাথা জুড়ে দিলেন। দিলেন বটে কিন্তু দেবতারা সকলেই মনে ভীত হয়ে পড়লেন পাছে দেবী তাঁর পুত্রের বিরূপ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে শনিকে বধ করেন, তাই তাঁরা করজোড়ে দেবীর নিকট অগ্রসর হয়ে বললেন, "মা আমরা আপনার পুত্রকে এই বর দিচ্ছি যে তাঁর পূজা আগে না হয়ে অন্য কোনও দেবতার পূজা সিদ্ধ হবে না"।

একদিন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করে, হরগৌরীকে নমস্কার করবার জন্যে কৈলাসে গেলেন, সে সময় তাঁরা নিদ্রা যাচ্ছিলেন। নিদ্রা বিঘ্ন যাতে না হয় সে জন্য গণেশ দ্বারে পাহারা দিচ্ছিলেন। পরশুরাম এসে বললেন, "আমি গুরুর দর্শন চাই"। গণেশ বললেন, "তাঁরা এখন নিদ্রিত, আমি রাস্তা ছাড়তে পারব না। আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুণ, তাঁদের নিদ্রা ভাঙ্গলে আমি আপনাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব"। দুজনেই দুজনকে মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিতে লাগলেন, শেষকালে পরশুরাম জোর করে ভিতরে ঢুকতে গেলেন। গণেশ দুহাত দিয়ে তাঁকে বাধা দিলেন, পরশুরাম তবুও শুনলেন না। তখন গণেশ তাঁকে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। পরশুরাম তখন শিব প্রদত্ত পরশু গণেশের উপর নিক্ষেপ করলেন কিন্তু গণেশের তাতে কিছুই হলনা, কেবল একটা দাঁত ভেঙ্গে গেল। এদিকে কোলাহল শুনে হরপার্ব্বতীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁরা বাইরে এসে দেখলেন গণেশের একটা দাঁত ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। দেবী

সব ব্যাপার বুঝতে পেরে শূল নিয়ে পরশুরামকে মারতে গেলেন। মহাদেব তাঁকে বারণ করলেন, বললেন, "গণেশ যেমন পুত্র, শিষ্যও তেমন পুত্র। অতএব তুমি পুত্র বুদ্ধিতে পরশুরামকে ক্ষমা কর"। এই রকম নানা কথায় প্রবোধ দিতে ভগবতীর ক্রোধ শান্ত হল। গণেশের সেই থেকে নাম হল একদন্ত। অক্রোধ গণেশ তাতে কিছু মাত্র দুঃখিত না হয়ে সেই দন্তটিকে তুলে নিয়ে নিজের যোগ-দণ্ড করে নিলেন।

একদিন মায়ের গলার হার নিয়ে কার্ত্তিক গণেশে ঝগড়া বাধল। দুইজনেই বলেন, 'ঐ হার ছড়াটা আমি পরব'। তখন দেবী বললেন, তোমাদের মধ্যে সব আগে যে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসতে পারবে, ঐ হার ছড়াটি সেই পাবে"। শুনে কার্ত্তিক তখুনি ময়ূর চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু মন্থর গতি গণেশ মাকে প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করে বললেন, "মা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই তোমার দেহে, তোমাকে প্রদক্ষিণ করা মানেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করা, অতএব হারটি আমাকে দাও"। দেবী ঈষৎ হাস্য করে গণেশকে হারটি পরিয়ে দিলেন এবং ক্রোড়ে নিয়ে চুম্বন করলেন।

আর একদিন গণেশ একটি বেড়ালীকে অত্যন্ত প্রহার করেন। এসে দেখলেন মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। তাই দেখে গণেশ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "মা তোমার এ দশা কে করেছে? দেবী বললেন "তুমি কি জান না সমস্ত স্ত্রী শরীরই আমার শরীর। যে বিড়ালীটিকে আঘাত করেছ তার সমস্ত আঘাতই আমার গায়ে লেগেছে।" শুনে গণেশ ম্রিয়মান হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

গণেশ একজন প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। মহাভারতে আছে সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব যোগবলে বিপুলায়তন মহাভারত মনে মনে রচনা করলেন। কিন্তু লেখকের অভাবে তা জনসমাজে প্রচার করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর একদিন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে এসে বললেন, "তুমি গণেশকে ঠিক কর"। ব্যাসদেব গণেশকে অনুরোধ করায় গণেশ বললেন, "তোমাকে অনর্গল বলে যেতে হবে, এবং আমিও অনর্গল লিখে যাব। যদি তুমি থাম তাহলে কিন্তু আমি উঠে চলে যাব"। ব্যাস

দেব বললেন, "আমি অনর্গল বলে যাব বটে কিন্তু তোমায় প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ বুঝে লিখতে হবে"। গণেশ লিখতে আরম্ভ করলেন। ব্যাস যখন দেখতেন যে রচনা আর তাঁর মনে উদয় হচ্ছে না, তখন একটা কূট শ্লোক বলতেন। গণেশের তা বুঝতে অনেক দেরী হত এবং ব্যাস সেই অবসরে অনেক শ্লোক রচনা করে ফেলতেন। এই ভাবে ব্যাসদেব গণেশকে দিয়ে সারা মহাভারত খানা লিখিয়ে নেন।

দক্ষিণদেশে গণেশ পূজার খুব চল। ভাদ্রপদী চতুর্থীতে গণেশের পূজা হয়ে থাকে।

শ্রী—

শৈশব

দিবা অবসান হলে আঁধার ঘিরিলে পরে—
পূরবে গমনশীল পথিক যেমন,
অস্তমিত ভানু পানে চাহি অনুক্ষণ—
পশ্চাতের রশ্মি হেরি আনন্দে মগন।
সেইরূপ সুখদিন হইলে অতীত—
আঁধার আসিয়া যবে করে গো আবৃত—
শৈশবের সুখ স্মৃতি করিয়া স্মরণ
পুলকে পূরিত হয় মোদের জীবন।

শ্রীঅরবিন্দ ঠাকুর

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা-পদ্ধতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বিশেষ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" (ক), শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। যে শিষ্য শুশ্রূষা পরায়ণ নহে, যে অসূয়াকারী, কুটিল ও অসংযত তাহাকে বিদ্যাদান নিষিদ্ধ ছিল। "বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যা মুষরে বপেৎ"(খ), বরং বিদ্যার সহিত মরিয়া যাইবে তথাপি ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের ন্যায় অপাত্রে বিদ্যা অর্পণ করিবে না। মনুসংহিতার একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থিত করা হইয়াছে ;—"বিদ্যা অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিতেছেন আমি তোমার নিধি, আমাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিও অশ্রদ্ধাদিদোষ-দূষিত অপাত্রে আমাকে অর্পণ করিও না, তাহা হইলেই আমি অতিশয় বীর্য্যে বর্ত্তমান থাকিব।

যাহাকে সর্ব্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে তাহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিও।(গ) সংহিতাকার অত্রি বলেন, "যদি গুরু একটি মাত্র অক্ষরও শিখাইয়া থাকেন, তথাপি পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা অর্পণ করিয়া শিষ্য ঋণ মুক্ত হইতে পারে।(ঘ) সংহিতাকার বিষ্ণু বলেন, জনক ও আচার্য্য—এই দুই জনের মধ্যে আচার্য্য পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যেহেতু ব্রহ্মজন্মই ইহপর উভয় লোকে

(ক) গীতা ৪।৪০

(খ) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ

(গ) মনু ২।১১০-১১৫

(ঘ) অত্রি ১।৯

স্থায়ী।(ক) প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতে আনুগত্য ও শুশ্রূষা দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধান জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। মনু বলেন, খনিত্র দ্বারা খনন করিতে করিতে মনুষ্য যেমন জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শুশ্রূষা করিতে করিতে শিষ্য গুরুগত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকেন। (খ) মহাভারতের আরুণি, উপমন্যু ও একলব্যের চরিত্রে আমরা গুরুর প্রতি একান্ত ভক্তি ও আজ্ঞাবহতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাঁহারা গুরু শুশ্রূষা ও আনুগত্য দ্বারা তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিয়া বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশ পালনের জন্য তাঁহারা অনেক শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।(গ)

গুরু ও শিষ্যের আচরণ

শিষ্য গুরুর পরিবার ভুক্ত হইয়া থাকিত। তাহাকে গুরুর গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হইত। বিদ্যার্থী আচার্য্যের পূজার্চ্চনাদির জন্য পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ আহরণ করিত।(ঘ) তাহাকে জলকুম্ভাহরণ, কাষ্ঠ সংগ্রহ ও গো-গ্রাস প্রদান করিতে হইত।(ঙ) মহাভারতে দেখিতে পাই, আরুণি স্বীয় গুরু আয়োদ ধৌম্যের ক্ষেত্রের কেদার বন্ধন করিয়া দিতেছে; উপমন্যু সারাদিন গরু চরাইয়া সন্ধ্যায় গুরুকুলে ফিরিয়া আসিতেছে।(চ) প্রথম অবস্থাতেই শিষ্যকে এ সকল কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু শিষ্য যখন গভীরতর বিষয়ের অধ্যয়নে নিযুক্ত হইত তখন তাহাকে এ সকল গৃহকর্ম্মাদির দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হইত।(ছ)

শিষ্যকে প্রত্যহ গুরুর অগ্রে উত্থান এবং গুরুর পশ্চাৎ শয়ন করিতে

(ক) বিষ্ণু ৩০।৪৪
(খ) মনু ২।২১৮
(গ) আদি—১৩২ অধ্যায়
(ঘ) মনু ২।১৮২
(ঙ) হারীত সংহিতা ৩।২
(চ) আদিপর্ব্ব-পৌষ্য—৩য় অধ্যায়
(ছ) নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৯

হইত। তাঁহার সহিত সম্ভাষণ, তাঁহার আদেশ শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপারে শিষ্টাচারের নিয়ম সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলিতে হইত। মনু বলেন, গুরু যদি আসনে বসিয়া আজ্ঞা করেন, শিষ্য উত্থিত হইয়া তাঁহার সেই আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। গুরু উত্থিত অবস্থায় আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েক পদ গমন করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবে। শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরুর অপেক্ষা অনুন্নত হইত।

বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত। শাস্ত্রকার বলেন, যেখানে গুরুর আচরণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়, শিষ্য হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে।(ক)

বিদ্যার্থীকে আচার্য্যের সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে হইত, তাহাকে তাঁহার সকল বিদ্যা শিখাইতে হইত। কোন কিছু গোপন রাখা নিষিদ্ধ ছিল।(খ)

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ আচার্য্য ও শিষ্যের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার বিষয়ে যেরূপ বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণও সেরূপ করিয়াছিলেন। জাতকে দেখিতে পাই, উচ্চবংশ সম্ভূত ছাত্র শিক্ষকের জন্য জল আনিতেছে, কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে, রন্ধন করিতেছে, আবশ্যক অনুযায়ী সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া শিক্ষকের পদ-সেবা করিতেছে। মহাবগ্‌গে গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।(গ) তাহা হইতে জানা যায় যে বিদ্যার্থী শিষ্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আচার্য্যের প্রাতঃকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দিত। আচার্য্যের পরিচ্ছদ ও ভিক্ষাপাত্র প্রস্তুত করিয়া আবশ্যক হইলে তাঁহার অনুগমন করিত। আচার্য্য ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে শিষ্য জল আনিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া দিত। মহাবগ্‌গে আরও দেখিতে পাই।

(ক) মনু ২।১৯১—২০৪
(খ) আপস্তম্ব ১।২।৮
(গ) মহাবগ্‌গ ১,২৫

গুরু কোন কারণে উন্মার্গগামী হইলে শিষ্য তাঁহাকে সদ্ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া ভগবান তথাগতের পথে ফিরাইয়া আনিতেছে। গুরু হয়ত কোন অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে তাঁহার উপর কোন রূপ গুরুতর শাস্তি বিধান না করে অথচ তাঁহার যথোচিত শিক্ষা হয় শিষ্য সেজন্য চেষ্টা করিতেছে।

চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং (I—Tsing) ৬৭৩—৬৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন,—"শিষ্য রাত্রির প্রথম ও শেষ যামে গুরুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হয়। শিষ্যের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির জন্য গুরু অতিশয় যত্ন নিয়া থাকেন। শিষ্য গুরুর অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দেয়। কাপড় চোপড় গুছাইয়া রাখে এবং গৃহ প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া থাকে। গুরুর গৃহকর্ম্ম শিষ্যই সম্পাদন করিয়া দেয়। শিষ্যের পীড়া সময়ে গুরু তাহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় শুশ্রূষা করেন এবং আবশ্যক ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।(ক)

গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে জৈন শাস্ত্র বলেন, গুরুর অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করিবে না। বাক্যে বা কার্য্যে কদাচ তাঁহার প্রতি অসম্মানের ভাব দেখাইবে না।(খ)

দুর্বিনীত ছাত্রের সম্বন্ধে জৈন শাস্ত্রের অনুশাসন এই—"যে দুঃশীল, গুরুদ্বেষী, বাচাল, অমিতভাষী তাহাকে পূতিকর্ণী কুকুরীর মত বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য।"(গ)

(৪)

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিধি

—দণ্ডবিধান—

আচার্য্য শিষ্যকে অতিশয় নম্রবাক্যে মধুর ভাবে শিক্ষাদান

(ক) I-Tsing (Takakuu's translation) P. 120.
(খ) পৃথিবীর ইতিহাস—ষষ্ঠ ভাগ ১৫৩
(গ) ঐ ৮১

করিতেন। শাস্তির আবশ্যক হইলে মৃদু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মনু বলেন, "অতি তাড়না সহকারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে না।"(ক) গৌতম বলেন, "শিষ্যকে কোন প্রকার আঘাত না করিয়া শাসন করিবে; তাহাতে অশক্ত হইলে অতি মৃদু, দলশূন্য বংশখণ্ড অথবা রজ্জু দ্বারা আঘাত করিবে।"(খ) অন্য বস্তু দ্বারা আঘাতকারী আচার্য্যকে রাজা দণ্ড প্রদান করিতেন। মনু বলেন, "রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে—কদাচ উত্তমাঙ্গে আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্ত্তা চোরের ন্যায় অপরাধী হইবেন।"(গ) আপস্তম্বকার এতদপেক্ষা মৃদু শাস্তির বিধান করিয়াছেন। ভয় প্রদর্শন, উপবাস, শীতলজলে স্নান করান, আচার্য্যের সান্নিধ্য হইতে নির্ব্বাসন—এই সমস্ত দুর্বিনীত শিষ্যের শাস্তি। জাতকের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে বৌদ্ধ যুগেও দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। জনৈক রাজকুমার কোন অপরাধের জন্য তদীয় অধ্যাপক কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াছিলেন।(ঘ)

অধ্যয়ন বিধি

অধ্যয়ন কালে শিক্ষার্থী আচমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া পবিত্রবেশে উপবেশন করিত। বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসান কালে শিষ্য আচার্য্যকে প্রণাম করিত। আচার্য্য "অধীষ ভোঃ"—এই কথা বলিলে পাঠ আরম্ভ হইত। "বিরামোঽস্তু" বলিলে অধ্যয়ন শেষ হইত।(ঙ) আচার্য্যকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে বিশেষ নম্রভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতে হইত। মনু বলেন, ভক্তিশ্রদ্ধাদি প্রশ্ন ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় ভাবে জিজ্ঞাসা

(ক) মনু ২।১৫৯
(খ) গৌতম সংহিতা ২য় অধ্যায়
(গ) মনু ৮।৩০০
(ঘ) ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৩১
(ঙ) মনু ২।৭০—৭৪

করিলে কোন কথায় উত্তর দিবে না। এরূপ স্থলে জানিয়া শুনিয়াও মূকের ন্যায় ব্যবহার করিবে।(ক)

শিষ্য রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া অধ্যয়ন করিত।(খ) রাত্রি শেষে অধ্যয়ন করিবার পর পুনরায় শয়ন নিষিদ্ধ ছিল।(গ) দ্বিজ মাত্রেরই প্রত্যহ চতুর্ব্বেদ, উপনিষৎ, ইতিহাস, পুরাণ কিছু কিছু পাঠ করিবার নিয়ম ছিল।(ঘ)

—বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন কাল—

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। বৎসরকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে বেদ ও অপর ভাগে অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনা হইত।

প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে "উপাকর্ম্ম" নামক একটি অনুষ্ঠান করিয়া গুরু শিষ্যদিগকে বেদপাঠ আরম্ভ করাইতেন। ৪॥ মাস বেদ অধ্যয়নের পর উৎসর্গ নামক আর একটি অনুষ্ঠান করিয়া বেদপাঠ বন্ধ করা হইত। বৎসরের অবশিষ্ট সময় বেদাঙ্গ পুরাণ প্রভৃতির অধ্যাপনা চলিত।(ঙ)

—অনধ্যায়—

এখনকার স্কুল কলেজে যেমন এক সময়ে ২।৩ মাস বন্ধ হয় সেকালে তেমন রীতি ছিলনা। মাঝে মাঝে ছুটির ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ বিশেষ তিথি, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কিংবা প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা উপলক্ষে "অনধ্যায়" বিহিত ছিল। অনধ্যায় দিবসে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই খুব আমোদ প্রমোদ করিত। অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পৌর্ণমাসী ও অষ্টমী তিথিতে অনধ্যায় ছিল। বিদ্যুৎ গর্জ্জন, ঝড় বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি

(ক) মনু ২।১১০
(খ) মনু ৪।১০০
(গ) বিষ্ণু সংহিতা ৩০।২৭
(ঘ) ব্যাস সংহিতা
(ঙ) উশনঃ সংহিতা ৩।৫৪—৫৮

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ উপলক্ষে অধ্যয়ন অধ্যাপনা বন্ধ থাকিত। শৃগাল কুকুর প্রভৃতির উপদ্রব আরম্ভ হইলে, চোরের দৌরাত্ম্যে গ্রাম উপদ্রুত হইলে অথবা এরূপ অন্য কোন কারণে গ্রামে অশান্তির সৃষ্টি হইলে অনধ্যায় হইত। রাজার পুত্র জন্মিলে কিংবা আশ্রমে কোন অভ্যাগত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলে অধ্যয়ন বন্ধ থাকিত।(ক)

অনধ্যায় দিনে কেহ অধ্যয়ন করিতে পারিত না। বিষ্ণু সংহিতাকার বলেন, "অনধ্যায়ে অধীত শাস্ত্র ইহ পরলোকে ফলপ্রদ হয় না। পরন্তু তাহাতে অধ্যয়ন করিলে গুরু শিষ্যের আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।(ক)

—ছাত্রনির্ব্বাচন—

ছাত্র নির্ব্বাচনের প্রথা ছিল। উশনাঃ বলেন,

(১) আচার্য্য-পুত্র, (২) শুশ্রূষু, (৩) জ্ঞানদ (যিনি অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞানদান করিয়াছেন), (৪) ধার্ম্মিক, (৫) শৌচ সম্পন্ন, (৬) আত্মীয়, (৭) শক্ত (শস্ত্র ধরণে সমর্থ), (৮) ধনদাতা, (৯) সাধু ব্যক্তি, (১০) জ্ঞাতি, (১১) কৃতজ্ঞ, অদ্রোহী, মেধাবী ও শুভকারী ক্ষত্রিয়, (১২) তাদৃশ বৈশ্য, (১৩) কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ, (১৪) অদ্রোহীব্রাহ্মণ, (১৫) মেধাবী ব্রাহ্মণ এবং (১৬) শুভকারী ব্রাহ্মণ—এই ষোড়শ বিধ ব্যক্তির মধ্যে যে কেহ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাকেই অধ্যাপনা করিতে হইবে।(খ)

শিষ্য এক বৎসর বিনা অধ্যয়নে বাস করিত। গুরু ইহার মধ্যে ছাত্রকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার অবসর পাইতেন। শিষ্য উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাকে বিদ্যাদান করিতেন। তাহার আচরণে দোষ থাকিলে এই এক বৎসরে গুরু তাহা সংশোধন করিয়া লইয়া পরে বিদ্যাদান করিতেন।(গ)

(ক) মনুসংহিতা ৪।১০০—১২৬

(ক) বিষ্ণুসংহিতা ৩০।২৯—৩০

(খ) উশনঃ সংহিতা ২।৩৫—৩৭

(গ) ঐ ২।৩৩—৩৪

বৌদ্ধ যুগের নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি সঙ্ঘারামে দ্বার পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী পরীক্ষায় শত করা ২০টির অধিক ছাত্র উত্তীর্ণ হইত না।

—শিক্ষকদের ভিতরে শ্রেণী বিভাগ—

শিক্ষকদের ভিতরে শ্রেণী বিভাগ ছিল। সম্পূর্ণ বেদ শিক্ষাদাতাকে আচার্য্য বলা হইত। যিনি কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বেদের অংশ বিশেষ শিক্ষা দিতেন, তিনি উপাধ্যায় নামে অভিহিত হইতেন, (ক) তন্নিম্নস্থ ব্যক্তিকে গুরু আখ্যা প্রদান করা হইত। আচার্য্য উপাধ্যায় অপেক্ষা দশগুণ অধিক পূজিত হইতেন। জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও আচার্য্য সমধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন।(খ)

বৌদ্ধ যুগে মধ্যে মধ্যে আচার্য্য প্রধান প্রধান বিদ্যার্থীকে ছাত্র শিক্ষায় নিয়োজিত করিতেন।(গ)

ঔপনিষদিক যুগে দেখিতে পাওয়া যায়

পিতা (এবং স্বামী) স্বয়ং কখন কখন অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন।(ঘ) উপনীত হইয়া পুত্র স্বগৃহেই পাঠারম্ভ করিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ব্রত নিয়মাদির সম্যক্ পরিপালনের জন্য বালক অন্য গুরুর নিকট প্রেরিত হইত।(ঙ)

বেদ প্রভৃতি সাধারণ বিষয়গুলি গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসার জন্য ব্রহ্মচারিগণ আবশ্যক হইলে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া একাধিক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিত। কোন কোন গুরু প্রার্থনা করিতেন,—"জল যেরূপ নিম্ন স্থানে যায়, মাস সমূহ যেরূপ

(ক) মনু ২।১৪০, ১৪১
(খ) মনু ২।১৪৬
(গ) মহাধর্ম্মপালজাতক ৪।৪৪৭
(ঘ) বৃহদারণ্যক ৫।১।১ ; ২।৪
(ঙ) ছান্দোগ্য ৬।১।১
৮,১৫
বৃহদারণ্যক ৬।৩।৬

সংবৎসরে যায়, হে বিধাতঃ, সেরূপ ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্বদিক্ হইতে আমার সমীপে আসুক।"(ক)

মনুসংহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায়,

প্রাচীনকালে প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেতর আচার্য্যের নিকট হইতেও বিদ্যা গ্রহণের বিধি ছিল। মনু বলেন, "শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে।" (খ) ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী ঈদৃশ গুরুর পাদ প্রক্ষালন বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত না। অনুগমনাদি দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করিত।(গ)

অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাদান

ব্রাহ্মণ্যশিক্ষা পদ্ধতিতে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যাদান নিন্দনীয় ছিল। বিষ্ণু সংহিতাকার বলেন, "যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া ইহলোকে তদ্দারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহা তাহার পরলোকে ফলপ্রদান করিবে না। (ঘ) রাজা অমর শক্তি তাঁহার দুর্দ্দান্ত ছেলেদিগকে শিক্ষাদান করিবার বিনিময়ে বিষ্ণু শর্ম্মাকে "শতশাসন" উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর দিয়াছিলেন "নাহং শাসন শতেনাপি বিদ্যা বিক্রয়ং করিষ্যামি।"

বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর গৃহ প্রত্যাগমনকালে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিত। কিন্তু সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোনরূপ দক্ষিণা প্রদান মনুর সময়ে নিষিদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধ যুগে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া বিদ্যাদানের প্রথা প্রচলিত হয়। তিলমুখি জাতক হইতে জানা যায় বারাণসী অধিপতির জনৈক পুত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করেন। তিনি অধ্যাপকের দক্ষিণাবাবদ এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সঙ্গে লইয়া যান। সেই সময়ে দুই শ্রেণীর ছাত্র ছিল। প্রথম, যাহারা তাহাদের অধ্যাপনার জন্য দক্ষিণা প্রদান করিত; দ্বিতীয়, যাহারা দক্ষিণার পরিবর্ত্তে দিবাভাগে

(ক) তৈত্তিরীয় ১।৪ (গ) মনু ২।২৪২
(খ) মনু ২।২৩৮ (ঘ) বিষ্ণুসংহিতা ৩০।৩৯

অধ্যাপকগণের সেবা করিত এবং রাত্রিকালে অধ্যয়ন করিত। প্রথমোক্ত ছাত্রগণ অধ্যাপকের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় বাস করিত।

(৫)

সমাবর্ত্তন

অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর শিষ্যগুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতস্নান অনুষ্ঠান করিয়া 'সমাবর্ত্তন' করিত। অধ্যয়ন পরিসমাপ্তির পর ব্রতস্নান অনুষ্ঠানকারী শিক্ষার্থীকে "স্নাতক" বলা হইত। স্নাতক তিন প্রকার বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক এবং বিদ্যাব্রতস্নাতক।(ক) যাঁহারা অধ্যয়নের সহিত পালনীয় ব্রতগুলি সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিয়াই সমাবর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা বিদ্যাস্নাতক; যাঁহারা যথাবিধি ব্রতপালন করিয়াও বেদ অসমাপ্ত রাখিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন তাঁহারা ব্রতস্নাতক এবং যাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান এই দুইটিই পালন করিতে সমর্থ হইতেন তাঁহারা বিদ্যাব্রতস্নাতক। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত স্নাতকগণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইতেন।(খ)

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর সকলেই যে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত এমন নহে। ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরই বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণেরও বিধি ছিল।(ক) কেহ কেহ বা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই থাকিয়া বিদ্যানুশীলন করিত। ইহাদিগকে "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী" বলা হইত। মনু বলেন, যে বিপ্র অস্খলিত ভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন তিনি উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।(খ) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পাঠ্য সম্বন্ধে উশনা বলেন, "নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রত্যহ ভস্মস্নান পরায়ণ হইয়া বেদাভ্যাস

(ক) পারস্কর গৃহ্য সূত্র ২, ৮
মহাভাষ্য ৪, ২, ৫৯

(খ) গোভিল গৃহ্য সূত্র ৩।৫।২২

(ক) গৌতম—৩য় অধ্যায় (খ) মনু ২।২৪৯

করিবে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা, গায়ত্রী ও শতরুদ্রীয় (রুদ্রাধ্যায়) পাঠ করিবে।(গ)

দক্ষিণা

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর গৃহ প্রত্যাগমন কালে শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিত। এই দক্ষিণা ছিল আচার্য্যের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধার প্রতীক স্বরূপ। "দক্ষিণা শ্রদ্ধাং দদাতি, শ্রদ্ধয়া আপ্যতে জ্ঞানম্।"(ঘ)

এই দক্ষিণার সামগ্রী সম্বন্ধে মনু বলেন, "ক্ষেত্র, সুবর্ণাদি, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্ম্ম পাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র যাহা কিছু হউক গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিবে।"(ঙ)

বিদায় কালীন উপদেশ ;—

বিদায়কালে আচার্য্য শিষ্যকে তাহার ভাবী জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাতে অর্থোপার্জ্জন, বিবাহ, ধর্ম্ম শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, অধ্যাপনা, গুরুভক্তি, অতিথি সেবা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উল্লেখ থাকিত। এই সকল উপদেশ হইতে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই বিদায়কালীন উপদেশের সার মর্ম্ম অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত আছে ;—(ক) "সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে, বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। গুরু-দক্ষিণাদানান্তে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তানোৎপত্তির উপায় অবলম্বন করিবে। সত্য হইতে বিচলিত হইবে না। ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। কুশল হইতে বিচলিত হইবে না। মহত্ত্ব লাভে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না। দেব ও পিতৃকার্য্যে ঔদাস্য করিবে না। মাতাকে দেবতাবৎ পূজা করিবে। পিতাকে দেববৎ পূজা করিবে। আচার্য্যকে দেববৎ পূজা

(গ) উশনঃ সংহিতা ৩।৮৫ (ঙ) মনু ২।২৪৬
(ঘ) বাজসনেয়ী সংহিতা ১৯।৩০
(ক) তৈত্তিরীয় ১।১১

করিবে। যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয় সেই সকল কার্য্য করিবে; অন্য অর্থাৎ নিন্দনীয় কার্য্য করিবে না। আমাদের যে সকল কার্য্য সৎ সে সকলই তোমার কর্ত্তব্য, অন্য অর্থাৎ বিপরীত কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন কোন ব্রাহ্মণ আছেন, আসনদানাদি দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনয়ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। বুদ্ধির সহিত দান করিবে, বিনয়ের সহিত দান করিবে। ধর্ম্মভয়ের সহিত দান করিবে। মিত্রভাবের সহিত দান করিবে। যদি তোমার কার্য্য বা আচার বিষয়ে সংশয় হয়, তবে সেই স্থান বা কালে যে সকল বিচারক্ষম, অক্রুরমতি, ধর্ম্মকাম, অন্য কর্ত্তৃক যাগাদি কার্য্যে নিযুক্ত বা স্বাধীন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁহারা সেই বিষয়ে যেরূপ আচরণ করেন, তুমিও সেই বিষয়ে তদ্রূপ আচরণ করিবে। ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদরহস্য, ইহাই অনুশাসন, এরূপ আচরণ কর্ত্তব্য।"

স্নাতকের জীবিকা ;—

নবীন স্নাতকগণ রাজ সভায় যাইয়া সভাসদ্‌গণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন।(ক) বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বিদ্যালোচনার জন্য রাজার সাহায্য পাইতেন।(খ) কেহ কেহ যজ্ঞ স্থলে যাইয়া পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতেন। সমাবর্ত্তনের সময় গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন, "স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে ঔদাস্য করিবে না।(গ) এবং কোন কোন বিদ্যা গ্রহণের সময় ও ব্রহ্মচারীকে প্রতিশ্রুত হইতে হইত যে তিনি পরে সে বিষয় অপরকে শিখাইবেন। (ঘ) সুতরাং কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা আরম্ভ করিতেন।

(সমাপ্ত) অধ্যাপক—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

(ক) ছান্দোগ্য ৫,৩
(খ) ছান্দোগ্য ৫,১১,৫
বৃহত ২-১-১
৩-১-১
(গ) তৈত্তিরীয় ১।১১
(ঘ) ঐতরেয় আরণ্যক ৩-২-৬

সাহিত্য-জগৎ

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের "Grinnel college" এর সুযোগ্য অধ্যাপক "Waye Gard" Book Reviewing (পুস্তক সমালোচনা) নামক যে বহি লিখিয়াছেন, তাহা যে শুধু সাহিত্যিক সম্পাদকগণের আদরের বস্তু তাহা নহে, সমালোচক ও সাহিত্য সমালোচনার পাঠক মাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইবে। এই পুস্তকে আমেরিকায় প্রচলিত পুস্তক সমালোচনার রীতি নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কথাগুলি এই দেশের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কারণ—

সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রায় জগতের সর্ব্বত্রই সমান। বিশেষতঃ সব দেশে পেশাদারী সমালোচকগণের লিখনভঙ্গী প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। অন্যদিকে সাহিত্য ক্ষেত্রের কর্ম্মিগণের মধ্যে সমালোচকগণই একমাত্র সকলের অপ্রীতি ভাজন হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহারা গ্রন্থ-লেখকদের, পুস্তক প্রকাশকদিগের ও পত্রিকার সম্পাদকগণের মানসিক উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ান। তবে ইহা বলা যাইতে পারে অধিকাংশ স্থলেই সমালোচকগণ ভাল মন্দের ভাগী নহেন। কারণ তাঁহারা সাধারণতঃ অবিবেচক কিংবা অসূয়া পরবশ নহেন। কিন্তু পুস্তক প্রণেতৃগণ এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে রাজী নহেন। ইহাও একটি সত্য যে মানবের সাধারণ ভুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা, কি লেখক, কি প্রকাশক, কি সমালোচক সকলেরই মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। দক্ষতাহীন, সমালোচক যেমন বিরল নহে, অবিবেচক ও অযোগ্য গ্রন্থ-লেখক বা পত্রিকার সম্পাদকও অনেক।

উপরোক্ত পুস্তকে প্রথমতঃ সাহিত্য সমালোচনার একটি ইতিহাস এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে সমালোচনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পুস্তক সমালোচনার আদর্শ পদ্ধতি সম্বন্ধে সুবিখ্যাত সম্পাদকগণ যে সকল মতবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের এক অংশে লিপিবদ্ধ করা আছে, এবং আমার মতে পুস্তকের এই অংশটিই সাহিত্যিকগণের মনোরঞ্জন

সাধন করিবে। পুস্তক সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁহারা দুইটি কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। প্রথমতঃ সমালোচক পুস্তকের সারমর্ম্ম বিবৃত করিবেন ও তাহার পর পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের দোষ ও গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তৎ সম্বন্ধে তিনি যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন। বিশদ ভাবে পুস্তকের মূল বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য তিনি অধিক সময় নিয়োজিত করিবেন ও সংক্ষিপ্ত ভাবে পুস্তকের সারমর্ম্ম প্রদান করিবেন।

পুস্তকে আলোচিত বিষয়ের দোষ ও গুণ বিচার করিতে গেলেই সমালোচকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। আমেরিকার সম্পাদক গণের মতে পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করিয়া একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমালোচকের প্রধান কাজ। আমার মনে হয় এতদ্ব্যতীত আরও দুই একটি কথা এই সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার। প্রচলিত সমালোচনা-পদ্ধতির মধ্যে যে ত্রুটি রহিয়াছে তাঁহারা তাহার সম্বন্ধে একটি কথাও উত্থাপন করেন নাই। বর্ত্তমানে সংবাদ পত্রের অল্প জায়গার মধ্যে বহু পুস্তকের সমালোচনা বাহির করিতে সম্পাদকগণ বাধ্য হইয়া পড়েন। সেইজন্য যে সমস্ত সমালোচনা বাহির হয়, তাহা সুধী সমাজের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যে মাপ কাটিতে Jane Austine কিংবা Charles Bronteএর পুস্তকের সমালোচনা করা হইবে, তাহার দ্বারা সাধারণ উপন্যাস গুলির দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। সমালোচনার মাপ কাটি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেইজন্য পুস্তক সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার মাপকাটি সম্বন্ধে আভাস দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে সমালোচক লেখকদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়া বিপদে পড়িবেন। কারণ তিনি হয়তঃ Mr. Robinsonএর পুস্তকের তুলনায় "Miss Smith"এর পুস্তকখানিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া অভিহিত করিবেন; এবং পরক্ষণেই তিনি "War & peace"এর সঙ্গে তুলনা মূলক আলোচনা করিয়া Mr Joneএর পুস্তকখানিকে দোষযুক্ত বলিয়া তাহার মর্য্যাদা হানি করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ

ইহা অস্বাভাবিক নহে যে Mr. Joneএরপুস্তক Miss Smithএর পুস্তক হইতে হয়তঃ অধিক মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ।

আমেরিকার কতিপয় সম্পাদক এই মত পোষণ করেন যে সৎ সমালোচনা অত্যধিক অলঙ্কারযুক্ত না হইয়া জীবনের কার্য্যোপযোগী হওয়া দরকার। সমালোচনা এরূপ ভাবে লিখিত হইবে যে ভাবী পাঠকেরা যেন পুস্তকখানি কোন পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে সত্বর ক্রয় করিবার জন্য প্রেরণা অনুভব করে। এতদ্দেশেও সমালোচনা এইরূপ স্বার্থ দোষদুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আমার মনে হয় এবম্বিধ ভাব সম্পূর্ণ আধুনিক। কোন কোন লেখক বলেন যে রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন পুস্তকের সুচিন্তিত সমালোচনা আজ কাল সাহিত্য ক্ষেত্রে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। উক্তিটি খুবই সত্য। আজ কাল যে সকল সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা লেখকদিগের চিত্ত বিনোদনের দিকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হয়। পুস্তকের মধ্যে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বিচার করিয়া, একটি সুচিন্তিত সমালোচনা বাহির করিতে তাঁহারা প্রয়াস পান না। দোকানে পুস্তক বিক্রয়ের পথ সুগম করিয়া দেওয়া ব্যতীত সমালোচকের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না। সর্ব্ব সাধারণের কাছে পুস্তকের বিজ্ঞাপনের সহায়তা করিবার জন্যই তাঁহারা পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করিয়া থাকেন। যদি কেহ পুস্তকের আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, তবে হয়তঃ তাঁহার এই কাজ বিস্তাড়ম্বর বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে Macaulay সাহেবের অধিকাংশ পুস্তকই সর্ব্বপ্রথম সমালোচনা আকারে বাহির হইয়াছিল। কারণ Macaulay সাহেবের মত সুদক্ষ, না হইলেও, সেই সময় যে সকল সমালোচক পুস্তকের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও তৎ সম্বন্ধে নিজের মত জ্ঞাপন করিতেন, তাহাদের এবম্বিধ সমালোচনাই সাহিত্য-পত্রিকায় বা সংবাদ পত্রে স্থান পাইত। "Life of Robert Clive" সম্বন্ধে Macaulay সাহেবের সমালোচনা "Edinburg" নামক

সংবাদ পত্রে যেরূপ স্থান পাইয়াছিল, বর্ত্তমান কালে এতদ্দেশে একখানি মাসিক বা দৈনিক সংবাদ পত্র নাই যাহাতে সেই জাতীয় সমালোচনা বাহির হইতে পারে। ইহা ব্যতীত আজকাল, সমালোচনার পাঠকেরাও মানসিক পরিশ্রম কুণ্ঠ। তাহারা কোন বিষয়ের সমালোচনা পাঠ করিতে গিয়া এক হাজার শব্দ ব্যতীত অধিক পড়িতে গেলেই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। সমালোচকগণও তাই বাধ্য হইয়া শ্রম বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কর

পুস্তক পরিচয়

১। প্রাচীন পীড়ার কারণ ও তাহার চিকিৎসা—ডাঃ নীলমণি ঘটক প্রণীত। মূল্য ৪।০। এই পুস্তক সুদৃশ্য মলাট যুক্ত ও হোমিওপ্যাথিক উপায়ে প্রাচীন পীড়ার কারণ ও চিকিৎসা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

২। সর্ব্ব তন্ত্র সিদ্ধান্ত পদার্থ লক্ষণ সংগ্রহ—ভিক্ষু গৌরী শঙ্কর কর্ত্তৃক সংগৃহীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধান, হরপ নাগরী, মূল সডাক ১৲ টাকা, প্রাপ্তিস্থান মনভরী দেবী, গ্রাম পুটি, পোঃ জামালপুর, জিলা হিসার (পাঞ্জাব),—আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

৩। কষ্টি পাথর—ধর্ম্মভাব মূলক পুস্তিকা—শ্রীধনঞ্জয় ধারা লিখিত, মূল্য ছয় আনা।

সংঘ বার্ত্তা

১। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—আমিনাবাদ, লক্ষ্ণৌ—কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে ১৯২৫ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত ১৬,৩৫৪ জন ব্যক্তিকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। দরিদ্র বালকদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে—উহার ছাত্র সংখ্যা ২৬ জন। ৫০ জন দরিদ্র বালকদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এই আশ্রমের সাহায্য বিশেষ দরকার।

২। বিগত ১৯শে আগষ্ট, ব্রাহ্মধর্ম্মের শত বার্ষিকী উৎসবে স্বামী নিখিলানন্দ, "বিগত শতবর্ষে বাংলায় ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ দিবসই সাধন-সমর কার্য্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আগমনী

আবার এসেছে উমা পাষাণীর মেয়ে
এল শারদ সুষমা মাধুরী লয়ে।
এই পরাণবীণার তারে তারে আজি
মধুর 'মা' বুলি উঠিল পুলকে বাজি,
আনন্দের ধারা বহিল বিশ্ব হৃদয়ে।
আবার এসেছে উমা পাষাণীর মেয়ে॥
উছলি উছলি রূপের লহরী পড়ে
শত শতদলে শেফালী জবার পরে।
"এস মা এস মা" বলি ডাকিতেছে প্রাণ
নিখিল ভুবন ধরিয়াছে এই তান,
এস শিবে, এস শুভে, বরাভয় নিয়ে।
আবার এসেছে উমা পাষাণীর মেয়ে॥

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস, এম, এ

বিজয়া

অমন করে যেও না ফিরে হররমা,
বছরের পরে এলে যদি ঘরে (ওগো) উমা॥

তুমি যদি যাও চলি আঁধারি ভুবন,
কেমনে রহিব ঘরে ধরিয়া জীবন ॥
থাকিব তিমিরে মোরা সেও তবু ভালো,
ক্ষণেকের তরে চাহিনা গো চিকুর আলো ॥
বিষাদে আকুলপারা প্রাণে বাজে ব্যথা,
মরমে মরিয়া গাহি বিজয়ার গাথা ॥

শ্রীবিধুরঞ্জন দাস এম, এ

তত্ত্বকথা

(৩)

জ্ঞান জ্ঞান করে লোকে জ্ঞান কিসে হয় ?
শাস্ত্র পড়ি জ্ঞানলাভ ? বৃথা শক্তিক্ষয়।
বিবেক বৈরাগ্য আর ব্রহ্মে স্থির রতি,
সর্ব্বজীবে সমভাব জ্ঞান পরিণতি।
ইহা কি সহজ সাধ্য যার তার হয় ?
বিষয় বুদ্ধিতে ভরা সবাকার মন।
জ্ঞান জ্ঞান বলি শুধু মুখে আস্ফালন ॥

(৪)

নিরভিমানীতা ভাল, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দীন হীন ভাব তাই বলে ভাল নয় ॥
'আমি দীন', 'আমি হীন' ভাবে সদা যারা।
প্রকৃতই দীন হীন হয়ে পড়ে তারা ॥
ভাবনানুরূপ সিদ্ধি শাস্ত্রের বচন।
উচ্চ ভাব নিয়ে তাই থাক অনুক্ষণ ॥
মহাঈশ সুত তুমি, তুমি যে মহান।
তুমি কেন হীন হবে, তুমি বীর্য্যবান ॥

—বিজ্ঞানী

কথা-প্রসঙ্গে

বন্ধু, কিছুদিন পূর্ব্বে একটা গল্প বলেছিলুম বোধ হয় মনে আছে। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও পিসার হেলা স্তম্ভের ওপর থেকে দুটো পাথর, একটা আর একটা থেকে একশোগুণ অধিক, ফেলে যেদিন দেখালেন যে, সেই উঁচু জায়গা থেকে একই সময়ে তারা মাটিতে পড়ে, সেদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিতারা সমস্বরে বলে উঠলেন, "গ্যালিলিওর গতিরোধ করতেই হবে। নইলে আমাদের পুরাণ পুঁথিপাতা সব অবজ্ঞাত হয়ে পড়বে।" ফলে ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তারা তাঁকে জেলে পাঠালেন। কিন্তু সত্যের চাইতে শক্তিমান্ ত কেউ নেই, তাই কালে ধর্ম্মের (অবশ্য তথাকথিত) পরাজয় হল এবং গ্যালেলিওর সত্য জয়ী হল। কিন্তু বাইবেলের 'পৃথিবীর বয়স ছ হাজার বছর' প্রভৃতি অবৈজ্ঞানিক মতবাদ মানুষ অগ্রাহ্য করলেও, Sermon on the Mount ব্যক্তিগত ভাবে আচরিত না হলেও, মানুষের হৃদয় জয় করে বসেছে। অর্থাৎ তার সত্য সর্ব্বজাতি স্বীকার করতে বাধ্য।

আমাদের বেদ সম্বন্ধেও সেই একই কথা! স্বামিজী বলছেন, "শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত "বেদ" বুঝা যায়। ধর্ম্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য, এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্য্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্য্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার। (১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য। (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজশক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং যাহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। এই অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও

সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন, তাহার নাম 'বেদ'। * * * সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে বা কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে। সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'। * * * আর্য্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দ রাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'। এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্ম্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবে। * * * জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম্ম, যোগ ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া-পার-নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশ কাল পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায়—সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্মের একমাত্র উপদেষ্টা।"

ওপরের কথাগুলো স্বামিজীর মনগড়া কথা নয়, এ শিষ্টানুমোদিত। কারণ ভগবান শংকর শ্রুতিব্যাখ্যায় একথা স্পষ্ট করে বলচেন—

তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ১।৪॥

অঙ্গিরা শৌনককে বললেন, "ব্রহ্মবিদেরা বলেন দুটি বিদ্যা জানা উচিত—পরা এবং অপরা।"

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। ঐ, ৫॥

সেই উভয় বিদ্যার মধ্যে অপরা বিদ্যা কি তা বলা হচ্চে—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। অনন্তর পরা বিদ্যা বলা হচ্চে—যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে পাওয়া যায়।

শ্লোক দুটো কিছু আশ্চর্য্য রকমের বলে আচার্য্য ব্যাখ্যা করচেন—

প্রশ্ন—কোনটি জানলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়—ইহাই প্রতিপাদ্য। কিন্তু শ্রুতি দুটি বিষয় (অপরা ও পরাবিদ্যা) বল্লেন কেন?

উত্তর—কারণ সিদ্ধান্ত ক্রম সাপেক্ষ। অপরা বিদ্যা প্রকৃত পক্ষে অবিদ্যাই বটে, কারণ তাহাতে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয় না। কিন্তু প্রথম কল্পিত পক্ষ প্রতিষেধ করে সিদ্ধান্ত পক্ষ বলা উচিত—এই নিয়মানুসারে অপরাবিদ্যার প্রত্যাখ্যানের পর সিদ্ধান্তরূপে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানরূপ পরা-বিদ্যা বলা হবে।

প্রশ্ন—কিন্তু শ্রুতি বলচেন ঋগ্বেদাদি সব অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা। পরন্তু আমরা ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র বেদ বলে জানি এবং স্মৃতিতেও আছে, "যো বেদ বাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ"—বেদ-বহির্ভূত যে সমস্ত স্মৃতি এবং যে কোনও অসৎ জ্ঞানোপদেশ তৎসমস্তই অসদুপদেশ সুতরাং নিষ্ফল। সুতরাং উপনিষদ যদি বেদ-বাহ্য হয় তা হলে তা অগ্রাহ্য বুঝতে হবে।

উত্তর—না নিষ্ফল হতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞেয় বিষয়ের বিজ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই এখানে শ্রুতির অভিপ্রায়। অর্থাৎ উপনিষদ-বেদ্য যে অক্ষর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, তাই এখানে 'পরাবিদ্যা' বলে প্রধানতঃ অভিপ্রেত হয়েচে, পরন্তু উপনিষদের শব্দ সমূহ নয়। কিন্তু বেদ বলতে কেবল শব্দরাশি এই লোকে মনে করে। কিন্তু কেবল শব্দসমূহ অধিগত হলেও গুরু সমীপে গমনাদিরূপ প্রযত্ন এবং বৈরাগ্য লাভ ব্যতীত যে অক্ষর ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, একথা বোঝাবার জন্যই ব্রহ্মবিদ্যার পৃথক করণ এবং পরাবিদ্যার নামকরণ হয়েচে।

বিধি-নিষেধ পর বেদের ক্রিয়াকাণ্ড যদি অভ্রান্ত হয় তা হলে তা কখন সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতা হতে পারে না। কারণ বিভিন্ন দেশকালে তাহা চলেনি, চলবে না এবং এখনও চলে না। বেদ যদি যথার্থই হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, কনফুস, তাও, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের ভিত্তি হয় তা হলে নিশ্চয়ই তার লৌকিক, অর্থবাদ এবং ঐতিহ্য অংশ বাদ দিয়েই তাকে বুঝতে হবে। তা না হলে বেদ কখনও সার্ব্বলৌকিক, সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বকালিক হতে পারে না।

বিধি-নিষেধ পর ক্রিয়া-কাণ্ডকে আমরা যদি দুভাগে সাজাই তা হলে দুটো জিনিষ আমরা পাই—(১) সমাজ পর শ্রুতি, অর্থাৎ যাতে জাতি, বিবাহ এবং খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আলোচিত হয়েচে এবং ২) অভ্যুদয় পর, অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপক যাগযজ্ঞাদি। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক সত্য হিসাবে ঠিক। যতদিন না মুমুক্ষুত্ব আসে, যত দিন না আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞাত না হয়, যতদিন মানুষের সুখ ভোগেচ্ছা থাকবে ততদিন পারলৌকিক স্রক্‌চন্দন-বনিতার জন্য যাগযজ্ঞাদিও থাকবে। যাগযজ্ঞ করলে মানুষের চিত্তে এক "অপূর্ব্ব" নামক শক্তি জন্মায় যার দ্বারা তার স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যতদিন অজ্ঞান ততদিন আত্মার গতাগতি। জ্ঞান-দৃষ্টিতে জীবত্ব ও স্বর্গাদি স্বপ্নবৎ মিথ্যা। কাজে কাজেই এ সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক হতে পাবে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এটা অভ্রান্ত কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ওসব ভ্রান্তিপূর্ণ। কিন্তু যতদিন ব্যবহারিকেব গণ্ডির মধ্যে আমরা বাস করব ততদিন যাগযজ্ঞাদি এবং তার ফল স্বর্গাদি অপরিবর্ত্তনীয় রূপেই আমাদেব কাছে থাকবে।

কিন্তু একথা মানলে এটাও মানতে হবে যে পারসীক, আহুদি, এ্যাসিরিয়ান, সুমেরিয়াণ, ব্যাবিলোনিয়ান এবং ইজিপসিয়ান যাগযজ্ঞ বেদ-বহির্ভূত হলেও সে সব ঠিক, কেন না তারাও বলে সে সব দেবতাদের দান। একটা ভুল হলে, আর একটাও ভুল—নইলে দুটোই ঠিক। কেন না যাগযজ্ঞ দ্বারা এক অদৃষ্ট অশ্রুত লোকে যাওয়া যায়, এ সম্বন্ধে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও প্রকার অনুমানই চলে না। তবে এইটুকু বলা যেতে পাবে অপর দেশীয় যাগযজ্ঞ বেদবহির্ভূত থাকলেও বেদ-বিরোধী ছিল না এবং বেদের শাসন তাদেব ওপর চালাতে গেলে তরবারীব দ্বারা তা মীমাংসিত হত।

কিন্তু প্রথমটি অর্থাৎ সমাজপর শ্রুতি, তা ব্যবহারিক রাজ্যেও ট্র্যাকেনি—চিরকালই তার পরিবর্ত্তন চলেছে। এবং কীট পতঙ্গ আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত কোন কালে কয়েকটি সৃষ্টিযের

জীব মাত্র তার শাসন প্রতিপালন করেছে। পরা এবং অপরা বিদ্যা উভয়েরই উদ্দেশ্য যখন দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ, তখন একথা কখনও দৃঢ়তার সহিত বলা যেতে পারে না যে সমাজ-পর শ্রুতির অনুশীলনে সকল দেশে, কালে, পাত্রে বা জাতিতে তা সুখ বিধান করবে। তাৎকালিক সমাজ বিধি যদি অভ্রান্ত ভাবে মানবের কল্যাণ বিধান করত তা হলে সেই প্রাচীন বিধি সকল কখনও পরিবর্ত্তিত হত না। মানুষ সুকর উপায় পেলেই পুরাতনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নূতনটাকে ধরবেই এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার কার পক্ষে কোনটা সুবিধাজনক তা মানুষ অবস্থা চক্রে পড়ে যেমন নিজে বোঝে তা বেদও তাকে বোঝাতে পারে না। বেদ যদি বোঝাতে পারত তা হলে তার আচার-ব্যবহার কোন কালে পরিবর্ত্তিত হতে পারত না।

অপরা-বেদ মানুষের শিরোধার্য্য, কিন্তু বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সেটা যদি সে অসুবিধা বোধ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ তা মাটিতে আছড়ে ফেলবে—মর্য্যাদা হানি হলেও, প্রাণের দায় বড় দায়। সেই জন্য বলি, বর্ত্তমান কখনও তার জাতি, বিবাহ বা খাদ্যাখাদ্য কেবল অতীতের অনুযায়ী হতে দেবে না। বর্ত্তমান চলেছে অতীতের অভিজ্ঞতা ও বর্ত্তমানের বিজ্ঞান একীভূত করে আগামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করতে। সভ্য মানবের ধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা দুরন্ত ভীতি বরাবরই আছে, কিন্তু তবুও তাকে চলতে হয় উপস্থিত অবস্থার অনুযায়ী এবং সেই জন্য একই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও যুগভেদে বিভিন্ন ভাবে করতে হয়েছে।

প্রকৃতির সংঘর্ষে বরাবরই মানুষ নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম নিজে নির্ণয় করে আসছে—শাস্ত্রের বিধি নিষেধ তার কাছে একটা reference বই আর কিছুই নয়। প্রবল প্রতাপ রাজ-রক্ষিত বৈদিক ধর্ম্ম সত্ত্বেও বুদ্ধ ও তীর্থংকরদের কথাই প্রবল হল। বেদ না পড়েই মধুসূদন প্রভৃতি ইংরাজী নবিশেরা গোলদিঘিতে বসে অখাদ্য ভক্ষণ করায় একটা মস্ত গৌরব অনুভব করলেন।

বিবাহ বা জাতি সম্বন্ধেও আমরা ঐ একই কথা বলতে পারি। ঐ তিনটি বিষয়ে কেবল উদারতাটা উদরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। উদারতার পশ্চাতে তীব্র সংযম না থাকলে কোনও জাতির অভ্যুদয় হয় না। বিবাহ কে কোন পদ্ধতিতে করবে না করবে তা হয়ত অগ্রাহ্য করলেও চলে, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে নৈতিক বন্ধন অটুট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে ওসেনিয়ার আদিমবাসী ও আর্য্য জাতির সভ্যতার পার্থক্যের বড়াই কোথায় থাকে? আহার সম্বন্ধেও আমরা একই কথা বলি—কে কি খেল না খেল লক্ষ্য না করলেও চলে কিন্তু দেখতে হবে তাতে তার দেহ মনের উন্নতি হচ্চে কী—না, যে খাচ্চে সে খাবার জন্য বেঁচে আছে, না বাঁচবার জন্য খাচ্চে। যা তা মাংস খেলেই যদি একটা জাত বড় হত তা হলে হটেন্টো বা ভারতবর্ষীয় মুসলমানরা এতদিন জগতের একটা শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে পড়ত। মৎস্য ও অন্নভোজী জাপানী ও বাঙ্গালী এত বুদ্ধিমান্ কেন? কুকুর বেড়াল তেলাপোকা খেয়েও চীনেরা এতদিন ঝিমুচ্ছিল কেন? জাতিভেদ বা বিবাহ-পদ্ধতি শুধু শিথিল হলেই যদি এক একটা প্রাচীন আর্য্য বা আধুনিক ইউরোপী জাতি গড়ে উঠত, তা হলে প্রশান্ত দ্বীপের বাসিন্দারা বা আমাদের দেশের ট্যাস ফিরিঙ্গী এখনও বশিষ্ঠ, সক্রেটিস হয়ে পড়ল না কেন? প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব জাতি, বিবাহ বা খাদ্যাখাদ্যের কেবল-উদারতায় নয়, তার অন্তর্নিহিত উদার অথচ কঠোর সংযমে।

আত্মোপলব্ধির ক্রমোবিকাশ

(প্রাচীন উপদেশ নূতন কলেবরে)

ধীর ভাবে চিন্তা করলেই মনে হয় যে জগতের রচনা কৌশলও যেমন অসংজ্ঞাত তেমনি সৃষ্টির উদ্দেশ্যও একটি মস্ত প্রহেলিকা। এই অজ্ঞাত উদ্দেশ্যকেই আমরা ভগবদিচ্ছা বলে থাকি। ভগবান অনাদিকাল থেকে আমাদের চিরন্তন সাথী—কী স্থাবর কী জঙ্গম, কী জড় কী চেতন সকলেরই প্রতিষ্ঠা তাঁতেই। জড় বা জীবের মধ্যে এমন কোনও বস্তু নেই যা সেই দেব ইচ্ছার অঙ্গীভূত রচনার কোন না কোনও উদ্দেশ্য পরিপূরণ করছে, তা সে বড়ই হোক বা ছোটই হোক, ভূমাই হোক বা অল্পই হোক, প্রত্যেকেই তার নিজের অস্তিত্বের একটা বিশেষত্ব নিয়ে অনন্ত পথের যাত্রী। তাই বলি, প্রতি মানবের এটা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য—তার চিত্ত বৃত্তির বিশ্লেষণ করে জীবনের উদ্দেশ্যকে নির্দ্দেশ করা। হয়ত সমষ্টি জটিলতার আংশিক সকল সত্যের আবিষ্কার হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু সেটার প্রয়োজনীয়তা আমাদের বর্ত্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। তবে এটা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সকলেই নিজের সৎ এবং আন্তরিক চেষ্টায় তার উপস্থিত কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য ধরতে পারবেই।

আত্মোপলব্ধির প্রথম স্তর হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞাবদ্ধ করে, উৎসাহের সহিত সেটাকে কার্য্যকরী করা। যখন উদ্দেশ্য নির্ণীত হল তখন সেই উদ্দেশ্যকে জাগতিক সকল লাভ লোকসান, যশ অপযশ এবং সুখ দুঃখের ওপর তুলে ধরাই কর্ত্তব্য। সেই আদর্শের উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বস্তুকে শ্রীভগবানের ইচ্ছারূপেই দেখতে বুঝতে ও ভাবতে হবে—যে ইচ্ছা সেই ব্যক্তির মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ হচ্ছে। এ ধারণাটা আজীবন রাখা দরকার। এই দিক দিয়ে উদ্দেশ্য বাস্তবে পরিণত করবার জন্য যে বিবেকতঃ প্রচেষ্টা তাই হল মননশীল মানবের

ধর্ম্ম। এই সজ্ঞান প্রচেষ্টা বা কর্ম্মই হচ্চে প্রাণ শক্তির ক্রমবিকাশের নিয়ম বা তারই রূপান্তর।

এই কর্ম্মের দ্বারা উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। এখন দেখা যাক একে কি করে কার্য্যকরী করা যেতে পারে। এর উপায় হচ্চে পুনঃ পুনঃ ভাবনার দ্বারা উদ্দেশ্যের গভীরতা সম্পাদন ও মহোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। মনটাকে ঐ ভাবে এমন পূর্ণ করে ফেলতে হবে যে জ্ঞান ও অজ্ঞান ভূমি, চিত্তের সর্ব্বাবস্থায় তা যেন সদা জাগ্রত থাকে। তবে কথা হচ্চে কি করে মনকে এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করা যেতে পারে? এই বাস্তব প্রশ্নের সমাধান ব্যক্তির অবেষ্টনী বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। উদ্দেশ্য সাধনের সব সময়ই একটা দেশ ও কাল আছে—কখন এবং কোন সময়ে? মানুষের মন যখন অবসাদমুক্ত এবং বিশ্রামোন্মুখ, দেহ ও মনকে যখন স্বচ্ছন্দে এলিয়ে দেওয়া যায়, চিত্তের নিস্তব্ধতা ভাঙবার যখন কোনও উত্তেজক কারণ থাকে না—সাধারণতঃ সেই হচ্চে ঐ কার্য্যের উপযুক্ত সময় এবং প্রকৃষ্ট দেশ; অর্থাৎ যখন আমরা রাত্রির বিশ্রামের জন্য গমন করি অথবা প্রভাতের আগমনে।

আমি একটা অভ্যাসের কথা বলব, হয়ত সেটা সকলের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নাও খাটতে পারে। কারণ প্রত্যেকেরই নিজের অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি চিন্তা করে তবে কাজ করা ভাল।

দিনের কাজ শেষ করে, বিশ্রামের পূর্ব্বে স্নান বা হাত পা ধুয়ে (স্বাস্থ্য, অভ্যাস, ও আবহাওয়া ও জল বায়ু বিবেচনা করে), মন থেকে দিবসের সকল চিন্তা অবসাদ ও কষ্ট ঝেড়ে ফেলতে হয়। বিছানায় বা অন্য কোনও জায়গায় বসে (যার যেমন সুবিধে হয়) চিত্তকে শান্ত ও একাগ্র করবার জন্য একটু আধটু শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়মন করা অভ্যাস করতে হবে। তারপর মনে মনে যে জন্য কর্ম্ম করতে যাচ্চ সেই উদ্দেশ্যের বেশ বিস্পষ্ট ধারণা করবার চেষ্টা করে, তাকে জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ও ভগবদিচ্ছারূপে গ্রহণ করবে—যে ভগবানে আমাদের অস্তিত্ব—যিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন—যিনি চির প্রেম ও মঙ্গল

স্বরূপ। আদর্শের আনুসঙ্গিক বিশদতা ত্যাগ করে উপায়কে বেশ অন্তরের সহিত অনুভব করা উচিত। কর্ম্মের স্বরূপ বা ফল চিন্তা না করে, উদ্দেশ্যকে শ্রীভগবানের বাণীরূপে গ্রহণ করে সিদ্ধির নিমিত্ত বিবেকতঃ সফল প্রচেষ্টায় নিয়োগ করবে। সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে যেমন আমরা বাসনা ও আশার বশবর্ত্তী হয়ে দোলায়িত হই, এ সেরূপ কর্ম্ম নয়, এটা মনে রাখতে হবে। ভগবদিচ্ছা সম্পাদনের জন্য ফল বর্জ্জিত হয়ে কেবল উপায়ের পরিণতিতে আমাদের আনন্দ হোক। আদর্শ লাভের চেষ্টাতেই একটা আনন্দ আছে এবং একটা অদ্ভুত তৃপ্তির অনুভব হয়। সেজন্যে প্রথমে উপায় ও আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়, তারপর সেটাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে ঈশ্বরেচ্ছা বোধে তাকে উপলব্ধি করতে হবে।

তারপর নিদ্রার পূর্ব্বে মনে করতে হবে, ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। প্রেমময় এবং মঙ্গলময় ভগবান চিরকালই ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন,—তা সে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিকই হোক, তিনি কালে তা পূরণ করবেনই—তবে সে পূরণ হবে তাঁর ইচ্ছার অনুযায়ী। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণে তিনটি জিনিষ অপেক্ষা করে—ধৈর্য্য, সময় ও প্রকার। আমরা আমাদের ভাল মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলে তাঁর দান ঠিক আমাদের ইপ্সিত কালে বা প্রকারে নাও আসতে পারে। এই ভাবটি নিজের মনের ওপর ইচ্ছা শক্তির দ্বারা প্রয়োগ করবে—"প্রতিদিন এবং সর্ব্বতোভাবে আমি ভাল হচ্ছি।"

সকালে উঠেও ভগবানকে প্রেম, মঙ্গল এবং সর্ব্বশক্তিমানরূপে চিন্তা করবে এবং চিন্তা করবে তাঁর কাছ থেকেই প্রেম, মঙ্গল এবং শক্তি আমার ভেতর প্রবাহিত হয়ে আসছে, তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে এবং অন্তর্য্যামিরূপে আছেন। এবং তা ছাড়া রাত্রে ঘুমোবার পূর্ব্বের মত নিজের মনের ওপর সদিচ্ছার প্রয়োগ করবে। এই সময় আদর্শের বিশদতা নিয়ে মনকে ব্যস্ত করবে না, সেটাকে অজ্ঞান ভূমিতেই তুলে রেখে দেবে। প্রকৃত কাজের সময় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি

স্থির থাকা উচিৎ এবং যা করছে সেটাকে ভাল করে করা উচিৎ। দিনের কাজ আরম্ভ করবার আগে মনে মনে সব কাজ বেশ করে গুছিয়ে বিভিন্ন ভাগে ও কালের বিভাগ করে নিতে হয়। তার পর আর সে বিষয়ের চিন্তা না করে, প্রত্যেক কাজটির মধ্যেই নিজের চিন্তা আবদ্ধ ও সেটি সুসম্পন্ন করাই উচিৎ। এতে একাগ্রতা ও নিপুণতা আসবে এবং কর্ম্মেরও উন্নতি হবে।

এইরূপে কিছুদিন অভ্যাস করলে, উদ্দেশ্যের গভীরতা সম্পাদনের জন্য তা আর বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন হবে না। হয়ত ওটার আর চিন্তারই দরকার হবে না, অজ্ঞান-ভূমি থেকেই ওর কাজ হবে। তখন কেবল দরকার শ্রীভগবান ও তাঁর মহতী ইচ্ছার চিন্তা এবং সানন্দে ও পূর্ণ বিশ্বাসে তদিচ্ছায় আত্মসমর্পণ। এইরূপ অভ্যাসের ফলে কষ্ট ও বিফলতা মনে দুঃখ এবং অবসাদের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তার প্রসন্নতা নষ্ট করতে পারবে না। এতে মনের এমন ধৈর্য্য ও আত্ম-বিশ্বাস এসে উপস্থিত হবে যে তাকে কোনও দুঃখ কষ্ট বা অবসাদে বিচলিত করতে পারবে না। আত্মবিশ্বাসের প্রসন্নতা ক্রমে ভগবদিচ্ছায় নিমজ্জিত হয়ে যাবে, অথবা সন্তোষই, কালে, যাতে আমরা অবস্থান করছি সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করার আনন্দ প্রসব করবে।

সাধারণতঃ এটা সম্ভব নয় যে, যে কোন একটা বিশেষ সময়ে জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য নিঃশেষিতরূপে আমরা নির্দ্দেশ করতে পারি। আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনে বা উন্নতির ক্রম-বিকাশের সহিত উপায়-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে অদূর ভবিষ্যৎকে মিলিত করে লোকের উপস্থিত উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়ে থাকে।

যেমন দামী দলিল পত্র আমরা সিন্দুকে রেখে দেই, তেমনি এই বিস্পষ্ট রূপে চিন্তিত আদর্শ অজ্ঞান ভূমিতে রেখে দিতে হবে, যা সেখান থেকে আমাদের সমস্ত আচরণ ও কার্য্য নিয়মিত করবে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেটাকে জ্ঞান ভূমিতে নিয়ে এসে তীক্ষ্ণ করতে হবে অথবা বর্ত্ত-মান অবস্থার দিকে নজর রেখে আগত ও অনাগত কর্ত্তব্যের জন্য

তার আনুসঙ্গিক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান গুলিকে বদলাতে হবে। আদর্শের অনুভবই আমাদের আচরণ ও কর্ত্তব্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই। কিন্তু আদর্শ অভ্যাস-মার্জ্জিত না হলে বিস্পষ্ট, অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ নানা বিষয়ের সঙ্গে মিশে, তার শক্তি হারিয়ে ফেলবে, এমন কি তা ইচ্ছা-মাত্রই রয়ে যাবে—কার্য্যে পর্য্যবসান কোন কালেই হবে না। অথবা উদ্দেশ্য কর্ম্মজীবনে পরিণত না হয়ে, কেবল আত্মম্ভর কর্ম্ম হয়েই দাঁড়াবে।

একটা সূক্ষ্ম যন্ত্রকে যেমন সময় সময় ঝাড়তে হয়, পরিষ্কার ও চক্‌চকে করতে হয়, দেহ ও মনকে কর্ত্তব্যের উপযোগী করবার জন্য আদর্শ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। এরূপ পরীক্ষাকালে মাঝে মাঝে হয় ত উপস্থিত কর্ত্তব্যের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দরকার হতে পারে। কারণ দূর অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা বিশেষে কিরূপ কর্ত্তব্য প্রণালী নির্দ্দেশ করতে হবে বা বর্ত্তমান কর্ম্ম-প্রণালী ভবিষ্যতে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পারে তা জানা দরকার বা তদনুযায়ী পরিবর্ত্তনও দরকার। এ সময়ে উপায়টি লিপিবদ্ধ করা উচিৎ; তাহলে জিনিষটি খুব বিস্পষ্ট হয়ে মনের মধ্যে রূপ নেবে এবং লিপিটি যেন ভগবানের নিকট ক্ষমা দয়া ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ রূপ প্রার্থনার ন্যায়ই লিখিত হয়।

যোগ ব্যাপারটি সংক্ষেপে লিখলুম। এটাকে ক্রিয়া যোগ বলা যেতে পারে এবং অপরাপর সকল যোগের ব্যাপার এরই অন্তর্গত। যেমন মনের বিভিন্ন বৃত্তি একই উদ্দেশ্য সাধনে মনরূপে সমবেত হয়। তেমনি এই ক্রিয়াযোগের বিভিন্ন অঙ্গ এক আদর্শ রূপ ভগবদিচ্ছা সম্পাদনের নিমিত্ত নিয়োজিত হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন যোগের ক্রিয়াংশ এতে সংক্ষেপে সমষ্টীকৃত।

অবশ্য এতে নানা বিষয়ের অভ্যাস দরকার। যেমন—(১) দেহের স্বাস্থ্য বিধান, (২) মনের—(ক) ভাব, (খ) বুদ্ধি ও (গ) নীতির উৎকর্ষ। অর্থাৎ এই ক্রিয়াযোগ করতে হলে হঠ, ভক্তি ও জ্ঞান-যোগেরও প্রয়োজন। কেননা ভক্তি না হলে কেউ ভগবানে নির্ভর করতে পারে না, উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ব্যায়াম ব্যতিরেকে সে দেহ যোগের অনোপযোগী হবে। যদিও এগুলি ব্যবহারিক কর্ম্ম তবুও এগুলি পারমার্থিক কর্ম্মে লাগাতে হবে। ব্যবহারিক কর্ম্মই ঊর্দ্ধমুখী হলে পারমার্থিক হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীরজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

হিমালয়

হে বিরাট্ ! হে নির্ব্বাক ! ওগো আজি একী তব রূপে
কুহেলি আড়াল হতে—অতি ধীরে অতি চুপে চুপে
বিস্মিত করিয়া মোরে ভরি মোর লুব্ধ আঁখি দুটি,
মূর্ত্ত সুন্দরের বেশে সহসা উঠিলে তুমি ফুটি।
করি মোরে উন্মাদ অধীর ! আজি তব শান্ত ছায়
তোমার চরণ প্রান্তে সুগভীর নিঃশব্দ মায়ায়
যুগ যুগ সীমা হারা তোমার উদার স্নেহ মাঝে
দাঁড়ায়েছি আসি আমি শুধু এক সর্ব্ব হারা সাজে।
অসীম নির্ভরে ! আজি সংসারের ক্ষুব্ধ কোলাহল
সব শেষ হয়ে গেছে—সব হাসি সব অশ্রুজল,
দুঃখ সুখ—পুণ্য পাপ যত গর্ব্ব—যত অভিমান
সকলি মুছিয়া গেছে। আজি মম উদ্বেলিত প্রাণ।
হে অনন্ত ! চির স্থির তোমার প্রশান্ত বক্ষ তলে
সকল বন্ধন টুটি নিমেষের মাঝে নানা ছলে
আপনারে ফেলেছে হারায়ে ! তুমি গোপন ইঙ্গিতে
আমারে ডাকিছ ওগো—লয়ে গেছ মোর মুগ্ধ চিতে
আনন্দ রাজ্যের মাঝে কোথা কোন্ অসীমের পারে—
যেথা নাই কোনো দ্বন্দ্ব—আস্ফালন কারো বারে বারে

অন্তর খানিরে যেথা ত্রস্ত করি কভু নাহি তোলে,
মীমাংসা ফুরায়ে গেছে যেথায় তর্কের দম্ভ রোলে ;
তুচ্ছ যেথা অনাদর—দর্পোন্নত সহস্র বিভব
ধূলি-প্রায় গণ্য যেথা ! হে গম্ভীর ! হে চির নীরব !
ধরণীর শ্যাম মস্তে সদা তব করুণা নির্ঝর
সুবিপুল বক্ষ বাহি ঝরি ঝরি পাড়ি, নিরন্তর
কি সে আশীর্ব্বাদ তব জানায়ে দিতেছে অবিরাম
অচেতন—চেতনের কানে ? লহ আমার প্রণাম,
সারা বিশ্ব ডুবে যাক্ সিন্ধুর উত্তাল উর্ম্মী তলে
গ্রহ তারা কক্ষচ্যুত—বিচূর্ণিয়া যাক্ দলে দলে,
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যাক্, নিভে যাক্ সকল প্রয়াস—
কণ্ঠ মোর যাক্ থামি—যত চিন্তা যত মর্ম্মোচ্ছ্বাস
মুহূর্ত্তে হউক স্তব্ধ ! ওগো বন্ধু ! সবি যাক্ থামি
অপলক রহি জাগি হেথা শুধু তুমি আর আমি !

শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বকথা

(৫)

তত্ত্বকথা শুনাইতে আমার জনম ।
জ্ঞান অজ্ঞানের পারে থাকি অনুক্ষণ ॥
আমারে ধরিতে পারা বড়ই কঠিন ।
অজ্ঞানী দূরের কথা, জ্ঞানী শক্তিহীন ॥
আমারে ধরিতে যদি হয়ে থাকে মন ।
অজ্ঞান নাশিতে কর জ্ঞান আহরণ ॥
তারপর উভয়ের দাও বিসর্জ্জন ।
তবেই পারিবে মোরে করিতে ধারণ ॥

—বিজ্ঞানী

জীবনের হিসাব নিকাশ

বৈচিত্র্যই সৃষ্টি; নির্দ্দোষ, সম ব্রহ্ম হইতে এই বিষম, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসার প্রাঙ্গনে আবির্ভূত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়ে ব্যাপৃত আছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাঁহার আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন এবং বৎসরান্তে হিসাব পরীক্ষা করেন। "বেওয়া মিল" করেন। যাঁহার লাভ হয় তিনি আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহার ক্ষতি হয় তিনি নিরানন্দ অনুভব করেন; সাধারণতঃ ইহাই রীতি।

কিন্তু কয়জনে প্রকৃত পক্ষে আপনার কর্ম্মের হিসাব পরীক্ষা করেন? অষ্টাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ অতীত হইল সংসারে আসিয়া কি করিলাম কর্ম্মের অকর্ম্মের, বিকর্ম্মের "বেওয়া মিল" ত করি নাই।

ভগবানের নির্দ্দেশে নিজ কর্ম্মানুসারে বিশ্বের যে ক্ষুদ্রতম স্থান আমার অধিকৃত হইয়াছে তাহাতে মানব জীবন পরিমাণের সুদীর্ঘ কাল কিছু না কিছু করিয়া আসিয়াছি। নিজ ব্যবসায় উপলক্ষ্যে যাহা করিতে হইয়াছে তাহার একটা স্থূল হিসাবও রাখা হইয়াছে ও আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত "আমির" হিসাব কই রাখিয়াছি। তাহার ত লাভ লোকসান খতান হয় নাই; তাই মনে হয় জীবনের সন্ধ্যাকালে একবার হিসাব দেখা ভাল।

জীবন প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া কত পাইয়াছি কত হারাইয়াছি; প্রথমেই শিশুকালকে পাইয়া তাহা হারাইয়াছি, কৈশোরকে পাইয়াছি তাহা হারাইয়াছি, যৌবনকে পাইয়া তাহা হারাইয়াছি; প্রৌঢ়কে পাইয়া তাহা হারাইয়াছি এক্ষণে বার্দ্ধক্যে উপনীত। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা হারাইয়া মহাপ্রস্থান করিব আমার এখানকার দোকান পড়িয়া থাকিবে, আমি এক সম্পূর্ণ নূতন অজ্ঞাত রাজ্যে উপস্থিত হইয়া আপন কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্মের ফলভোগ করিতে থাকিব।

জীবন প্রভাতেই সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী স্নেহময়ী মাতা, মূর্ত্ত ভগবান সদৃশ স্নেহপ্রবণ পিতা, অশেষ করুণার উৎস আত্মীয় স্বজন লাভ করিয়া কতই না আনন্দে কাল অতিবাহিত করিয়াছি ; তখন সুখের পরিমাণ অধিক, দুঃখের মাত্রা কম আর সে সুখ দুঃখ শিশুর সুখ দুঃখ, পরিণত বয়সের সুখ দুঃখের তুলনায় নগণ্য ; অল্পেই সুখ, অল্পেই দুঃখ। বয়সের সঙ্গে বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ হইয়া কিশোর কাল, যৌবন কাল আসিল ; বিদ্যাত্যাগ করিয়া ও সেই সেই কালোচিত অন্যান্য কার্য্য করিয়া জীবন কাটাইলাম। বিদ্যাত্যাগের ফলে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া কখনও হর্ষযুক্ত, কখনও অকৃতকার্য্যতার ফলে ম্রিয়মান। জীবননদী একরূপে প্রবাহিত হইতে লাগিল ; ক্রমশঃ জটিলতর সুখ দুঃখের আবির্ভাব হইতে লাগিল। যথাসাধ্য দুঃখের প্রতিকূল আচরণ করিয়া সুখের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলাম। নূতন নূতন আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইলাম ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমূহের ক্রম-পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। স্ত্রী পুত্রাদি লাভ করিয়া নূতন নূতন আনন্দ নূতন নূতন দুঃখের আশ্বাস পাইতে লাগিলাম ; তখন সুখ দুঃখের পরিমাণ বোধ হয় সমান সমান। জীবন সন্ধ্যায় দেব সদৃশ পিতা, স্নেহময়ী মাতা ও করুণার সাগর আত্মীয় স্বজনকে হারাইতে লাগিলাম, তাঁহারা একে একে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন—হৃদয় রাজ্যের এক একটা দিক যেন মরুভূমিতে পরিণত হইল ; তাঁহাদের জ[illegible] শোকাকুল হইলাম। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম ; সম্বন্ধ ফুরা[illegible] নূতন আত্মীয় স্বজনের সমাগমে সুখী হইলাম আবার তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বা হারাইয়া তীব্রতর দুঃখ অনুভব করিলাম। এইরূপ কখনও সম্পদ সুখে হাসিতে থাকি কখনও বিষাদকালে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে থাকি। হাঁসি কান্নার ভিতর দিয়া, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া জীবন যাত্রা শেষ হইতে চলিল। হৃদয়ের প্রকৃত উপাস্য দেবতাকে স্থানান্তরিত করিয়া অর্থের পূজা করিতে লাগিলাম ; অক্লান্ত পরিশ্রমে কিছু উপার্জ্জন করিয়া কোন উপায়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিলাম, শেষ পর্য্যন্ত কিছু রাখিতে পারিলাম না, বার্দ্ধক্যের সময় পর্য্যন্ত থাকিল না।

২

বাল্য জীবনের সরলতা, পবিত্রতা, সৎসাহস, উৎসাহ, উদ্যম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, উদারহৃদয়তা, সহানুভূতি, আনন্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল; শেষে কুটিলতা, মলিনতা, হিংসা, সংকীর্ণহৃদয়তা, পরশ্রী কাতরতা, ভীরুতা, নিরুৎসাহ, অবসাদ, নিরানন্দ আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিল। মোটের উপর সুখের অপেক্ষা দুঃখই বেশী হইল; লাভের অপেক্ষা লোকসানই বেশী হইল।

যেমন আমার জীবনে তেমনই অনেকেরই জীবনে, অনেকেরই বা বলি কেন—গড়পড়তা হিসাব ধরিলে—প্রায় সকলেরই জীবনে ঐ অবস্থা; অবশ্য সংসারে কোন কোন ভাগ্যবান থাকিতে পারেন যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। যেমন ব্যষ্টিতে তেমনই সমষ্টিতে; যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনই সমাজের জীবনে। যেন ক্রমেই শান্তির অবস্থা লোপ পাইতেছে, দুঃখের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। এই যে ইউরোপে সমরের দাবানল, অশ্বের হ্রেষারব, কামানের গর্জ্জন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সৈনিকের কোলাহল, লক্ষলক্ষ জীবননাশ, পরিবারের আর্ত্তনাদ, হাহাকার, ধনী নির্ধনের মধ্যে কলহ, বণিক শ্রমিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সমাজের মধ্যে অশান্তি একি সুখের লক্ষণ বা দুঃখের জ্বলন্ত ছবি। এই যে আমাদের দেশে অনশন, ব্যাধি, অকালমৃত্যু, পরাধীনতা, পরপদলেহন, দারিদ্র্য, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, শিক্ষার অভাব, একতার অভাব, জাতি সংঘর্ষ, স্ফূর্ত্তির একান্ত অভাব একি সুখের লক্ষণ অথবা দুঃখের জ্বলন্ত ছবি। এই সকল দেখিয়া মনে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়—একি বিশ্বপিতার প্রেমরাজ্য। প্রেমময়ের প্রেমলীলা, না—মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য। শুনিয়াছি তিনি আনন্দঘন আমরা তাঁহার প্রিয় সন্তান, পিতৃধনের অধিকারী; তবে সংসারে এত দুঃখ কেন? কেন এমন হয়? মনীষিগণ বলেন দুঃখের ভিতর দিয়াই সুখে পৌছান যায়, মৃত্যুর ভিতর দিয়াই নবজীবন লাভ করা যায়, প্রলয়ের ভিতর দিয়াই নবসৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়। পুরাণে, ইতিহাসে যে কতকটা তাহার আভাস না পাওয়া যায়—তাহা নহে, হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে জগৎ প্রপীড়িত হইলে নৃসিংহদেব আবির্ভূত

হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিলেন, জগতের পরিত্রাণ করিলেন নূতন জীবনধারা বহিতে লাগিল; রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন জর্জ্জরিত হইতে লাগিল, রামচন্দ্র আবির্ভূত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিলেন, পৃথিবীতে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইল, অশান্তি দূর হইয়া শান্তিরাজ্য স্থাপিত হইল। কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ রাজন্যবর্গের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। দুষ্কৃতকারীর বিনাশ সাধন হইল, আবার সংসার উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। আমাদের অবতারবাদের বোধ হয় ইহাই গূঢ়রহস্য।

আলোচনা করিয়া দেখা গেল কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজগত জীবনে, কি রাষ্ট্রগত জীবনে সুখের অপেক্ষা দুঃখের মাত্রাই যেন অধিক। এখন জিজ্ঞাস্য—ইহার কারণ কি? অখিলময়ের কি তাহাই অভিপ্রায়, তাহাই কি বিধাতার উদ্দেশ্য? সম্ভবপর নহে। কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায়—অজ্ঞানই এই দুঃখের কারণ; অবিদ্যা, সুশিক্ষার অভাব—ইহাই দুর্গতির মূল। আমি আমাদের দেশের কথাই বলিব। আমরা প্রকৃত জ্ঞান হারাইয়াছি; শুধু জ্ঞান হারাণ নহে জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা হইতেও বিচ্যুত হইয়াছি। আমাদের দেশে কি ছিল? ছিল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রম ও এই সকল বর্ণ ও আশ্রমে উচিত নিয়ম ও ব্যবস্থা ও তাহা প্রতিপালনের সদুপায়। বিস্তৃতভাবে ঐ বিষয়ের আলোচনা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া সব নষ্ট হইয়াছে; সে বর্ণ বিভাগও নাই সে আশ্রম বিভাগও নাই। যে মহামহীরুহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া আমরা এক-দিন সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম। যাহার সুস্নিগ্ধ পূত ছায়ায় বাস করিয়া আমরা একদিন জগতকে পরাবিদ্যা, অপরা-বিদ্যা, শিল্পকৌশল, সভ্যতা দান করিয়াছিলাম সেই মহামহীরুহ কাল-সহকারে মৃতপ্রায়, আর তাহা ফলফুলে, শাখাপত্রে সুশোভিত নহে।

শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডরূপে পরিণত। তাই আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সে গুরুগৃহে বাস নাই। সে ধর্ম্মশিক্ষা নাই। অর্থকরী বিদ্যার সহিত তত্ত্ববিদ্যার প্রচলন নাই। সে ব্রহ্মচর্য্য নাই। সে গুরুর মহান আদর্শ নাই। সে সত্যের প্রতি অচলা ভক্তি নাই। এখনকার পাঠশালায়, স্কুলে, কলেজে Godless Education; শুষ্ক, শিক্ষক অধ্যাপকের প্রাণহীন, প্রেমশূন্য শিক্ষা; আদর্শের অভাব। যে আধ্যাত্মিকতা আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ তাহার আদর নাই। Plain living and high thinking চলিয়া গিয়াছে; আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। পাশ্চাত্যভাবের বিচার বিহীন wholesale অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কার হইতে বিচ্যুত হইয়াছি।

পাশ্চাত্যের নিন্দাবাদ আমার উদ্দেশ্য নহে। পাশ্চাত্যের গৌরবের অনেক জিনিষ আছে। বহু সদগুণ আছে যদ্দারা ফলে তাঁহারা অধুনা জয়যুক্ত ও রাজশক্তিরূপে পরিগণিত। রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মনীষিগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল স্বরূপ তাহা নিন্দনীয় হইতে পারে না। তবে একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে উহাঁরা কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নহেন; পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রাচ্য শিক্ষার সম্মিলিত উপাদেয় ফল; বরঞ্চ তাঁহাদের জীবনে প্রাচ্যের প্রভাবই অধিক পরিলক্ষিত হয়। আমার কথা এই যে পাশ্চাত্যের নিকট আমাদের অনুকরণীয় অনেক জিনিষ থাকিলেও Spiritualityর অভাব তাহার মারাত্মক defect। অনুকরণের এক প্রধান দোষ এই যে অনুকরণকারী অনুকৃতের সদগুণাবলী যত গ্রহণ করুক না করুক তাহার উপরের আপাত মনোরম অথচ অসার ভাবগুলি ঝটিতিগ্রহণ করিয়া থাকে। বিবেক বিচার দ্বারা তুলনা করিয়া তাহার যোগ্যতা অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া গ্রহণ করিবার অবসর পায় না। ঘটিয়াছেও তাহাই। আমরা বিচার বিহীন ভাবে সমস্তটুকু গ্রহণ করিতে

গিয়া নিজেদের সমস্ত পৈতৃক ধন হারাইতে বসিয়াছি। Physical conquest তত বিপদজনক নহে যত Cultural conquest. এখন যাহা বলিতেছিলাম—

স্থূলতঃ সুশিক্ষার অভাবই আমাদের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ। আমাদের Perspective of vision বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে হইল।

সুখ আমরা চাই; এ সম্বন্ধে মত ভেদ নাই; পাশ্চাত্যে প্রাচ্যে প্রভেদ নাই। পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন।

"O happiness, our being's end and aim!
Good, pleasure, ease, content! whate'er thy name
That something still which prompts th' eternal sigh,
For which we bear to live, or dare to die."

POPE EPISTLE IV.

—চাইত পাইনা কেন? পাইনা,—সুখ কাহাকে বলে তাহার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া।

আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি গুলি বহির্ম্মুখী, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণ ধাবিত হয়, অনুকূল বিষয়ের সংসর্গে সুখ লাভ করে, প্রতিকূল বিষয় সংযোগে দুঃখ পায়। কিন্তু এই সুখ স্থায়ী নহে, ক্ষণিকমাত্র। ঘোর অন্ধকার মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায়। কেন না যাহার সহিত সখ্য করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে যাই, সেই প্রণয়ের পাত্রই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তাহা হইলে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হইবে। যদি এমন কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি যাহা ক্ষণস্থায়ী নহে পরন্তু অবিনশ্বর তবে আনন্দও স্থায়ী হইবে। সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্"—ক্ষুদ্র পদার্থ লইয়া সুখ নাই, ভূমাতেই সুখ।

ঋষিগণই আমাদের গুরু; তাঁহারাই আমাদের পথ প্রদর্শক। তাঁহারাই ধর্ম্মের ধারা, পোষক, পালক। প্রকৃত সুখ পাইতে হইলে তাঁহাদের নিকট সুখ কি তাহা জানিতে হইবে; শাস্ত্রই তাঁহাদের

মুখ। শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইতে হইবে। আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি তবে দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে অর্জ্জুন-সারথি-রূপে ভগবান জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত যে অমূল্য সংগীত শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাই দীন শিক্ষার্থী রূপে পাঠ করিয়া, যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা হইতেই উত্তর পাইতে চেষ্টা করিব।

গীতার ২য় অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃসুখম্ ॥"

অশান্তচিত্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? শান্তিই সুখের মূল। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই তাহার ভাবনাও নাই। ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তি-ও নাই। শান্তি বিহীন পুরুষের সুখ নাই। এখানে যে "বুদ্ধি" ও "ভাবনা" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। আমরা সচরাচর "এই বালকটি বুদ্ধিমান" বলিলে যে বুদ্ধি বুঝি অথবা "ঐ লোকটির কোন ভাবনা নাই" বলিলে যে ভাবনা বুঝি সেরূপ সাধারণ বা loose অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শাঙ্কর ভাষ্য বলিতেছেন,—অযুক্তস্য অসমাহিতান্তঃকরণস্য বুদ্ধিঃ আত্মস্বরূপবিষয়া নাস্তি। নচ অস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ অস্তি। তথা নচ অস্য অভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশং অকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে। বুদ্ধি অর্থে আত্মস্বরূপ বিষয়া বুদ্ধি, ভাবনা অর্থে আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ, আত্মধ্যান। পুরুষকে প্রথমে যুক্ত হইতে হইবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে হইবে; ইন্দ্রিয় অর্থে কেবল বাহ্য ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে না অন্তর ইন্দ্রিয় বা মনকেও বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে, তাহাদিগকে বহির্ম্মুখী হইতে না দিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিলে শ্রবণ মনন দ্বারা আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উদয় হইবে; তখন নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনা অর্থাৎ আত্মধ্যান উপস্থিত হইবে, তাহার ফলে জীব আত্ম সাক্ষাৎ কার রূপ শান্তি লাভ করিবে।

ইহার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, কামনার ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ ও তাহা হইতে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধিনাশ হইলেই মানুষ বিনষ্ট হয়।

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

এই দুই শ্লোকে ভাবনার মূলে যে বুদ্ধি তাহা কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই উক্ত হইয়াছে। রাগদ্বেষবিমুক্ত ও আত্মবশীকৃত ইন্দ্রিয়-গণ দ্বারা বিষয়ের সেবা করিয়া বিধেয়াত্মা অর্থাৎ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ আত্ম প্রসাদ লাভ করেন; আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে তাঁহার সর্ব্ব প্রকার দুঃখের হানি বা নিবৃত্তি হয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিলে সতত ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ের সংস্পর্শে চিত্ত মলিন হয়; মলিন দর্পনে যেমন বস্তুর যথাযথ প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয়না মলিন চিত্তেও সেইরূপ সত্যের ছায়া পড়ে না, সদ্বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথাই পরিষ্কার ভাবে লিখিত হইয়াছে—

"ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথাতেনেদমাবৃতং॥
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

যেমন ধুম দ্বারা বহ্নি, ধূলিকণাসমূহ দ্বারা দর্পন এবং জরায়ু-চর্ম্ম

দ্বারা গর্ভ আবৃত হয় তেমনই জ্ঞানীর নিত্যবৈরী কামরূপ দুষ্পূরণীয় অনলের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। কামই—বাসনাই জ্ঞানের নিত্যশত্রু।

(ক্রমশঃ) শ্রীহরিপ্রসাদ বসু

গুরু

১

পতিতের হৃদিমাঝে, কে তুমি নীরবে এস ?
কে তুমি গো প্রেমময়, পাতকীরে ভালবাস ?
কে তুমি এ মরুমাঝে, ঢালিছ করুণা ধারা ?
চাহিয়া ও মুখ পানে, এ আঁখি নিমেষ হারা।

২

কে তুমি গো জাগাইলে, চিরসুপ্ত এ পরাণ ?
সহসা এহৃদি কেন, গাহিছে প্রেমেরগান।
চির পরিচিত কিম্বা, অজানা অচেনা তুমি ?
ওপদে সঁপিতে প্রাণ, আজি গো অধীরা আমি।

৩

ও আঁখি-কমল হতে, ঝরিছে করুণারাশি ;
শ্রীমুখে মধুরবাণী, "কাঙ্গালেরে ভালবাসি।"
মোহন মুরতি হেরি, মোহিত মানস মম ;
এমরু সাহারা মাঝে, কে তুমি গো অনুপম ?

৪

মমতায় মাখা বুঝি, তোমার হৃদয়খানি ?
পতিতের দুখদেখে, চরণে লইলে টানি।
তোমারে হেরিয়া আজি, আনন্দ উথলে প্রাণে ;
চির-পরিতৃপ্ত আমি, শ্রীচরণ দরশনে।

৫

তমোময় এ জীবন, তব কৃপালোক পেয়ে ;
তোমারি চরণ পানে, আনন্দে চলেছে ধেয়ে।
কি এক অজানা টানে, নিতেছ টানিয়া মোরে ;
জীবন রাগিণী আজি, বাজিছে নূতন সুরে।

৬

তোমারে বাসিতে ভাল, কেন এ পরাণ চায় ?
ক্ষণেক বিচ্ছেদ হলে, কেন আঁখি উথলায় ?
ছুটেছে জীবন নদী, ওরাঙা চরণ চুমি ;
চিনেছি চিনেছি প্রভো ! "পতিত পাবন" তুমি।

৭

পূজিতে ও পদাম্বুজ, মনে জাগে আকিঞ্চন ;
কি দিয়ে পূজিব প্রভু ! আছে মোর কি রতন ?
শুধু গো এনেছি আজি, ভকতি কুসুমরাশি ;
চির স্নেহে লও তাই, কাঙ্গালেরে ভালবাসি।

শ্রীসুরমা বসু

তত্ত্বকথা

(৬)

কর্ম্ম দেখে ভয় পায় হীনবুদ্ধি জন।
বলে কিনা কর্ম্ম হয় বন্ধন কারণ॥
কর্ম্ম যে মুক্তির হেতু তাহা নাহি ভাবে।
কর্ম্মহীন হলে যেন সদ্য মুক্তি পাবে॥
কর্ম্ম কর ভয় নাই ওরে ভ্রান্ত জন !
কর্ম্মেতেই পাবে মুক্তি, কাটিবে বন্ধন॥
সকাম হইলে কর্ম্ম ঘটিবে বন্ধন।
নিষ্কাম হইলে তাহা মুক্তির কারণ॥

—বিজ্ঞানী

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

১৩ই জুলাই

স্থান :—কাশী রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

মহারাজ বারান্দায় আসিবার কালে বাবাজীর জুতা দৃষ্টে বল্লেন—এত বড় আর কার পা, এ নিশ্চয়ই বাবাজীর হবে। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা তুলে বলতে লাগলেন,—

—ঠাকুর বলতেন শরীরের চিহ্ন দেখলে সব টের পাওয়া যায়। তিনি আমাদের নেংটা করে অবধি দেখতেন। কাঠি দিয়ে মাপতেন। হাত ওজন করতেন। এক একটা লোক কি ধরণের, শারীরিক চিহ্ন দেখে তা ধরে ফেলতে পারতেন। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন ঘর, থাক ছিল—কিন্তু সবারি জন্য তাতে জায়গা ছিল। আমাদের মধ্যে মান্দ্রাজে শশী মহারাজও কিছু কিছু ওরকম কত্তেন। ঠাকুর মেনে গেছেন, তাই মঘা অশ্লেষাতে কাউকে চিঠি লিখতেন না,—এমন সময়ও চিঠি যেন না পৌঁছে যখন মঘা বা অশ্লেষা থাকবে। তবে আমি স্বামিজীর সঙ্গে বেশী মেশামিশির দরুণ ও সব বড় একটা মানতাম না।

স্বামিজী কত সব লোক সঙ্গে করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন। তা দেখে ঠাকুর বলতেন—"তুই কি সব লোক নিয়ে আসিস্, কাণা খোঁড়া। তুই লোক চিনিস্ না—যাকে তাকে নিয়ে আসিস্ নি।"

স্বামিজী সর্ব্বদা দুর্ব্বলকে সাহায্য করতেন। বলতেন—"যে যত দুর্ব্বল তাকে তত সাহায্য কর। বামুনের ছেলের জন্য যদি একটি পণ্ডিত দরকার হয় তবে পেরিয়ার ছেলের জন্য চারটি পণ্ডিত নিযুক্ত কর।" কি চমৎকার বলতেন দেখ।

একবার ঠাকুর জনৈক মহিলা ভক্তের উপর ভারি চটে গেলেন—সবাইকে বলে দিলেন, কেউ ওর বাড়ী যাবিনি, কেউ ওর হাতে

খাবিনি,—তাঁকেও দক্ষিণেশ্বরে আসতে মানা করে দিলেন। ঠাকুর তাঁর উপর বাস্তবিক চটে গিয়ে মানা করছেন, কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে যাবে? স্বামিজী কিন্তু মহাপুরুষকে ডেকে বল্‌লেন—চল বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বাড়ী এসে হাজির। এসেই বল্‌লেন "—মা, খাবার দাও, খাব।" তিনি তো আনন্দেই অধীর। শেষে একটা মাছ আনিয়ে রেঁধে খাওয়ালেন। ওখান থেকে খেয়ে এসে ঠাকুরকে বলছেন"—মার বাড়ী গিয়ে খেয়ে এলুম্।" ঠাকুর বললেন—"সে কিরে? আমি বারণ করলুম, আর তুই গিয়ে খেয়ে এলি?" স্বামিজী বললেন —"খাব না? তাঁকে এখানে আসতেও বলে এসেছি।"

হাজরার জন্য একবার ঠাকুরকে ধরে পড়লেন। ঠাকুর তখন কাশীপুরে, কিছুতেই ছাড়ছেন না—বলছেন—"এর একটা গতি করে দাও, একে একটু কৃপা কর।" ঠাকুর বললেন—"এখন কিছুই হবে না, যাও। এর মৃত্যু সময় হয়ে যাবে।" ঠিক তাই হয়েছিল। স্বামিজী কৃপা ট্‌পা ভেতরে ভেতরে বেশ বিশ্বাস করতেন।

লাটু মহারাজ যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তেন বলে ঠাকুর একবার খুব রেগে যান—তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। শেষে স্বামিজী ধরে পড়ে সব গোল কাটিয়ে দিলেন। এর জন্যই লাটু মহারাজ বলতেন— "যদি গুরুভাই হয় তবে বিবেকানন্দ্।"

একবার মঠে একটি ছেলে থাকবার জন্য এল। সকলেরই আপত্তি। স্বামিজী বললেন—"ঠাকুর ভেতর দেখতে পাত্তেন, কাজেই রাখা না রাখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ঠিক হত। আমি ত ভেতর দেখতে পাই না, কাজেই আমি সবাইকে সুযোগ দিতে রাজি আছি। তোমরা যদি ঠাকুরের মত ভেতর দেখতে জেনে থাক তাহলে বরং ওকে রেখে কাজ নেই।" তারপর জনা জনার মত নেওয়া হতে লাগল। আমায় জিজ্ঞেস করা হল। আমি বল্‌লাম—"আমি বেশ লক্ষ্য করে দেখছি ঠাকুর যাকে না রাখেন তার এখানে থাকার যো নেই, যে থাকবার সে থাকবে—সে যাবার যে যাবে।" আমার কথায় স্বামিজী বললেন—"বেশ বলেছিস্, খুব সুন্দর কথা।" ছেলেটা

কয়েকদিন থেকে চলে গেল। যাবার সময় কিছু চুরিও করে নে গেল।

গিরীশবাবুর মত লোক পর্য্যন্ত ঠাকুরের কাছে স্থান পেত, তিনি সবাইকে খাপ খাইয়ে নিতে পাত্তেন। আমরা করি কি—যার যাব নিজের মত করে গড়তে যাই। তিনি কিন্তু যে যেখানে আছে সেখান থেকেই তার উন্নতির জন্য তাকে ধাক্কা দিতেন। কাউকে নিজের মত কত্তে না পেরে তাকে নিরাশ করেন নাই। ঠাকুর এক একজনের সঙ্গে এক এক ভাব কত্তেন আর সেটা বরাবর রক্ষা কত্তেন। হাঁস ঠাট্টার ভেতর দিয়ে খুব শিক্ষা দিয়ে দিতেন। আহা, তিনি যথার্থ আচার্য্যই ছিলেন। এ রকম আচার্য্য কোথায় মেলে! স্বামিজীও খুব রসিক লোক ছিলেন একদিন একটা ছুরি দিয়ে কাজ কত্তে কত্তে তার আগাটা গেল ভেঙ্গে। ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি মন খারাপ করে বসে আছি। স্বামিজী শুনে বল্লেন—"ওত ওরকম করেই যায়, ওর ত আর ওলাউঠা বা বাতশ্লেষ্মা রোগ হবে না।" আমি কথা শুনে হেসে ফেল্লাম। কি চমৎকার বললেন, দেখ।

মা যা ছেলেকে শেখায় তা ছেলে কত দৃঢভাবে শেখে! মা, শিক্ষা দিচ্ছি—এ কথা বলে না। ছেলেরও মায়ের কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে সব চেয়ে ভাল শিক্ষা হয়ে যায়। একটা ভালবাসা আছে কি না। যিনি আচার্য্য হবেন, তাঁর মনটাকে—যিনি শিক্ষা পাচ্ছেন, তাঁর মনের সঙ্গে এক করে নিতে হবে। তবে ত সে উপকার পাবে।

একবার জব্বলপুর থেকে একজন ভদ্রলোক ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। ভদ্রলোকটি খুব পণ্ডিত ব্যক্তি—এম্ এ, বেশ সরল অথচ নাস্তিক। ঠাকুরের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক করলেন। এদিকে বলছেন তার মনে নানা অশান্তি, অথচ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন না। বলছেন, ভগবান আছেন কি না তার ত কোন প্রমাণ নেই। ঠাকুর বললেন—"দেখ, এই বলে প্রার্থনা কত্তে ত তোমার আপত্তি নেই, যদি কেউ থাক তাহলে আমার কথা শুন। এ বলে

প্রার্থনা করলে তোমার ভাল হবে।” ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চুপ করে ভেবে শেষে বললেন—না, এতে আমার আপত্তি নেই। ঠাকুর বললেন, এ রকম করে, আবার আমার কাছে এসো। ভদ্রলোককে তারপরে দেখেছি, সে মানুষ আর নেই। ঠাকুরের পা ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন—আপনি আমায় রক্ষা করেছেন।

স্বামিজী একবার স্পর্শ করে কিডির * মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। কিডি ভারি নাস্তিক ছিল। কখনও কখনও স্বামিজীর একটা খুব শক্তি এসে যেত। তখন কাউকে স্পর্শ করে তার ভেতর যেন ধর্ম্মভাবটা প্রবেশ করিয়ে দিতেন।

আর একবার এমন হয়েছিল কাশীপুর বাগানে শিবরাত্রিতে ধ্যানে বসেছেন। স্বামিজী ধ্যান কত্তে কত্তে একজনকে বললেন আমার উরু ছোঁ ত—যেই ছোঁয়া অমনি তার গভীর ধ্যান হয়ে গেল। ঠাকুর যেন সব বুঝতে পারতেন—তিনি বললেন, “নরেনকে ডেকে নিয়ে আয় তো” স্বামিজী নিকটে এলে বললেন—“ও কি কচ্ছিলি ? আগে জমা, তবে তো খরচ করবি, জমাবার আগেই যে খরচ কচ্ছিস্ রে !”

স্বামিজী সত্যই পরকে সাহায্য কত্তে পাত্তেন। তাঁর এমন কিছু গোপন জিনিষ ছিল না যা তিনি অপরকে দিতে না পাত্তেন আমাদের ত ঐখানেই মুস্কিল। যদি কেউ আমাদের থেকে বড় হয়ে যায় ঐ ভয়। তিনি কিন্তু এত উপরে ছিলেন যে তাঁর ও ভয় ছিল না। তাঁর ঈর্ষা ছিল না। তিনি বলতেন—“যে যে জায়গায় আছে তাকে সে জায়গায় সাহায্য কর। তার যেখানে অভাব সে জায়গাটা তার পুরিয়ে দাও। না পার জোর করে তাকে তোমার মত করতে চেষ্টা করো না”

ঠাকুর কেমন চমৎকার করে এক একজনকে তার অভাবের পূরণ করে উপদেশ দিতেন। বলতেন—“মা মাছ দিয়ে নানা রকম করে

---

* সিঙ্গার ভেলু মাদালিয়ার নামক মান্দ্রাজী অধ্যাপক। ইনি অনেক সময় ফলমূল খাইয়া থাকিতেন বলিয়া স্বামিজী ইহাকে রহস্য করিয়া কিডি বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় কিডি বলিতে পক্ষী বুঝায়।

রেঁধেছেন, সব ছেলেকে এক জিনিষ দিচ্ছেন না, যার যা, পেটে সয় তাকে তাই দিচ্ছেন" ঠাকুর কাজের বেলায়ও এমনি করতেন। একবার যোগীন স্বামী কোথায় ঠাকুরের নিন্দা শুনেও কিছু বলেন নি, চুপ্‌টি করে শুনে এসে সে কথা বলছিলেন। ঠাকুর শুনে বললেন —"আমার নিন্দা করল আর চুপটি করে শুনে এলি।" তাঁকে অনেক মন্দ বললেন। আর কতদিন পর নিরঞ্জন স্বামী একদিন নৌকাতে দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন। সেই নৌকায় কতগুলি লোক ঠাকুরের নিন্দা কচ্ছিল। অমনি তিনি বের হয়ে এসে দুদিকে পা দিয়ে নৌকা দোলাতে দোলাতে বললেন—"তোরা ঠাকুরের নিন্দা কচ্ছিস্ এখনি আমি এ নৌকা ডুবিয়ে দেব—দেখি, আমায় কে বাধা দেয়?" সকলের ত থরহরি কম্প। হাতে পায়ে ধরে তবে তাঁকে নিবৃত্তি করল। ঠাকুর একথা শুনে বললেন,—"শালা, ওরা আমার নিন্দা কচ্ছিল তাতে তোর কি?" দেখ কি কাণ্ড—যার যা পেটে সয়। এমন আচার্য্য কই?

বাংলার সমাজ

সেদিন বসির হাটে যে রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেল, তারি বিশাল মণ্ডপে এখানকার হিন্দু সভার তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন বসেছিল। জল অচল জাতিদের জল চল করার প্রসঙ্গে একজন মণ্ডল উঠে বললেন, 'আমরা জল চল হবার জন্য কোনো কাতর প্রার্থনা বা সবিনয় নিবেদন জানাচ্ছি না'। তাঁর বলবার ভঙ্গী, সংক্ষেপ বক্তৃতা এবং দৃঢ়ভাব অনেককেই বিস্মিত করেছিল। কিন্তু আমি তাঁর প্রাণের কথা অনেকদিন শুনেছি, তাঁদের মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করেছি, তাই বাংলা সমাজের কাহিনী নিয়ে সাধারণের নিকটে উপস্থিত হয়েছি।

শুনতে পাই আবেদন নিবেদনে স্বরাজ লাভ হয় না। ভিক্ষাপাত্র

হাতে রাজদ্বারে পঞ্চাশ বছর ঘুরে ভারতের নেতাগণ এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। বাংলার অধ্যাপক ব্রাহ্মণশ্রেণী রাজনৈতিক এই মন্ত্রে বহুকাল সিদ্ধ। তাঁরা কোনো যুক্তি, তর্ক, আবেদন নিবেদন, এমন কি ফাঁকা হুম্‌কিতেও হাজার বছর একচুল পথভ্রষ্ট হন নি। 'তোমার পৈতা নাই। তুমি একমাস অশৌচ গ্রহণ করে আসছ, অতএব তুমি শূদ্র, থাক ঐ খানে বসে। আহা, গুণকর্ম্ম অনুসারে তুমি যা প্রতিপাদন করছ তা হতে পারে, পশ্চিমের ক্ষত্রি, ক্ষেত্রি, বেনিয়ার কথা যা বলছ, তা হয়ত ঠিক, আমরা গ্রাম ছেড়ে পাদমেকং যাই না—কিন্তু বাপু তর্ক কোরোনা অশাস্ত্রীয় কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে যাও,—যতদিন একজন ব্রাহ্মণ বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হবে না, জেনো।

শূদ্রজাতি বুঝেছে যে ভিক্ষার দ্বারা ন্যায্য অধিকারও লাভ হয় না। অপিচ গুণ দেখিয়েও ঠাকুরের মন ভোলান যায় না। বাকি আছে দুই পথ—এক গান্ধি মহারাজের অসহযোগ অস্ত্র—যা প্রয়োগ করবার জন্য জল অচল জাতির মধ্যে একটা জল্পনা কল্পনা চল্‌ছে। আর দ্বিতীয় পথ সম্বন্ধে আমি আজ আলোচনা আরম্ভ করলাম।

আমার প্রধান বক্তব্য এই ১। ব্রাহ্মণ সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হন। বর্ণবিপ্র, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি যত রকমের ব্রাহ্মণ আছেন, সকলে পাংক্তেয় হন। পতিত ব্রাহ্মণকে শুদ্ধির দ্বারা সমাজে চলন করিয়া লওয়া হউক। ২। বর্ণের ব্রাহ্মণকে পাংক্তেয় করতে গেলেই তাঁদের শিষ্য সেবককে স্বধর্ম্মে ও বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। অর্থাৎ কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিকে ক্ষত্রিয় এবং অপরাপর সমস্ত জাতিকে বৈশ্যবর্ণে অভিহিত করতে হয়।

গুণকর্ম্ম অনুযায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন ব্যাপার মনে হয় না। পশ্চিম প্রদেশের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজ দেখ্‌লে বাংলাদেশের কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ, কৈবর্ত্ত নমশূদ্র, কপালি, পোদ প্রভৃতি জাতি যে যজ্ঞসূত্র ও বেদের অধিকারী তা স্বতঃই মনে হয়। সে দেশের মুটে মজুর গাড়োয়ান, চাষী প্রায় সকলেই উপবীতধারী অথচ তারা যে খুব নিষ্ঠাবান বা উচ্চশ্রেণীর জীব এমন বোঝায় না, তেমনি বাংলার ব্যবসায়ী ও কৃষক

সম্প্রদায়কে বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করলে যে তারা অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠে সমাজকে ছারেখারে দিবে, এমন মনে করবার হেতু দেখি না।

ভারতবর্ষের বিরাট অব্রাহ্মণ সমাজকে সংহত-ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পাংক্তেয় করবার জন্য শ্রীবুদ্ধ, কবির, দাদূ নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ স্বামী দয়ানন্দ, রাজারামমোহন, ভাই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি সংস্কারকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কেবল একত্র পান ভোজনের অধিকার পেলেই যদি বিরাট শূদ্র শ্রেণী খুসি হয়ে যেত, তবে এতদিনে দেশশুদ্ধ অব্রাহ্মণ—বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, মুসলমান বা ইংরাজ এঁদের মধ্যে মিশিয়ে যেত। এঁরা ত একসঙ্গে পান ভোজন. উপাসনা, অবাধ মেলামেশা বিবাহাদি প্রচলন কোরে রেখেছেন, বিরাট তবে সন্তুষ্ট নয় কেন, তবে বাংলার বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টানের প্রাণ সনাতন ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করতে লালায়িত কেন, আমি অনেক স্বধর্ম্মত্যাগী প্রাণবন্ত বাঙ্গালীর মনের বেদনা জানি, তাঁরা স্পষ্টই বলেন—যে প্রাণের মধ্যে এক সনাতন পুরুষ মধ্যে মধ্যে হাহাকার কোরে ওঠে; একটা বহুকালের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত গুমরানি দেহ প্রাণ মনকে চঞ্চল কোরে তোলে! যে ধর্ম্মে ও সমাজে তারা নূতন প্রবেশ করেছে, সেগুলো কিছুতেই রক্তের সঙ্গে খাপ খায় না। আর যাদের নিষ্ঠুরতায়, অবিচার অত্যাচারে এঁরা স্বদেশ, স্বজাতি ও সনাতন ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছেন, মাঝে মাঝে সেই সনাতনদের উপর সাংঘাতিক বিদ্বেষ জেগে ওঠে, কিন্তু শান্ত মুহূর্ত্তে অবসাদে, ধিক্কারে অনুতাপে প্রাণ জর্জ্জরিত হয়ে যায়। মূল বেদনাটা কোথায়? চার পাঁচ হাজার বছর ধরে আর্য্যজাতি একটা আদর্শকে ঘিরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে এসেছে। হাজার হাজার বছর ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মকে, যজ্ঞ ও শ্রুতিকে ঘিরে কোটী কোটী অব্রাহ্মণ পাহারা দিয়ে এসেছে, রক্ষার্থে জীবন দিয়েছে, গোপনে প্রাণের অর্ঘ নিবেদন করেছে। প্রকাশ্য পূজার অধিকার তবু তারা পেলনা, পাঁচ হাজার বছরেও তারা দ্বিজ সংস্কার পাবার অধিকার হলনা।

এই খানেই ভারতের অব্রাহ্মণের মর্ম্ম ব্যথা নিহিত রয়েছে। বাংলার বিরাট শূদ্র শ্রেণী, যারা গুণে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, আচারে ব্যবহারে

পশ্চিম দেশীয় বহুৎ বহুৎ ক্ষত্রি, ক্ষেত্রি, বনিয়া বা চাষা অপেক্ষা সদাচারী শুদ্ধাচারী, শিক্ষিত এবং ধর্ম্মপ্রাণ, তারা দ্বিজত্ব থেকে বঞ্চিত, হাজার বছর ধরে লাঞ্ছিত, পীড়িত—তাদের প্রতিরক্তকণা স্বাধিকার দাবী করছে। কেশব, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্ল, জগদীশের বংশীয়েরা শূদ্র, মাসান্তে শ্রাদ্ধ করছেন, ওম্‌কার উচ্চারণে অনধিকারী, রসুয়ে বামুনের দ্বারাও ত্যক্ত। এ প্রহসনের পেছনে যে মর্ম্ম বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তা বুঝবার মত হৃদয় শুষ্কপ্রাণ আভিজাত্য গর্ব্বী—ব্রাহ্মণের নাই। এ বেদনা ব্রাহ্ম, খৃষ্টান মুসলমান নাস্তিক, বৈষ্ণব, আর্য্য সমাজী—কোনো কিছু হোয়েও মুছে না ; এ দ্বিজত্বের ক্ষুধা, সমানাধিকারের গর্ব্ব, আর্য্যত্বের দাবী এ পর্য্যন্ত কোনো মহাপুরুষ মেটাতে পারেন নি। মান, যশ, বৈভব, উপাধি, উচ্চপদ—কিছুতেই এ মর্ম্ম ব্যাথা নিভে না, একশত আট পুরুষের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। বংশের পবিত্রতা ও প্রাচীনত্বের গৌরব হৃদয়েধারণ করে না, এমন মানুষ আমি দেখিনি। বাংলার সূত্রধারী যে কোনো বামুনের চেয়ে স্বনামধন্য শূদ্র কোন্ অংশে হীন, এ সমস্যার মীমাংসা কবে হবে, বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনো ছিল কিনা, কায়স্থ বৈদ্য নবশাখ প্রভৃতি সৎ আখ্যাধারী শূদ্রনামধেয় বংশীয়েরা মূলতঃ কি ছিলেন, আধুনিক ব্রাহ্মণের রক্তে কসের খাঁটি আর্য্যরক্ত বিরাজ করছে, আর সৎশূদ্রের দেহে কছটাক বইছে, এই সকল দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করতে করতে দু পাঁচশ বছর কেটে গেল সমাজ তবু নড়ে না, ভট্‌চাজ প্রাণের ব্যথা বুঝে না।

কতকগুলি সংস্কার হিন্দুর মজ্জাগত হয়ে রয়েছে ; ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, সমাজ রক্ষক ; সমস্ত শক্তি ও আর্য্য সদ্‌গুণের আধার, সকলের নমস্য, অনুকরণীয় আদর্শ পুরুষ। এদেশের মুসলমানেরাও ঠাকুরমশাইকে একটু সম্ভ্রম না কোরে পারে না, রক্তেরধারা এখনো বইছে যে। সে দিন খাঁ বংশীয় একজন মহাপ্রাণ বলছিলেন, যে স্বামী সত্যানন্দজী বৈষ্ণবধর্ম্মের নজীর দেখিয়ে তাঁদের শুদ্ধ হতে বলছেন, তিনি কি জানেন না, যে বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁদের চোখের সামনে কত বছর ধরে রয়েছে, তবু সে পথে তাঁরা যাবেন না ? কারণ তিনি ব্রাহ্মণবংশ

থেকে চ্যুত হয়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করেছেন, যদি হিন্দুসমাজ নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে, তাদের আদর কোরে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ কুলে ফিরে নেয়, তবেই তাদের তিনশত বছরের রুদ্ধ অভিমান ভেঙ্গে যেতে পারে। নচেৎ ও পুরোনো ফাঁকি, ও মৌখিক আশ্বাস ওতে মন ভিজে না।

ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, এ ভাবের জন্ম অনাদিকালের গর্ভে, এ ভাব নির্ম্মূল হতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। সহরে বসে আমরা স্বপ্ন দেখি, যে, সব একাকার হয়ে গেছে, স্বরাজ এলো বলে, বাংলাদেশটা যেন নেতাদের মুঠোর মধ্যে। ওসব দিবাস্বপ্ন ; বিরাট বাংলা সমাজের খোঁজ রাখেন কজন? শূদ্র সমাজের মনস্তত্ত্ব আলোচনা এক আমাদের স্বামিজী ব্যতীত কেউ করেছেন মনে হয় না। দশ বার পুরুষ মুসলমান হয়ে রয়েছে, তবু ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের জন্য ক্রন্দন নিবারিত হলনা, তবু সনাতন বৈদিক ক্ষুধা মধ্যে মধ্যে চাগিয়ে ওঠে, দরদি নইলে এ কথা বুঝাই কাকে।

ব্রাহ্মণের নীচে, এদেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাই, কাজেই সদাচার সদ্‌গুণ, শিক্ষা ও ধনে মানে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি তার নীচে নবশাখ, সৎশূদ্রজাতি, তার নীচে ঠাকুর মশাইদের বাধাশূদ্র শ্রেণী, তার নীচে অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অন্তেবাসিনঃ কয়েকটি জাতি! এই যে থাক, এটি নাকি স্বয়ং ব্রহ্মার ব্যবস্থা, কারুর সাধ্য নাই, এর সম্বন্ধে যুক্তি প্রশ্ন করতে! এই যে উচ্চ নীচ থাক, এই জাতি ভেদ, বাংলার দেবতা অনাদিকাল আগে একে বংশগত করে দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাই চলে আস্‌ছে শক, হুন, যবন, মোগল, পাঠান, তুর্কি, চীন, মগ, কাফ্রী, পর্ত্তুগীজ কত রকমের জাতি এসে বংশের দফা রফা করে দিয়ে গেছে, তবু 'বিরাট' মন সেই আদিকালের কথা বুঝে রেখে দিয়েছে—কার সাধ্য সে বিশ্বাস নাড়ে!

অন্যান্য জাতির দৈনন্দিন জীবন যাত্রা লক্ষ্য করলে আমাদের হিঁদু চোখে প্রথমেই ঠেকে, ওদের সমাজে সকলের জন্য সমান আইন, শিক্ষালয়ে সমান প্রবেশাধিকার, সর্ব্বত্র গুণের আদর, সকল প্রকার শ্রমই প্রশংসনীয় অর্থাৎ আমি বামুনের ছাওয়াল অতএব খুন করলেও

ফাঁস হবে না, এ ওরা বুঝে না। বামুন ছাড়া আর কেহ শাস্ত্র পড়লে অনর্থ হবে, দেবালয়ে গেলে একটা ভূমিকম্প হয়ে যাবে, এ ওদের মাথায় ঢোকে না। গুণ থাকলেই সে বড় হবে, এ হল ও দেশের কথা, আমরা বলি, গুণ থাকতে পারে মাত্র বামুনের চার পোয়া ক্ষত্রিয়ের তিন পো, বৈশ্যের দু পো এবং শূদ্রের এক পো। আর অন্ত্যজ যারা, তাদের গুণের ভাগে শূণ্যি, দোষের ভাগ এক সের। এবং এই গুণ ও দোষ সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান ঠিক করে বংশগত কোরে দিয়েছেন তাই চলে আসছে বরাবর, তুমি আমি কি ব্রহ্মার চেয়েও বড় যে গুণ দোষের বিচার করতে বসব? ঐ বামুন অগম্য গমন করছে অশাস্ত্রীয় কাজ করছে প্রত্যহ তা সকলে দেখ্‌ছে বটে কিন্তু ব্রহ্মণ্য শক্তি ১০৮ পুরুষ ধরে ওর শরীরে বয়ে আস্‌ছে। কলিকালের দোষে ডাইলুট হয়েছে বলতে পার কিন্তু হ্যানিমানের মতে ডাইলুট হলেই শক্তির বৃদ্ধি হয় কাজেই অন্যে যে দোষ করে সাম্‌লাতে পারে না, বামুন তার চেয়েও বেশী দোষ করে, শুধু সাম্‌লান নয়, সমাজে আরো বড় হয়ে রয়েছেন। এই হল ব্রহ্মণ্য শক্তির খেলা। এ রকম যুক্তি পল্লীগ্রামের ভটচাজ মশাই এর শ্রীমুখে আমি শুনেছি।

তারপর থাকের ভেতর থাক, এক থাকের সঙ্গে অন্য থাকের অমিল, প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এক একটি জাতি, গণ্ডি, তার মধ্যে আবার কুলিন, মৌলিক ভেদে উপজাতি এক উপজাতি অন্যের অপেক্ষা এক ইঞ্চি বড়, অপরে আধ ইঞ্চি ছোট। এই বড় ছোটর খেলায় বাংলা সমাজ তথা ভারতীয় সমাজ একেবারে মসগুল। সেদিন এক কুমোরের গিন্নি এসে পরিচয় করলেন, তাঁর সাত বেটা মরেছে পাঁচটি বিধবা বউ বাটিতে আছে তারা ধান ভাঙ্গে তাতেই চলে। এক একটি পুত্রের বিয়ে দিতে জমী জমা সব গেছে, এখন অন্নাভাব। হ্যাঁগা! ছেলের বিয়েতে এত খরচ কর কেন? বাবা আমাদের ঘরে মেয়ে মিলে না, কিনতে হয়। তা, তোমার বাটির পাশেই ত অনেক ঘর কামার বাস করে, তাদের মধ্যে ছেলে ও

অনেক দেখেছি, তাদের সঙ্গে বিয়ে দিলে কম খরচে হয় না? দাদাঠাকুর বলে কি গো! কামারে কুমোরে বিয়ে তাকি কখনো হয়! সংস্কার এত দৃঢ়, যে এসকল সামান্য মীমাংসা হিঁদু সমাজ এবং তাদের ঠাকুর মশাইদের কানে কর্কশ উন্মত্ত প্রলাপ বিবেচিত হয়। কামারে কুমোরে বিয়ে, সর্ব্বনাশ! কেন, একই শূদ্র শ্রেণীর শাস্ত্রে ত বাধা দেখি না? তাতে কি? আরে বৃত্তি ভেদের আপত্তি তুলছ? তা উকিলে ডাক্তারে বিয়ে হয়? আর তোমার ঐ কুমোরের ছেলেও ত কেরানিগিরি করে, আর ঐ কামারের মেয়ের বাপও ত সেরেস্তাদার। তবু হয় না। হয় না, হতে পারে না, গায়ের জোর নাকি! সব ম্লেচ্ছকাণ্ড।

সহরে বসে আমরা বুঝতে পারি না কি ভেদ, কি মলিনতা, মনের কতদূর জাত্যভাব হিঁদু সমাজের অন্দরে অন্দরে প্রবেশ করেছে। বড় ভাঙ্গন ধরেছে, দেহ মন প্রাণের ভেতরে ভাঙ্গন ধরেছে, আর রক্ষা হয় না বুঝি। পল্লীর মেয়েরা আর ব্রত করে না, কথা শুনে না, পুরাণ কথা কেউ বলে না, গ্রামের শঙ্খধ্বনি আর শোনা যায় না; মেয়ে ছেলেদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে, আকারে, সামর্থ্যে, সব ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্চে। জাতিকে জাতি অতি দ্রুত ধ্বংস পথে চলেছে।

হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরে অবকাশ সময়ে একটু নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ একটু স্ফূর্ত্তি, দেহ মন প্রাণ চায়। এ ক্ষুধা মেটাবার সুন্দর উপায় ছিল বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রত কথা, কথকতা, হাফ আক্‌ড়াই, তরজা, কীর্ত্তনে সেকালে পল্লীভূমি সর্ব্বদাই মুখরিত থাকত। সব লোপ পেয়েছে আর এদের স্থান অধিকার করেছে ফুটবল তাস দাবা পাশা, আর সর্ব্বনেশে মেলা, জুয়া আর পেশাকারের আড্ডা! পল্লী নগরী দুষ্ট ব্যাধিতে ছেয়ে গেল, তরুণের দল স্বাস্থ্য ও শ্রীভ্রষ্ট হল!

এ সমস্ত দুর্নীতির মূলে আমি বর্ণ বিপর্য্যয় দেখি; বাংলার শতকরা ছয় জন ব্রাহ্মণ, বাকি সব শূদ্র। ক্ষুব্ধ, মর্ম্ম পীড়িত, স্বাধিকার হতে বঞ্চিত, অনার্য্যাখ্যাত এই বিরাট জন শক্তি আজ জাগ্রত

মুখরিত বেদনাবাণী জানাচ্ছে পূজার্চ্চনা উৎসব আনন্দ, বৈদিক পৌরাণিক তান্ত্রিক বৈষ্ণব সমস্ত ক্রিয়া লোপ করে দিয়ে। ফল, দেহ মন প্রাণের জড়তা। ফল, অকাল মৃত্যু অনশন অর্দ্ধাশন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, ব্যাভিচার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ রোগের এক মাত্র প্রতিকার—মুক বিরাট শূদ্র সমাজকে গুণ কর্ম্ম অনুসারে দ্বিজত্বে প্রতিষ্ঠা করা। তাদের বংশ গৌরব, আর্য্যত্বের দাবী সমানাধিকারের স্বত্ব সম্মান করা। স্বীকার করা। তবেই বিরাট প্রাণের হাহাকার মিটে যাবে, জাতির নূতন জীবন লাভ হবে, বাংলার লক্ষ্মী আবার ফিরে আস্‌বে। তখন আবার পল্লীতে পল্লীতে বোধনের বাজনা শুনা যাবে। প্রাতঃ সন্ধ্যায় মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম নগর মুখরিত হয়ে উঠ্‌বে, উৎসবে গীতবাদ্যে, যজ্ঞের ধূমে সামগানে হিন্দুর প্রাণে নবীন শক্তির সঞ্চার হবে।

এখনো এই বিংশতি যুগে, পল্লীর কায়স্থ জাতি সাগ্রহে শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন কোরে দ্বিজত্বের সপক্ষে শ্লোক বার করছেন, উপবীত গ্রহণ কোরে দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করছেন, ত্রিসন্ধ্যাগায়ত্রী জপছেন। নবশাখ সম্প্রদায়, কর্ম্মকারক্ষত্রিয়, গোপক্ষত্রিয়, বৈশ্যমাহিষ্য, নমশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি বড় বড় জাতি দ্বিজত্বের দাবী নানাপ্রকারে জানাচ্ছে।

সমাজ রক্ষক ভট্টপল্লির তথা নবদ্বীপ, কাশীকাঞ্চি, দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নীরব, নিস্পন্দ, ভীত চক্ষে এ সকল বিপর্য্যয় লক্ষ্য কোরে শিউরে উঠ্‌ছেন, ঘন ঘন ভবিষ্য পুরাণ পাঠ করছেন। একশত বছর ধরে এরা পুঁথিই ঘাট্‌ছেন, রোগী মরে গেল, সমাজ ধ্বংস হয়ে গেল, প্রতিকার নির্ব্বাচিত হল না। মনীষা হারিয়ে কার্য্যকরী বুদ্ধিকে অন্দর মহলে আট্‌কে রেখে, ব্রাহ্মণ আভিজাত্যকে আকড়ে ধরে বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। এঁদের দ্বারা সমাজ গঠনের আশা কোরে যদি এখনও কেউ বসে থাকেন, তবে তাঁকে 'ডুম্‌স্‌ডে' পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এখনি, অনতি বিলম্বে বাংলার হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে।

চারিদিক থেকে ঘন জমাট মেঘ এসে আমাদের ঘিরেছে, বিদ্যুৎ, বজ্র, ঝড় তীক্ষ্ণবারিধারা সমাজকে বিধ্বস্ত করতে উদ্যত। সনাতন রক্ষাকর্ত্তারা কবুল জবাব দিয়েছেন। কে কোথায় ঠাকুরের সন্তান আছ, স্বামিজীর ভক্ত বীর আছ এক হাতে জীবশিবের পূজার উপকরণ, অন্য হাতে বেদান্তের অমৃতময়ী বাণী নিয়ে আগুয়ান হও। পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে নগরে মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে, সকল জাতির গুরু পুরোহিত আর মণ্ডল মাতব্বরকে একত্র কোরে লাগিয়ে দাও বৈদিক ব্রহ্মযজ্ঞ। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে, তাঁকে সাক্ষী রেখে—মুড়িয়ে দাও সব মাথা। ধরে ধরে উপবীত ঝুলিয়ে দাও সকলের বক্ষে। আর কানে শুনিয়ে দাও অমৃতস্য পুত্রা। অভি মন্ত্র। লেগে যাবে ভেল্কী—মরা প্রাণে বান ডেকে যাবে।

ডমরুধর

বেদধর্ম্মের ধারাবাহিকতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বেদ অনাদি, অনন্ত, অপৌরুষেয়, স্রষ্টার অপরিমেয় জ্ঞান-ভাণ্ডার নিখিল সত্যের আকরভূমি, মানবধর্ম্মের কল্প কল্পান্তর ব্যাপী নিদর্শন, এই বেদাবলম্বনেই সহস্রশীর্ষ সহস্রবাহুবিশিষ্ট অনন্ত বৈচিত্রময় বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবাত্মার নিত্যস্বভাবের সহিত বেদ সমকালবর্ত্তী, সেই স্বভাব অনাদি অবিদ্যাবীজ, প্রলয়কালে নামরূপাত্মক বিশ্ব জীবাত্মা-সমষ্টির সার্ব্বভৌমিক অদৃষ্টকে আশ্রয় করিয়া সুষুপ্তবৎ থাকে। নাম-রূপঞ্চভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনং। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চা-কার সঃ। ঋষীনাং নামধেয়ানি যথাবেদ শ্রুতানি বৈ। যথানিয়োগ যোগ্যানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ।"—(বিঃ পুঃ ১৫।৬২—৬৩)। বিধাতার সাক্ষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব ও পূর্ব্বস্মৃতিবশে সর্ব্বভূতেই পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সারাংশ ও আদর্শ স্বরূপ বেদ অনুসারে নিজ

নিজ প্রকৃতি ও ধর্ম্মলাভ করে। মনুটীকাকার কুল্লুকভট্টও বলিয়াছেন "প্রলয়কালেঽপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদযোনিস্থিতঃ", সৃষ্টির প্রাক্কালে সমষ্টি নর-হৃদয় জীব যখন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্মৃতিপথে বেদরাশি জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশিত হয়, কল্পারম্ভে বেদনিহিত বাসনাকর্ম্মাদি দেখা দিলে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন প্রকটিত হইয়া থাকে। বেদশব্দাত্মক তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "বাক্এব বিশ্বভুবনানি জজ্ঞে" অর্থাৎ বাক্ বা শব্দ হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। বেদ স্বাভাবিক ঈশ্বরনিঃশ্বাসবৎ। বেদ প্রবাহরূপে নিত্যশাশ্বত, ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে মানব সমাজে প্রচারিত; মানব সমাজে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন ও রক্ষাকল্পে স্রষ্টার অপূর্ব্ব দান, তাই বেদবিশ্বাসীর ধর্ম্ম অচল সুমেরুবৎ, বেদাশ্রিত সমাজ অক্ষয়-বটবৃক্ষের ন্যায়। বেদ পুরুষকৃত নহে, ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্ত স্মারকাঃ নতুকারকাঃ। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, "ঋষীণামপি যজ্জ্ঞানং তদপ্যাগমহেতুকম্।" অতীন্দ্রিয় সত্যরূপে উহা ঋষিহৃদয়ে প্রতিভাত হয় মাত্র। এইরূপে অনন্তজ্ঞানময় বেদ ঋষি-হৃদয়ে স্ফুরিত হয় বলিয়াই তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা, আপ্ত; এবং এই কারণেই আপ্তবাক্য অভ্রান্ত। ঋষিগণ সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা, ঋষিবাক্য পাশ্চাত্য সুলভ বৃথা তর্কযুক্তির পেটিকা নহে, উহা, পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান, অল্পবুদ্ধি, সীমাবদ্ধ মানবের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্দ্দেশে অভ্রান্ত আলোকস্তম্ভ। বেদ অদূরদর্শী মানবকে প্রগল্‌ভ যুক্তিপরম্পরার আবর্ত্তে ফেলিয়া মায়ামরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে না। এই আপ্তবাক্যই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আবহমানকাল হইতে বেদই হিন্দুর নিগূঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল প্রস্রবণ। মহর্ষি জৈমিনি বাদরায়ণাদি হইতে শঙ্কর রামানুজাদি পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মাচার্য্যই বেদপ্রামাণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদসমূহ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। বেদের অন্তভাগ উপনিষদ্ বা আরণ্যক নামে অভিহিত। উপনিষদের কবিত্বপূর্ণ অপূর্ব্ব ভাবদ্যোতক তত্ত্বপূর্ণ শ্লোকরাজি হইতে নারায়ণাবতার ব্যাস সূত্রাকারে মীমাংসাগ্রন্থ বেদান্ত দর্শন রচনা করিয়াছেন, এই বেদান্ত হিন্দু দর্শন শিরোমণি। বেদান্তবেদ্য

ব্রহ্মা হিন্দুর পরমসত্য আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বেদের নিত্য সত্যরাজি বেদান্তদর্শনে অপূর্ব্ব কৌশলে গ্রথিত হইয়া পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছে। বেদান্তই হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন, আর ইহা কোন মহাপুরুষের জীবনের সহিত দৃঢ় সন্নিবদ্ধ নহে, সুতরাং অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় তৎবক্তৃ বা প্রণেতৃগণের জীবনের ঐতিহাসিক সত্যাসত্যের উপর ইহার ভিত্তি আদৌ স্থাপিত নহে। বেদান্ত বলিতে জ্ঞানের চরমসীমাও বলা যাইতে পারে। মানবের যুক্তিবিচার যতদূর যাইতে পারে বেদান্তে তাহারই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই হিসাবে বেদান্ত কোন জাতি বা ধর্ম্মবিশেষের সম্পত্তি নহে। উহা মানব মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি; কারণ সত্য দেশ কাল নিমিত্তের অতীত এবং মানব মাত্রেরই হৃদয় উহার প্রমাণস্থল। যুগে যুগে ভারতের অবতার বা আপ্তপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া এই বেদান্তের মহিমাই প্রকটিত করিয়া যান। আচার্য্য বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য নহে, তিনি বেদান্তের একজন মহান্ আচার্য্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য।" এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যখন ন্যায়বৈশেষিকাদি অপর পাঁচটি আস্তিক দর্শনই ঋষিপ্রোক্ত তখন তাহাদের কি উপযোগিতা নাই? অবশ্যই আছে। কারণ ঋষিগণের সমস্ত জ্ঞানই বেদমূলক, কিছুই স্বকপোল-কল্পিত নহে। সুতরাং বেদাশ্রিত অন্যান্য দর্শনও কখনই ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে না। বেদেই বিভিন্ন মতের বীজ উপ্ত রহিয়াছে। বেদের অর্থবাদেই উহার উৎপত্তি। বহু হইতে একে পৌছাইয়া দেওয়াই অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্য, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতানুভূতি জ্ঞানের চরম সামান্য (Highest generalisation) আবিষ্কার, কিন্তু বহুত্ব বা দ্বৈত সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিতে না পারিলে অদ্বৈতশীর্ষে আরোহণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাধারণ দ্বৈতভাবাপন্ন মানব, ন্যায় সাংখ্যাদির আলোচনায় নির্ম্মলচিত্ত, মার্জ্জিতবুদ্ধি, ও সূক্ষ্মবিচার পরায়ণ হইলেই অদ্বৈত জ্ঞান সম্ভবপর। অধিকারীভেদে উপযুক্ত পন্থানির্দ্দেশই এই সমস্ত মতবাদের উদ্দেশ্য। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত জ্ঞান তিনটি পথের

তিনটি চরমপ্রাপ্তি নহে। বস্তুতঃ উহা একটি পথেরই ক্রমিক দূরত্ব নির্ণায়ক স্তম্ভ (mile stone), অদ্বৈতজ্ঞানই শেষ সীমা (terminus) সাধনমঞ্চে উঠিবার ক্রম সন্নিবদ্ধ তিনটি সোপান মাত্র। অভ্রান্তজ্ঞান ঋষিবৃন্দ বিভিন্ন অধিকারীকে অদ্বৈতস্তরে তুলিয়া লইবার জন্যই বেদের বিভিন্ন মতবাদ লইয়া এই সকল দর্শন রচনা করিয়াছেন; নতুবা অল্পবুদ্ধি জীবের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য নহে। ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে 'বুদ্ধ্যর্থপাদবৎ'। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন 'বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ, খণ্ডজ্ঞানে অনন্তের ধারণার জন্যই শ্রুতিতে অনন্তের পাদকল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপে মধ্বাচার্য্য বল্লভাচার্য্য ও রামানুজাদি আচার্য্যগণ বেদান্তের দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত পক্ষে এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যাই সম্ভবপর, কারণ কেহই বলিতে পারেন না যে একটি সত্য ও অপরটি ভ্রান্ত। শ্রুতি-শির বেদান্তে বেদের ন্যায় বিভিন্নমতানুসারে ব্যাখ্যায় সম্ভবপরত্ব নির্ণীত আছে। বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর জন্যই বেদান্তদর্শনের এইরূপ ত্রিবিধ ব্যাখ্যা। স্থূলভাব বা দ্বৈতবাদ হইতে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতে পৌঁছাইয়া দেওয়া এই সকল মতবাদের গূঢ় রহস্য হইলেও স্ব স্ব সাধন ভূমিকে চরমলব্ধব্যজ্ঞানে কালে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদী সকলেই আত্মপক্ষে শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্য পক্ষের ভ্রমাত্মকতা প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সেই সুদূর অতীতের স্বমত প্রাধান্যের তুমুল কোলাহলের মধ্যে আমরা পার্থসারথির জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-যোগ-সমন্বয়-মূলক, বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যস্বরূপ অপূর্ব্ব ত্রাণপ্রদ সুমধুর গীতা-নির্ঘোষ শুনিতে পাই, কিন্তু সেই সমন্বয়বাণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়; উহা সুব্যক্ত হইতে পারে নাই। তারপর যে সকল মহাপ্রাণ-যুগাবতার অবতীর্ণ হইলেন তাঁহারা যুগোপযোগী ধর্ম্মের একটি একটি ভাবের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদিনীশক্তি সঞ্চার করিয়া তৎকালিক ধর্ম্মগ্লানি দূর করতঃ সাধকবর্গের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া গেলেন। শ্রীবুদ্ধ আসিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড বাহুল্যের মধ্যে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" প্রচার করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করিয়া গেলেন। শঙ্করাবতার

শঙ্করাচার্য্য আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়াবলম্বনে প্রচারিত ঘোর বামাচার ও শূন্যবাদের নিরাশ করিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উপলব্ধিবিহীন বচনৈকসম্বল "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রচারক দলের সাধনবিহীন মতবাদ প্রবল প্রেমোচ্ছ্বাসে নিমজ্জিত করিয়া ভক্তি বন্যায় ভারত ভাসাইয়া গেলেন। এই সকল আচার্য্য-জীবনে যে সমন্বয় ভাব ছিলনা তাহা কেহই বলিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদের প্রচারিত মত হইতে বহুল পরিমাণে সমন্বয়বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সমন্বয় ভাবটিকে তাঁহারা সেরূপ পরিস্ফুট করিয়া যান নাই বলিয়াই কালে তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরা স্বমতের প্রাধান্য স্থাপনে ব্যগ্র হইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় রত হইয়াছিলেন এবং ভিন্ন মতবাদীর প্রতি অযথা নিন্দা ও কটুবাক্য বর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত অপ্রিয় বাক্যবান কোন কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিয়া সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ বুদ্ধির ও তদানীন্তন ধর্ম্মহীনতার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যখন নব্য ভারতভারতী সংশয়ের আবর্ত্তে আকণ্ঠ নিমজ্জমান, সর্ব্বত্র ধর্ম্মগ্লানির পরাকাষ্ঠা, পঞ্চোপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের উপাস্যের নিকৃষ্টত্ব প্রদর্শনে বদ্ধপরিকর, তখন ভারতের ভগবান —যিনি একবার কুরুক্ষেত্রে সমন্বয়বাণী গীতা প্রচার করিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' তিনিই পুনরায় ভারতের ধর্ম্মাকাশের প্রবলঝঞ্ঝা ও করকাপাতের মধ্যে সাধন, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাশূন্য, নামমাত্র সম্বল ভক্তিজ্ঞানের তুমুল দ্বন্দ্ব কোলাহলের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের নরনারীকুলের মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য এবং মতপথের মরীচিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় জগদ্বাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মালোক প্রদান করিয়া বেদধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অতীত অবতার কুলের ভাবঘন সমষ্টি মূর্ত্তি; জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগের অপূর্ব্ব স্ফুরদবিগ্রহ। এবার শাস্ত্রবাক্যাবলম্বনে শ্রীভগবানের সমন্বয় প্রচার নহে। নিরক্ষর হইয়া বেদবাক্যের গূঢ়ার্থ প্রদর্শনের জন্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় বৈষ্ণব, শাক্ত, ইসলামীয়, খ্রীষ্টীয় যাবতীয় দ্বৈতভাব সাধনে সর্ব্বশেষে নির্ব্বি-

শেষাদ্বৈতানুভূতি লাভ করিয়া "যত মত তত পথ" মহাসত্য প্রচার করিলেন। এ পর্যান্ত শাক্ত বৈষ্ণবাদি দ্বৈতমার্গের সাধকবৃন্দ স্ব স্ব সাধ্যতত্ত্বকেই পূর্ণতত্ত্ব বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক বৃথা তর্কবিতর্ক ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ব্ববিধ দ্বৈতমতে সাধন করিয়া তৎভাবাবলম্বীর সাধ্যবস্তু লাভ করিলেন এবং তৎপরে প্রত্যেক পন্থাবলম্বনেই অদ্বৈতভূমিতে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহাসমন্বয়াচার্য্যের প্রত্যক্ষ সাধনোপলব্ধি প্রচারে সমস্ত দ্বন্দ্বের নিঃশেষ অবসান হইল; শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সাধন প্রভায় বেদমহিমা কোটিগুণে ভাস্বর হইয়া উঠিল। সেই মূর্ত্তিমান বেদান্ত, সেই ভগবৎ প্রেমের গলদশ্রু-মন্দাকিনীধারা, সেই মুহুর্মুহুঃ নির্ব্বিকল্প সমাধি, সেই পাপী তাপী জীবের জন্য মূর্ত্তিমতী করুণা একাধারে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-যোগ-সমন্বয়-বিগ্রহ বস্তুতঃই ধর্ম্মজগতের এক অচিন্তপূর্ব্ব দৃশ্য—দেবমানবে ভগবল্লীলা-বিলাসের অপূর্ব্ব বিকাশ। শ্রীদক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী মূলের সেই অপূর্ব্ব মহাসিদ্ধির তড়িৎপ্রবাহ হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক ধমনীতে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। হিন্দুর বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যাবতীয় সাধনপন্থা অননুভূতপূর্ব্ব দীপ্তালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আর সেই সমিত সমঞ্জসা মহাসমন্বয় বাণী অবনীমণ্ডলে প্রচারের জন্য শ্রীভগবানের বিপুল আকর্ষণে অবতীর্ণ ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ, সেই আজন্মশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, জ্ঞানে শঙ্কর, ভক্তিতে নারদ, কারুণ্যে শ্রীবুদ্ধ, বেদান্তকেশরী আচার্য্যপ্রবর শ্রীস্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তদুন্দুভিনাদে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত নরনারী হৃদয়ের সুপ্ত ধর্ম্মভাবের নবজাগরণ অনুভূত হইতেছে। যাঁহার প্রাণ আছে তিনি প্রাণে প্রাণে সেই অপূর্ব্ব স্পন্দন অনুভব করুন। বাস্তবিক রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-জীবন পরস্পর একই সূত্রে গ্রথিত—একই মহান উদ্দেশ্য উদ্বুদ্ধ, একই মহালীলা প্রকাশের জন্য মহাবতরণ, যুগধর্ম্ম প্রচারের যুগল প্রকটমূর্ত্তি। Probuddha Bharat" যথার্থই বলিয়াছেন—

"One must know Sri Ramkrishna in order to know Vivekananda. Both personalities were aspects of the

same Reality. Both sought the same Ideal through the transcendence of the purely personal consciousness. Sri Ramkrishna's was the living of the life of Hinduism. He was the fact. Vivekananda was the explanation, the interpretation. Sri Ramkrishna's was the Eloquent silence of Insight ; Vivekananda's was the Eloquent Expression thereof. He was the mighty voice, enumerating the ideals and realities of that life."

আজ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসাধনা অদ্বৈত মহাসাগরে মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস কল্লোলে জগতের নরনারীকে ধর্ম্মপ্রবাহে ভাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীস্বামিজীর কথায় বলিতে হয় "যে শক্তির উন্মেষ মাত্রে দিগ্ দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর।" আর দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈতের অনর্থক তর্ক বাহুল্য নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালোকে ও উপদেশে সকলেই বুঝিতেছেন—ত্রিবিধমত একই সাধক জীবনের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কর্ত্তৃকই বেদান্তের সার্ব্বভৌমভাব সুব্যক্ত ও সম্যক প্রচারিত হইয়াছে। ভারত বা জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসে সমন্বয়ভাব কখনই এমন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে নাই। শ্রীশ্রীস্বামিজী নিজেই একস্থলে বলিয়াছেন "আমি ঈশ্বরকৃপায় এমন এক ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম যাঁহার সমগ্র জীবনই উপনিষদের মহাসমন্বয় স্বরূপ, এতদ্বিধ ব্যাখ্যাস্বরূপ, যাঁহার উপদেশ অপেক্ষা জীবন সহস্রগুণে উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত উপনিষদের ভাবগুলি প্রকৃতপক্ষে যেন মানবরূপ ধারণ করিয়াছে, এই ব্যক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম উপনিষদসমূহ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে শিখিয়াছি।" অপূর্ব্ব গুরুর অপূর্ব্ব শিষ্য শ্রীগুরুর জ্বলন্ত শিক্ষাদীক্ষা এবং স্বকীয় প্রবল তীব্র সাধন সহায়ে বেদবেদান্তের মহান তত্ত্বরাজির উপর যে আলোক বিস্তার

করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্বাচার্য্যগণের বৌদ্ধ, জৈন নাস্তিকাদি মত নিরাসের ন্যায় পাশ্চাত্যের ভোগ সর্ব্বত্র জড়বাদ অপসারিত করিয়া ধীমান ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে বেদান্ত ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা স্ফুরিত হইতেছে। জার্ম্মান দার্শনিক Schopenheur বেদান্ত মুগ্ধহৃদয়ে বলিয়াছেন—

"In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. They are products of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people."

জার্ম্মান দার্শনিকের আশাবাণী যে সফল হইতে চলিয়াছে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় আচার্য্য বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব সাফল্যই তাহার মহাসূচনা এবং অচিরেই যে উপনিষদের ধর্ম্ম জগৎপ্লাবিত করিয়া ফেলিবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্রই তাহার লক্ষণ সুপ্রকট। ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ নিপুণতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিমধ্যেই মহাপ্রাণ বিবেকানন্দের মহাপ্রেরণায় ভারতের সর্ব্বত্র নারায়ণরূপী অন্ধ আতুর দুঃস্থের সেবার্থ আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবৃত্তির জন্য আমেরিকার কয়েকস্থানে মঠাদি স্থাপিত হইয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ ধ্যানধারণাদি শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় অধ্যাত্মালোকে আলোকিত করিতেছেন। এই সব দেখিয়া বেদান্ত ধর্ম্মের মহাপ্লাবন আর সুদূর-পরাহত বলিয়া মনে হয় না।

স্বামী সুন্দরানন্দ

সাহিত্য-জগৎ

রামায়ণ

জীবন একটা দ্রুত তাল—ইহারও ছন্দ আছে, যতি আছে, একটা বিশেষ আইন আছে, যাহাতে করিয়া ইহার বিষ ও অমৃত একসাথে মন্থন হইতে থাকে। উদ্দাম উলঙ্গ জীবনের দুরন্ত লিপ্সার সহিত ইন্দ্রিয়েরা পা ফেলিয়া চলিতে না চলিতেই ক্লান্ত হইয়া বায়না সুরু করে—'এবার থামনা গো'—এই মাঝপথে চলার মাঝে স্থিতির প্রেরণার ওপরেই সংসার, সৃষ্টি। এখানে ভোগে আর প্রকাশে বিরোধ নাই কিন্তু এখানে জটিল প্রকাশের শাণিত গতি বাহুর ডোরে বদ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছে, প্রাণের অনন্ত আকুতি দেহ-সৌভাগ্যের মাঝে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,—এইজন্যই সংসারের আর এক অর্থ মায়া, যে মায়া রূপে রূপে বিভাসিত, তরঙ্গায়িত। বেগকে এখানে সংহত করিয়া বদ্ধ করিবার একটা প্রচেষ্টা আছে, তাই প্রাণ এখানে যান-বাহনের মত সুবোধ পথ ধরিয়া সারি বাঁধিয়া চলিতেছে রহস্য-স্পর্শী জীবনের কি যেন একটা আকাঙ্ক্ষা তাই এখানে অনেক কিছুকেই আকাঙ্ক্ষা বলিয়া বরণ করিয়া নিতে পারিয়াছে; কবি-চিত্তের স্ফুরণ এই চৌমাথার উপরে, যেখানে দিবানিশি দিগন্ত-প্রসারী ক্রন্দন বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছে সে বোঝা ভূতের বোঝা কিনা তাহা আমি জানিনা। এইজন্যই কবিতার আর এক নাম শ্লোক, যে শ্লোক, শোক থেকে জাত। চিত্ত যে শুধু বিত্তের বোঝায় দিনযাপন নয়, প্রাণ যে শুধু প্রাণের দৈন্যতাকে গোপন করা নয় কবিই ইহা তার চির-অসংসারী বুকের আসনে অনুভব করিতে পারে।

"অম্বরে অরুণোদয়,
তলে তলে দুলে বয়,
তমসা তটিনী বাণী কুলুকুলু স্বনে

নিরখি লোচন লোভা
পুলিন বিপিন শোভা
ভ্রমেণ বাল্মীকিমুনি ভাব-ভোলা মনে।
সাথী সাথে রসমুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়
হানিল শবরে বাণ
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ
রুধিরে আপ্লুত পাখী ধরণী লুটায়

* * *

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে,
ঘিরে ঘিরে শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে ;
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিভল নয়নে।
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল-নব-ঘনে—

কবি বিহারীলালই শুধু আদি কবির জীবনে উদ্বোধন গাঁথিয়া দিয়া যান নাই ;—জ্যোতির্ম্ময়ী সরস্বতীর এই-ই জন্ম-কোষ্ঠী—প্রতি কবি-চিত্তেরই স্ফুরণ এই মধুরে-বিষাক্তে শোক ক্ষেত্রের ওপর। সত্য আর সৌন্দর্য্যের পূর্ণচ্ছাতি জীবনের উষ্ণ স্পর্শেও যে বিকল হইয়া ওঠে সে রহস্য আর বুঝবে কে! ব্যাধের উদর-পূর্ত্তিই বড় না ক্রৌঞ্চীর আনন্দ লিপ্সাই বড়—কোন স্পর্শ সৌন্দর্য্যের ভিতরে সত্যকে বাঁধিতে পারিয়াছে —ইহারই সন্ধানরূপে কবির জীবন—আজো তার মীমাংসা হইল না—হইল না বলিয়াই মীমাংসার পর মীমাংসা চলিল তবু মীমাংসার সমাপ্তি হইল না।

কবির সৃষ্টি এই মহাক্ষেত্রের ওপর, সেইজন্য সে সৃষ্টি বিশ্ব সৃষ্টির আর এক কোঠা ওপরে এইজন্যই ইতিহাসের রাম আসিল পরে, বাল্মিকির রাম তার বহু আগে আর এক জগতে প্রচার হইয়াছিল।

প্রত্যেক কবির জীবনেই রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যা-সঙ্গীত ধ্বনিয়া ওঠে কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ সকলের হয় না।—সন্ধ্যা-সঙ্গীতেরই কোটরে জগৎ ফুলের কীট দংশের খসিয়া-পড়া অশ্রুজলের ঝাপ্‌সা আঁধারে দেখিয়া যায়, আদি কবি বাল্মীকির স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছিল গভীরতম রহস্যলোকে আর তিনি সীতা-সমুদ্রের মাঝখানে শত শত চরিত্র নিঝররূপে তারই ফলে অনন্ত মিলনে মিলিত হইয়াছেন। উত্তরকাণ্ডে একটি শ্লোক আছে—

"অবশ্যং চাপি লোকেষু সীতা পাবনমিতি।
দীর্ঘ কালোষিতা হীয়ং রাবণান্তঃ পুরেশুভা॥"

এখানে 'অবশ্যংচাপি' কথাটার অর্থ তলাইয়া বোঝা যাক্,—রামচন্দ্র জানিতেন 'অনন্য হৃদয়াং সীতা মচ্চিত্ত পারিরক্ষিনীম্' রামচন্দ্র জানিতেন 'বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা' তবে এ 'অবশ্যং' কি সূচিত করিতেছে!

আমরা বাল্মীকির একেবারে মণিকোঠার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সভ্যতার আদিম অবস্থায় অন্তরাত্মার একটা ক্ষুধার্ত্ত গবেষণা চলিয়াছিল এমন একটা পূর্ণদ্যুতিকে লাভ করিতে যা' সমস্ত সংশয়-অসংশয়, জ্ঞান-অজ্ঞানের একটা নিরবশেষ করিতে পারে— তারই ফলে তারই সিদ্ধিতে জীবনের সমস্ত অর্থ সমস্ত বিকাশ সেই এক অনাহত পুরুষের শিখা-রূপে সার্থকতা লাভ করিল। এইজন্যই বিবাহ—যাহা জীবন স্ফুরণের প্রথম পৈঠা সেখানেও ঐ ভব্যতা বোধকেই একান্ত ভাবিয়া মন্ত্ররচিত হইল 'তব হৃদয়ং মম, মে হৃদয়ং তব' শুধু এই-ই নয় তার পরেও—'দে হৃদয়ং তস্য' দুইটি হৃদয়ই তাঁর। এই-ই সর্ব্ব শেষ কথা; এইখানের তথ্যটি ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। সামাজিক-নীতি কুনীতি দিয়া, নইলে রামায়ণ-চরিত্রের বৃথাই পিণ্ডোদ্ধার করা হইবে;—সীতা ত্যাগ ঠিক কি বেঠিক বাল্মীকির বেদিপ্রান্তে এইভাবে পরস্পরে মাথা ঠোকা-ঠুকি করিলে মাথাই ভাঙ্গিবে মাত্র সে ঋষির ধ্যানভঙ্গ দূরে থাক্

সেথানের বাতাসও চঞ্চল হইবে না—তাই বলিতেছিলাম এ তথ্যটি বুঝিতে হইবে।

মানুষের প্রত্যেকটি বৃত্তিরই একটি বিশেষ ক্ষেত্র আছে এবং তার স্ফূর্ত্তি বা বিকাশেরও বিশেষ একটা অবলম্বন আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদিম অবস্থা হইতেই, ইহাকে অস্বীকার করিবার প্রেরণা কিছুমাত্রও নাই তবে এমন একটি অদ্বৈতসূত্র (Categorical imperative) আবিষ্কার হইয়াছে যাহাতে সৃষ্টির মরণ কাঠি জীয়ন কাঠি কোনো দিকেই না বেপরোয়া হইয়া না ওঠে—ইহাতে স্বাধীনতাকে বদ্ধ করা হইল কিনা তা এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

এখানে সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি মধুর ব্রীড়াময়ী লাবণ্যলতা মোমের প্রতিমার মত আমাদের কোমলতার ছোঁয়াচ দিয়া যায় অথবা দূর বাতাসে শুধু উঁকি মারিয়া সমস্ত বাতাসকে নেশাতুর করিয়া তুলে—ঐটি আর কেউ নয়, উর্ম্মিলা।

বাল্মীকির কি অমর রচনা কৌশল—! তিনি উর্ম্মিলার চিত্র রামায়ণের একেবারে আড়ালে রাখিয়া গেলেন আর সেইজন্যই একটু আভাষ বিবাহ-মণ্ডপে দিয়াই পরদা টানিয়া দিলেন,—তিনি জানিতেন অপ্রকাশের প্রকাশ কত বিশাল, তিনি জানিতেন জগতেই আমাদের মনকে একটি কেমন-যেন, পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ, একটি কিসের ব্যঞ্জনা কথা কহিয়া যায়—চিরবিরহিনী একটি হৃদয় রাজঐশ্বর্য্যের বিষাক্ত ভোগের ডালি যে কি করিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে,—বনবাস কেন নবকবাসের চেয়েও ভীষণ ইহার রুদ্ধশ্বাস রামায়ণের ফল্গুপ্রবাহে ছলকে-ছলকে কাঁপিতেছে।

এইখানে বাল্মীকি যে কত বড় আর্টিষ্ট তার চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়াছে; তিনি আমাদের যেন গোপনে বলিয়া দিয়া গেলেন—ওগো এ বড় কোমল, বড় নমনীয়, লক্ষ্মণের বনবাস গমন দৃশ্যের সুমুখে এ বিলুলিত ম্লান কুসুমের মত মুহূর্ত্তে পুড়িয়া উঠিবে—তাই যেন সেই বেদনাকে বাক্যের অলঙ্কারে কবি সাজাইতে সাহস না করিয়া একেবারে ঘনায়মান যাতনা সমস্ত চিত্তে ঢালিয়া দিয়া গেলেন। জানিনা—কবির এ অব্যক্ত দিকের অনুভূতির দিন আজও আসিয়াছে কিনা?

দেবতার উদ্দেশ্যে ট্রয়যুদ্ধে ইফিজিনিয়াকে হত্যা করা হইয়াছিল তার পিতার সম্মুখে—সুবিচার প্রার্থনা করিয়া,—এই চিত্রটি আঁকিতে গিয়া বহু চিত্রকর বহুভাবে পিতার মুখের পেশী ত্রিকোণ-চতুষ্কোণ-সমকোণ নানা রূপে রং চড়াইয়া হুকুমওয়ালার সাম্‌নে হাজির করিলেন—কিন্তু একটি ক্ষ্যাপা, পিতার মুখে কাপড়ের আবরণ দিয়া দীননেত্রে সে চিত্র রাজার সাম্‌নে ধরিলেন—বহুদিন এ কথাটি আমায় একজন বলিয়াছিলেন।

আধুনিক কালের মেটারলিঙ্কতার 'ম্যাগ্‌লেডিন—সাইলেন্সটি' নাটকেও দেখাইয়াছেন, প্রণয়ী প্রণয়িণীর কাছে একেবারে মূক! শেষে যেন হঠাৎ একটা কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিলেন 'we will speak through silence'. তাঁর নাটকে এইজন্যই 'silence' কথাটা যেখানে আছে সেখানেই নাটকের অঙ্গভাবও অনেকখানি আছে যা ব্যতিরেকে নাটক নিস্ফল নামোচ্চারণ মাত্র।

এইবার আমাদের পূর্ব্ব কথায় ফিরিয়া আসা যাক্—সীতাদেবী রামলক্ষণের সঙ্গে বিদায় লইলেন,—একটি লেখনীর আঁচড়ে কবি, তা প্রকট করিলেন—

'বিলপন্তো নবা ধীরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ কচিৎ কচিৎ—'

এ কথাগুলো দেখিলে যেন মনে হয় এই কথাগুলো যেন মূর্ত্তি; কি সে জিনিষ যা কবির লেখনীকে এম্‌নি ধারা ভাষাকে চাপিয়া ফেলিয়া জগৎ রচিতে সক্ষম করে—তা কবিই মাত্র বুঝিবে—এই জন্যই প্রেমকে ভগবৎ প্রেমে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, অন্ততঃ ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, সংসারের বন্ধন ও ভীত হিল্লোলোচ্ছ্বাস অনন্ত বাঁশীর পানে ছুটিয়াছে, কলঙ্ক—রায় রসময় হরির রসে ডগমগ—সেত এই জন্যেই।

রামচন্দ্র সসাগরা ধরণীর (বা ভারতের যাই হোক) একচ্ছত্র অধিপতি তিনি ইচ্ছা করিলে দুচারটি চক্‌-চকে গুরপাক চালাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেই তো আর তাঁকে 'কষ্টং লোকরঞ্জনের' জন্য ভাবিতে হইত না তবু কেন বনবাস? উহার অর্থ বোঝা যাইবে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে'র বণিকচিত্রে। একজন লম্পট আসিয়া বণিকের সেবা চাহিতেছে তাঁরই স্ত্রীর দেহখানি। অসভ্যদের মধ্যে

নাকি ঐরূপ সেবাপদ্ধতি এখনো বিরাজ করিতেছে, তবে বণিক নিশ্চয়ই অসভ্যদেরই আর একটা সংস্করণ।—না—তিনি জানিতেন, 'সত্যসার এই ভূমণ্ডলে' 'কেবা কার নারী'। এগুলো বুলি নয়—জীবনের শোণিত শিরা—এ ছাড়া বণিকের অন্য অস্তিত্ব নাই। 'লিঙ্গা-লিঙ্গ ভেদ' তখন ছিলনা। এটা বুদ্ধির বজ্রাঘাতের দর্শন নয়—গূঢ় উপলব্ধি—কাজেই বণিককে যে অসভ্যদের সঙ্গে তুলিত করিবে তিনি তার হস্তীমুর্খতারই প্রমাণ করিবেন। সংসারের মূত্র পুরীষান্ত দৃষ্টির কলুষে তিনি এটুকু শিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারেন যে কর্ম্মের উপাধি নাই, শুধু কর্ম্মে গরুর বিচার হইয়া খোঁয়াড়ে তোলা যাইতে পারে, মানুষকেও আদালতের মঞ্চে রক্ত চক্ষু বিদ্ধ করাও, এ যুগে এদেশে অন্ততঃ সম্ভব। কিন্তু সত্যকারের সমাজ বিহীন চেতন মানুষকে যে উপলব্ধি করিয়াছে তার কাছে ও সবে অর্থ আবর্জ্জনার মত পীড়া দিবে—। যাক—। ঐ 'আত্মানং বিদ্ধি' চক্ষু শ্রোত্র জিহ্বার বহু উর্দ্ধে এর নিষ্ঠা—এর মহত শক্তির কাছে বর্ব্বরের প্রথার তুলনা মাত্র হইতে পারেনা—এখানে স্ত্রীর উপর কতটা অধিকার তা স্বামী পিনালকোড দেখিয়া বিচার করেন না এবং স্ত্রীও বিচার করেনা তাহার স্ত্রীত্ব ইহাতে কতটা সামাজিক কলুষের ছোঁয়াচ পাইবে—এখানে উভয়েই দুটি মন্ত্র বা স্পিরিট—দেহ নয়। আধুনিকেরা ইহাতে বড় চমকাইয়া থাকেন; আর ইহারই উপর রামায়ণের ভিত্তি গাঁথিতে যাইতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম, যদি তাঁহাদের এ মৃগী রোগের পশ্চিমী ভদ্র গোঁঙানি একটু উপশম হয়—যাক্। এই গূঢ় (Sentiment) অভিমানের অনুভূতি কি সুবিশাল তা রামায়ণ চরিত্রের কোটরে কোটরে প্রতিফলিত। রামের মধ্যে তার পূর্ণ বিকাশ এবং আধুনিক রাজপুতদের মধ্যেও এর প্রাবল্য বড় একেবারে কমছিল না—আজকার আয়ার্লাণ্ডের ভিতরে ত ইহা মত্ত শক্তিরূপে প্রকাশ—অবিশ্যি পৃথক পৃথক রূপে, ইহার ভালোমন্দ বিচার আমার এ প্রবন্ধে নাই, আমি শুধু বিশ্লেষণ করিতে বসিয়াছি মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীসুধীরচন্দ্র চাকী

জড় ও চেতন

আমাদের সব রকমের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। দেশ, কাল, নিমিত্ত এই তে পায়ার উপর দাঁড়াইয়া আমরা জগতের একটা কাল্পনিক দৃশ্য দেখিতেছি। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ একটা উপমা দিতেন যে আমাদের সাম্নে যেন একটা বেড়া আছে, আর তাহাতে খুব সরু একটি ফাটল আছে। আমরা জগতের শুধু সেইটুকুই দেখিতে পাই যে দিকে ঐ ফাটল দিয়া দেখি। সামনে দেখিলে বর্ত্তমান, ডাইনে বাঁয়ে ভূত ও ভবিষ্যৎ।

পাশ্চাত্য জগতে ও স্পেনসারের পর হইতে আমরা জগৎটাকে যে ঠিক দেখিনা এই ভাবটা মনিষীদের মধ্যে অধিক স্থান পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। স্পেনসার যাহা যুক্তি চিন্তার ফলে দার্শনিক সত্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, আইনষ্টিন তাহাই গণিত ও বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্য ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—যদিও দুজনের কথা এক নহে। ফলতঃ দাঁড়ায় এই যে আমরা এমন একটা ধোঁকার টাটির মধ্যে বাস করিতেছি যে কোন বিষয় একটা জ্ঞানের সীমানা পাওয়া যায় না। সীমানার কাছা কাছি গেলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অন্ত নাই এবং আমাদের যে নানাপ্রকার ব্যবহারীক গণ্ডি আছে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ সত্য সকলের চোখে পড়ে না। সূর্য্যদেব রোজ সকালে ওঠেন। ঋতু পরিবর্ত্তন চিরকালই যেন হইয়া আসিতেছে। ঘড়ি দেখিয়া ট্রেন ছাড়ে, সময়ে উপস্থিত না হইতে পারিলে হাজার কাজ থাক ট্রেন পাওয়া যায় না। সময়ে উপস্থিত না হইলে আফিসের সাহেব অথবা ছাত্রকে মাষ্টার মহাশয় বকেন।

কাজেই দাঁড়াইল এই যে যদিচ আমরা মূলতঃ একটা আলো আঁধার যুক্ত "ধোকার টাটিতে" বাস করিতেছি কিন্তু দৈনন্দিন ব্যাপারে সাধারণ

কতকগুলি জ্ঞান আছে যাহা লইয়া দিন গুজরান চলে—গায়ের জোরে তাহা অগ্রাহ্য করিলে ফল ভোগ করিতে হয়।

বেদান্তে এই দুইটিই ধরিয়া লইয়াছেন। একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। কেমন মিথ্যা যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। কিন্তু যতক্ষণ ভ্রম আছে ততক্ষণ সর্প ভয়ও আছে ও পলায়নাদি কাজও আছে। আমরা যতক্ষণ এই মায়ার গণ্ডির ভিতর বদ্ধজীব—সব মিথ্যা গায়ের জোরে ততক্ষণ বলা চলে, যতক্ষণ ধরিয়া মন সুস্থ এবং উপস্থিত কোন অভাবের তাড়না নাই। বিচারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বেদান্ত সত্যের একটা intellectual Conception হয়—পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে কিন্তু তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে সতন্ত্র। আমরা ক্ষুধার তাড়নায় ব্যস্ত হই, রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করি, শোকে মুহ্যমান হই। তখন জগৎ মিথ্যা বলিলে ক্ষুধা চলিয়া যায় না, যন্ত্রণার ভোগ শেষ হয় না, শোকের অশ্রু বাধা মানে না। কিন্তু যাহার অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে তিনি ক্ষুধা যন্ত্রণা ও শোকে অবিচলিত থাকেন। এমন মহাপুরুষ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, যিনি নিজের শরীরের অস্ত্রোপচার দর্শকের ন্যায় অবিচলিত চিত্তে দর্শন করিতেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়াছিলেন "যস্মিনস্থিতো ……ন গুরুনাপি বিচাল্যতে"।

অপর পক্ষে এই সার সত্য ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন সকলের মনে রাখিতে হইবে। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসি তাই কর"। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দও Practical Vedantaতে দেখাইয়াছেন, এই বেদান্ত ভূমির উপর দাঁড়াইয়া মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হইলে জগতের কল্যাণ হইবে।

একদিকে যেমন এটা মনে রাখিতে হইবে, তেমনি ব্যবহারিক জগতের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ মানুষের মতি, গতি, ক্রিয়া-কলাপ সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। যে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামী মহাসমাধির প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" এইটি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কর। আবার তিনিই মিশনের প্রেসিডেণ্টরূপে কর্ম্মজীবনে কিরূপ দূরদর্শন, দক্ষতা ও ধীর বিবেচনায় মিশনের বিস্তার সম্পাদন

করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে তাঁহাকে ঘোর বিষয়ী অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া মনে হইত। এই সব দেখিয়া মনে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুসি তাই কর", "ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন"—দুটি বাক্যই তিনি তাঁহার জীবনে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। আমাদের যথাসাধ্য সেই পথে চলা উচিত। ব্যবহারিক জীবনের যে একটা ধারা আছে তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা একটা পারস্পরিক নিয়মে ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত। দেশ, কাল, ব্যাপিয়া অবস্থিত ও নাম রূপের অভিব্যক্তি যতক্ষণ, সাধারণ জ্ঞান ভূমিতে দাঁড়াইয়া আমরা কাজ করিব ততক্ষণ। এগুলি মায়া হইলেও মানিয়া চলিতে আমরা বাধ্য। না মানিলে ক্ষতি আছে কখন কখন বিপদও আছে।

এখন বুঝিলাম পারমার্থিক ধ্রুব-সত্য জগৎ-মিথ্যা হইলেও ব্যবহারিক জীবনে ইহার সার্থকতা আছে। "কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া দুটিই ফেলিয়া দিতে হইবে।" ব্যবহারিক জীবনে এমন জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহা অদ্বৈত ভূমির দিকে লইয়া যায়। যদি লাভ হয় তখন সব ত্যাগ করিয়া "সোঽহং" রাজ্যে স্থিত হইবার প্রয়াস। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা অনেক রকমে হয়। "মায়া" কাঁটা ফুটে আছে তা বেদান্ত আলোচনা রূপ ছুঁচে তুলতে পারেন, অথবা জড় বিজ্ঞানের এমন একটা ধারা অবলম্বন করুন যাহার ফলে বহু হইতে একের উপলব্ধি হয়। জগদীশবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ ছিল। তিনি পরশ পাথর ছিলেন। যাঁহাকে ছুঁইব বলিয়া ছুঁইয়াছেন সেই সোনা হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারই পরোক্ষ অদ্বৈতানুভূতি হইয়াছে। জগদীশবাবু যখন জড় ও জীব জগৎ এক পর্য্যায়ে দেখেন তখন তিনি এই অনুভূতির ভূমি হইতে দেখেন। সে অনুভূতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তিনি যে সাধনা করিয়া সেই অনুভূতি লাভ করিয়াছেন সেই নির্দ্দিষ্ট মার্গ অনুসরণ ব্যতিত অন্য উপায়ে হইবে না। সাধারণ দৃষ্টিতে জড় চেতনের যে গণ্ডি আছে, যাঁহারা গভীর

জড় বিজ্ঞানের গবেষণায় নিযুক্ত তাঁহাদের অনেকের তাহা নাই। তাঁহারা যেন একটা অবস্থা ভাবে অনুভব করেন যে সবই বুঝি এক। একটি বিশাল শক্তি নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে। রসায়ণ বিজ্ঞানের পরমাণু (Atom) আজ বিদ্যুতিন (Electron) ও কেন্দ্রিনে (Proton) বিভক্ত। এই দুইটি ভিন্ন শক্তি-বিশিষ্ট শক্তি-কেন্দ্র মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক সত্যে যাহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে তিনি আগম নির্দ্দিষ্ট আদ্যাশক্তির বিকাশে জগৎ সৃষ্টি পরোক্ষ ভাবে অনুভব করেন। আগমে বলে মহাশিব শব হইয়া মহাকালী আদ্যাশক্তির আশ্রয়। নিজে নিষ্ক্রিয় কিন্তু তাঁহার বুকে দাঁড়াইয়া মা নৃত্য করিতেছেন বলিয়া এই বিপরীত রতাতুরা কাল-কামিনীর লীলা বিলাসে জগৎ-সৃষ্টি।

এই সব বড় ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যাহা আছে বা হয় তাহা "কমলালেবুর মত গোল এই পৃথিবী" জাতীয় অর্থাৎ (Symbolic.) বড় জিনিষকে ছোট বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উপমার ভিন্নতায় নানা লোকের মনে নানা বস্তুর পরিকল্পনা হয় ও বৃথা তর্ক ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। যেমন চার কাণার দুধ সম্বন্ধে এবং হাতি সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য জগতে জড় বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে তাঁহারা আমাদের ঋষিদের দ্বারা অপরোক্ষ অনুভূত অনেক সত্যে অথবা তাহার কাছা কাছি আসিয়া পড়িতেছেন। আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের সব গুলিতেই শক্তির পরিকল্পনা আছে। "ব্রহ্ম ও তাঁহারই মায়াশক্তি।" "ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ যেমন আগুন ও তার দাহিকাশক্তি।" আবার ব্রহ্মজ্ঞান হইলে তখন শক্তি জ্ঞান চলিয়া যায়। ঠাকুর বল্‌ছেন "জ্ঞান খড়্গ দিয়ে মাকে কেটে ফেললাম তখন মন হুহু করে অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছে গেল।" তন্ত্র বলেন "শিব শক্তির মিলনে এই জগৎ; মূলতঃ শিব ও শক্তি অভেদ।" মায়ার রাজ্যে থেকে মায়াকে চেনা যায় না। ইহা সৎও বলা চলে না অসৎও বলা চলে না কাজেই অনির্ব্বচনীয়। অর্থাৎ ঘরের ভিতরে বসে ঘরের ছাদ দেখা যায় না। আবার ঠাকুর বলতেন মায়াকে চিন্‌তে

পারলে মায়া পালিয়ে যায়। রাম লক্ষণের মধ্যে মায়ারূপ সীতা থাকায় লক্ষণরূপ জীব রামরূপ ব্রহ্মকে দেখতে পাচ্ছেন না।

আমাদের যদিও জীবনের উদ্দেশ্য অদ্বৈতানুভূতি কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় জগতে যে সকলের ভাবের তাফাত হবে তার আর কি কথা? ঠাকুর বলতেন "যত মত তত পথ"। "যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়"। মানুষের মন নানা ভাবে গঠিত। কারু দর্শন ভাল লাগে, কারুর গণিত ভাল লাগে, কারুর জড় বিজ্ঞান, করুর বা রসায়ন শাস্ত্রে অনুরাগ। স্বামিজীর কথা যদি সত্য হয় তা হলে যে মানুষ যাহাই করুক সে যদি আন্তরিকতার সহিত নিখুঁত ভাবে করে ও তাহার উদ্দেশ্য যদি হয় ভগবৎজ্ঞান বা অদ্বৈতানুভূতি তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হইবে। এই জন্যই অনেকে বলেন স্বামিজীর বৈশিষ্ট্য—"বনের বেদান্ত সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন"। দীর্ঘকাল রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মিগণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত থাকায় স্বামিজীর এই উক্তির সার্থকতা দৃঢ়ভাবে অনুভব করিয়াছি ও সেইজন্য বিশ্বাস করি। আমার ধারণা সকলের তাহাতে বিশ্বাস হইবে না। নিজের নিজের বিশ্বাস নিজেকে নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়।

এই গেল বিশ্বাসের কথা। এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞানভূমি থেকে জগদীশবাবুর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় কিনা দেখা যাউক।

জড় ও চেতনে কোন সৌসাদৃশ্য মোটা মুটি দেখা যায় না। কিন্তু চেতনে ও উদ্ভিদে পার্থক্যও অনেক। জগদীশবাবু উদ্ভিদ ও জীবের সাদৃশ্য যে ভাবে দেখাইয়াছেন তাঁহার বই যাঁরা পড়েছেন বা তাহার Experiment যাঁরা দেখেছেন তাঁরা সে বিষয় সন্দেহ করেন না। মাননীয় কামাখ্যাবাবুও করেন না। *

কিন্তু এই জীব ও উদ্ভিদ রূপ দুই ভিন্ন রাজ্যের মাঝখানে এমন কতকগুলি প্রাণী বা উদ্ভিদ্ দেখা যায় যাদের কোন্ রাজ্যে ফেলা হবে ভেবে পাওয়া যায় না।

উদ্ভিদে ও জীবে সাধারণ দৃষ্টির পার্থক্য তাহাদের সংঘাত বৈচিত্র্যে

* বিগত আষাঢ়ের উদ্বোধনে "উদ্ভিদের সাড়া" দেখুন।

দৃষ্ট হয়। এই দুইয়েরই একটি বৈশিষ্ট্য কোন সংঘাতে সৃষ্টি। কিন্তু জীবকোষে ও উদ্ভিদ্‌কোষে, ভিন্ন ভিন্ন জীবকোষে, ও উচ্চতর জীবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জীবকোষের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সতন্ত্র। গঠন সতন্ত্র, কার্য্যপ্রণালী সতন্ত্র, তথাপি তাহাদের এক পর্য্যায় ভুক্ত করা হয় কেন? মূলতঃ এক প্রকার জীবকোষের বংশধর বলিয়া। এক বাপমার ছেলে কেহ হিন্দু, কেহ ব্রাহ্ম কেহ কৃশ্চান। কেহ কেরাণি, কেহ মাষ্টার, কেহ উকিল, কেহ হাকিম। নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাহাদের গঠন ও কার্য্যপার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে Ovum ও Spermatozoa একত্র হইয়া বংশ বিস্তার করিতে লাগিল, তাহাদেরই বংশধর liver-cell, brain-cell, msucle ইত্যাদি ভিন্নাকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জীবকোষে পরিণত হইল। animal-cell মানুষে হাড় তৈয়ারী করিল উদ্ভিদের cell কাট তৈয়ার করিল। এই হাড় ও কাট কিন্তু জীবধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। আবার জীবকোষের ভিতর যে যে দ্রব্য আছে তাহা জীবধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। অর্থাৎ কতকগুলি মৌলিক পদার্থের এমন একটা সমবায় সংযোগ উপস্থিত হইল যাহার ফলে সে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। কে এই সংঘাত আনয়ন করিল—কবে হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই তাই অনুমানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যখন একের বিকাশে জগৎ, (বাস্তবিক থাক বা না থাক যাহা আমরা আছে বলিয়া দেখিতেছি) তখন স্বীকার করিতে হইবে, সেই একই ইহা করিয়াছেন ও একেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তিতে জড় ও চেতনের সৃষ্টি। সমবায়ের বিভিন্নতায়, মূলতঃ, তাহাদের পার্থক্য নাই যদিচ সাধারণ দৃষ্টিতে তাহাদের পৃথক বলিয়া বোধ হয়। ইহ একটা মায়ার ব্যাপার এক হইয়াও ভিন্ন দেখান।

ওভাম (ডিম্বকোষ) ও স্পার্মটোজোয়ার সংযোগে জীবকোষের এমন একটি শক্তি সঞ্চারিত হয় যাহা দ্বারা তাহা ঘন ঘন দ্বিখণ্ডিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই বর্দ্ধমান শক্তির পশ্চাতে আরো একটি শক্তি বিদ্যমান যাহা দ্বারা তাহার অবয়ব পিতৃ-মাতৃজাতীয় হইয়া থাকে। কেমন করিয়া এইটি হয় ঐ শক্তির কেন্দ্র কোথায় তাহা

আমরা জানিনা। কিন্তু যদি মায়ার খেলা বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, এ সকল সত্য লোক-সমাজে প্রকাশিত হইত কিরূপে? ইহা যে জড়বাদী পাশ্চাত্যের মনীষার দ্বারা আবিষ্কৃত তাহা নহে। যে দেশে বেদান্ত ও মায়াবাদের জন্ম সে দেশের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও এই সব জীব জননের জীবনধারা ও পরিবর্দ্ধন ব্যাখ্যা এত বিস্তৃত ভাবে আছে যাহা পাশ্চাত্যের নিকট কবি-কল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়। হয়ত কবি কল্পনা হইতেও পারে, আবার না হওয়াও বিচিত্র নহে। কারণ এদেশে জ্ঞান ও সত্য লাভের উপায় সতন্ত্র ছিল। বুদ্ধি বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া বিচার অভিজ্ঞতা ও অনুমান ব্যতিত তাঁহারা ধ্যান সহায়ে সত্য প্রত্যক্ষ করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ Super Conscious State বলিয়া তাহার রাজযোগ নামক গ্রন্থে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কেহ কোন বিষয়ে একনিষ্ঠ হইয়া গভীর চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে ধ্যান-লব্ধ সত্য তাহার নিকট নানা ভাবে আত্ম প্রকাশ করে। এই সত্যের প্রকাশ ধ্যানের গভীরতা ও অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই জন্যই জগদীশবাবুর পরিচয় পাইয়া দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মঠাধ্যক্ষ তাঁহাকে মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহাকে মন্দির মধ্যে আহ্বান করিলে জগদীশবাবু তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ নহেন কারণ অব্রাহ্মণের মন্দির প্রবেশের অধিকার নাই তাহা তিনি জানিতেন। উত্তরে মঠাধ্যক্ষ বলেন "আপনি ঋষি যেহেতু সত্য দর্শন ও লাভ করিয়াছেন অতএব আপনি সকল জাতির উপরে। আপনার মন্দির প্রবেশে কোন বাধা থাকিতে পারে না।"

ডাক্তার

পুস্তক পরিচয়

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়—রায়পুর, ২৪ পরগণায় ১৯২৬ এবং ২৭ সনের কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আলোচ্যবর্ষে প্রায় ৮০ জন ছাত্র এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মধ্য বাংলা পর্য্যন্ত পড়ান হইয়া থাকে।

২। গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত—মূল্য আট আনা। গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ববাচক শ্লোকগুলি একত্রিত করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎকালিক সৃষ্টি ও জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু নূতন কথা ইহাতে আছে। পুস্তিকাখানি আরও উৎকৃষ্ট আকারে বাহির হওয়া উচিত ছিল।

৩। ঘরের কথা—ত্রৈমাসিক সংবাদ সংগ্রহ—৩য় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কাগজখানি বেশ একটু নূতন ধরণের। দৈনন্দিন জানিবার কথাও অনেক। সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার বন্দোপাধ্যায়।

৪। একাকার মানব—জাতির জাতি গঠন—শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত। পুস্তকের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলাম না।

৫। বঙ্গ-সাহিত্য—মাসিক পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীশিশির কুমার মিত্র। "নির্ব্বাচিত বাংলা পুস্তক" প্রবন্ধটি দরকারী।

৬। পত্রপুষ্প—সচিত্র গল্পের মাসিক—প্রকাশক কলিকাতা ফাইন আর্ট কটেজ। ছবি ও গল্পগুলি মন্দ নয়।

৭। গল্প-লহরী—ইহাও গল্পের মাসিক—অধিকাংশ গল্পই নূতন ভাবে লেখা—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদক।

সংঘ বার্ত্তা

১। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজকে লিখিত পত্র হইতে—

৮ই আগষ্ট

আনন্দ আশ্রম

লস্ এঞ্জেল

ইউ, এস্,

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু,—

শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিপূর্ব্বক সেবিকার নিবেদন এই মহারাজ ২২শে জুলাই বিশ্বমন্দিরে প্রথম অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। মন্দির নির্ম্মাণ এখনও শেষ হয় নাই. অনেক কাজ বাকী; মহারাজের ইচ্ছায় সব কাজ শেষ হইলে উৎসর্গ করা হইবে, কিন্তু ঐ তারিখে উৎসব হইবে বলিয়া আগেই "message"এ বাহির হইয়াছিল এবং জানাজানি হইয়াছিল—বহুদূর হইতে সব লোক আগেই আশ্রমে আসিতেছিল; কাজেই ঐ তারিখে তিনি "First consecretion Service" করিলেন। কাহাকেও বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, কেবল নিকটস্থ সহরে যে সব ভক্তরা থাকেন—যাঁহারা সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, তাঁহাদিগকেই বলা হইয়াছিল। অনেকে অপরের মুখে শুনিয়াই আসিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ লোক হইয়াছিল।

সেই দিন হইতেই ভাবিতেছি, আপনাকে সব লিখিয়া জানাইব, কিন্তু আজও পারিয়া উঠি নাই। দয়া করিয়া আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। পূঃ বসন্ত মহারাজও সেইদিন হইতে আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, আপনার কাছে চিঠি লিখিয়া সব জানাইতে। তাঁর শরীরটা খুবই খারাপ হইয়াছিল, একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন, এখন ক্রমেই সারিয়া উঠিতেছেন। তাঁর জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না; সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহেই আমি আপনাকে জানাইতে পারিব যে

তিনি সম্পূর্ণ সবল হইয়াছেন। আপনার অতখানি স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ যাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, বিশ্বজননী যাঁহাকে নিয়ত ক্রোড়ে রাখিয়াছেন, তাঁর জন্য ভাবনার কিছু নাই। তবে অতিরিক্ত খাটুনী, নানারূপ সমস্যা এবং অতবড় আশ্রমের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার ভার তাঁর শরীরের পক্ষে অতিমাত্রায় বেশী হইয়া পড়ে। প্রথমে তাঁর জ্বর হইতে থাকে, পরে জানা গেল যে দাঁতের গোড়ায় "অ্যাবসেস্" হইয়াছে। ২টি দাঁত তুলিয়া ফেলিয়া, ডাক্তার যতটা সম্ভব বিষ বাহির করিয়া দিয়াছেন। তার পর হইতেই ধীরে ২ সুস্থ হইতেছেন। দাঁতের এ রকম অসুখ নাকি খুব খারাপ—ডাক্তার বলিয়াছেন, ইহাতে মানুষের জীবনসংশয় ঘটাইতে পারে। যাক্ এখন আর কোনও ভয় নাই।

মন্দির অভিষেকের সকল খুঁটিনাটি আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা হয়। এতদিন পরে সব ঠিক ঠিক ভাবে জানাইতে পারিব কিনা জানি না। তা ছাড়া অন্তরে যাহা অনুভব করিয়াছি, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এখানকার খবরের কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল, সেইটুকু কাটিয়া আপনাকে পাঠাইলাম উহা হইতেও আপনি কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

২১শে জুলাই সকাল বেলা ও মন্দিরের ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাজে কাঠের টুকরা রংএর সরঞ্জাম প্রভৃতি নানাবিধ অপরিচ্ছিন্নতায় পরিপূর্ণ ছিল। আমরা ভাবিয়াই পাই নাই, কিরূপে এইস্থানে পরের দিন অতবড় উৎসবের কার্য্য পরিচালিত হইবে। কিন্তু আশ্রম সেবকসেবিকাগণের ঐকান্তিক যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ভোজবাজীর মত সব অন্তর্হিত হইয়া, সেই স্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইল। আশ্রমের ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যারতির পর পরমানন্দজী মহারাজ মন্দির সাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; আশ্রম সেবক ও সেবিকাগণ ফুল জল আগাইয়া দিয়া, কেহবা চেয়ার টেবিল বহন করিয়া, কেহবা বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের বড় হলের মধ্যেই একটু উঁচু করিয়া Shrine বা ঠাকুর ঘর, একজন ভক্ত স্বামিজীর Studyর জন্য বহুমূল্য কাঠের আসবাব

পাঠাইয়াছিলেন, তাহারই একটি মন্দিরের মাঝখানে, ঠাকুর ঘরের মাঝখানটিতে খাপ খাইয়া গেল, এমন মানাইল যেন উহার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে। পশ্চাতে অপূর্ব্ব কারুশিল্প মণ্ডিত বস্ত্রের আস্তরণ ঝুলাইয়া তাহার উপরিভাগে প্রণবরূপী ব্রহ্মস্থাপন করিলেন। একজন আশ্রম-সেবিকা অতি সুন্দর বর্ণরঞ্জিত পদ্মদলের মধ্যভাগে ওঁ লিখিয়াছিলেন—প্রাণের ভক্তি ঢালিয়া নির্জ্জনে বসিয়া ঐ ধ্যানের রূপটিকে তুলিতে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হইল। সম্মুখ ভাগে ফুলদানী সকল ফুলে ফুলে সজ্জিত হইয়া স্থাপিত হইল। ছবি রাখিবার জন্য দেয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির রচিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের, মাতাঠাকুরাণীর, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি পূজ্যপাদযতিগণের প্রতিচ্ছবি স্থাপন করিয়া পুষ্পে পত্রে সজ্জিত হইল। পূর্ব্বেই মন্দির ধুইয়া মুছিয়া গঙ্গাজল ছিটাইয়া পবিত্র করা হইয়াছিল। সর্ব্বত্র যেন একটা নূতন জগতের সাড়া পড়িয়া গেল।

এ সব সারিতে সারিতে রাত্রি প্রায় ১০টা হইল; মহারাজ পূজার আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন; ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীগণ নীরবে আসন গ্রহন করিলেন। কী এক অপূর্ব্বভাবে সকলের হৃদয়মন পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শান্তিরসে দেহ মন সিক্ত হইয়া গেল! এই যে সেই গৃহ যেখানে মিস্ত্রীরা সারাদিন কাজ করিয়াছে, যে স্থানের অপরিচ্ছিন্নতার ভয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় নাই, সে কথা কাহারও মনে রহিল না। যেন এই মন্দিরে যুগে যুগে বিশ্বদেবতার অর্চ্চনা হইয়াছে, তাঁহার অপূর্ব্ব আবির্ভাবে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমরা বসিয়া রহিলাম।

পরের দিন বেলা ১১টার সময়ে সকলের উপাসনা। ১০টা হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইল। ১১টার সময়ে পরমানন্দজী মহারাজ মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে নীরবে ভক্তিনত হৃদয়ে এই বিশ্ব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। এখানেও উভয়পার্শ্বে প্রাচীর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১০টি মন্দির রচিত হইয়াছে—একটিতে ধ্যানী

বুদ্ধ, একটিতে খ্রীষ্ট, একটিতে কন্‌ফিউসিয়াস্, জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের মূর্ত্তি পত্রে পুষ্পে সজ্জিত কুঞ্জে অবস্থিত রহিয়াছে; অপর-গুলির জন্য যোগ্য প্রতীক এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তাই ফুল-দানীতে ফুল সাজাইয়া হিন্দু, পার্শী, মুসলমান, একেশ্বরবাদ, য়িহুদী ও সিণ্টোধর্ম্মের প্রতীকরূপে স্থাপন করা হইয়াছে; একজন ভক্ত অনেক ফুল পাঠাইয়াছিলেন—এতগুলি মনোহর পুষ্পের সমাবেশ, জীবনে আর কখনও দেখি নাই! সে দিন মনে হইয়াছিল কুসুম যেমন তাঁহার যোগ্য প্রতীক, সে যেমন তাহার পবিত্ররূপে ও সৌরভে তাঁহাকে ঘোষণা করিতে পারে কিছুই বুঝি বা তেমন পারে না।

নীরবে আমরা সকলে সেই পুষ্প সুরভিত ধূপ-ধূনাতে আমোদিত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম—নীরবে সকলে আসন গ্রহণ করিলাম। সংস্কৃত বেদগাথা "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" এবং স্বামী পরমানন্দজী রচিত কয়েকটি ইংরাজি সংগীত গীত হইল। বাহিরের একটি ভক্ত অতি সুন্দর একটি গান গাহিয়াছিলেন, শুনিলাম সেটিও সংস্কৃতের অনুবাদ। তারপর মহারাজ যখন গম্ভীর কণ্ঠে গদগদ ভাষায় সকলকে এই বিশ্বদেবের পূজায় আহ্বান করিলেন, তখন কী এক ভাবের আবেশে সকলেই আবিষ্ট হইয়া গেল! বলিতে বলিতে একস্থানে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যদি এই বিরাট মহান্ ভাবের প্রকৃত আভাষ তোমাদিগকে না দিতে পারিয়া থাকি, তবে আমার সে ক্রটী তোমরা সংশোধন করিয়া লইও। আজ এই বিশ্বেশ্বরের পূজায় ভাষার কোনও যোগ্যতা নাই, আজ কেবল নীরবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার দিন।" শ্রোতৃবর্গ তখন অশ্রু ছল ছল নেত্রে করযোড়ে বসিয়াছিলেন।

আশ্রম সেবকগণ যে কতখানি ভক্তি ও সেবাপূর্ণ হৃদয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন, সে কথা বলিতে বলিতে তাঁহার স্বরে কোমলতা ও স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িয়াছিল! তিনি বলিয়াছিলেন "আমি যদি ইহাদিগকে বলি যে তোমরা ঐ পাহাড়টি সরাইয়া ফেল, তবে তাহারা তাহাতেও রাজী।" সত্যই অতবড় মন্দিরের ভিত্তি পাহাড় কাটিয়াই সমতল করা হইয়াছে এবং ইঁহারাই করিয়াছেন। গুরুভক্তি

আমাদের অস্থিমজ্জাগত, কিন্তু এই জড়বাদ প্রমুখ স্বাধীন জগতে যেখানে পিতাপুত্রের সমান অধিকার, সেখানে ইহার এরূপ বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়াপ্লুত হৃদয় একমাত্র তাঁহারই মহিমায় ডুবিয়া যায়।

অতবড় হলে স্থান সংকুলান হয় নাই, বাহিরে চেয়ার ও বেঞ্চি দিয়া জায়গা করা হইয়াছিল, কিন্তু লোকের এত আগ্রহ যে রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতেই বসিয়া গেল! বেলা ১টায় প্রসাদ বিতরণ হইল। একজন ভক্ত সব খাবার পাঠাইয়াছিলেন। বিকালে ৩½টায় আবার বক্তৃতা, সকলেই মুগ্ধ, সকলেই বলিতে লাগিলেন "এমন দিন জীবনে সর্ব্বদা আসে না wonderful day!" ভগবৎ সত্তার জীবন্ত আবির্ভাব সেদিন সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করিয়াছিল! সকলেই বলিয়াছিলেন "আজকার এই দিনটি ভুলিবার নয়, আজ যাহা পাইলাম, তাহা অমর, তাহা অক্ষয়!"

মহারাজ বলেন "ঠাকুরের বাণী প্রচারে আমি যদি নিমিত্ত হইতে পারিয়া থাকি, তবে সেইটুকুই আমার পরম সৌভাগ্য!" সত্যই এই নবযুগে তিনি যে সাম্যের বাণী নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এ মন্দিরে যেন তাহারই জীবন্ত মূর্ত্তি।

এই অসম্পূর্ণ মন্দিরের কয়েকখানি ছবি ভগিনী দেবমাতা আপনাকে পাঠাইবেন—মন্দির শেষ হইলে ভাল করিয়া প্রত্যেক অংশের ছবি তুলিয়া আপনাকে পাঠাইবার ইচ্ছা আমার আছে, যদি কৃতকার্য্য হই, তবে আপনি তাহা হইতে কতকটা আভাষ পাইবেন। সিষ্টার আপনাকে চিঠিও লিখিয়াছেন, তাঁর চিঠি, খবরের কাগজ ও এই চিঠি হইতে আপনি কিছুটা আভাষ পাইবেন—আশা করি।

সেবিকা—চারু

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে ! কত যুগ যুগান্তরে
কাণ পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুলফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি ॥
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে !
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে, শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কার গীতি , নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনা গান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে ॥
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,
কাছে থেকে শুনি নাই ॥

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে।

হে তপস্বী, তুমি একমনা,
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জনম-মরণ দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হতে,
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে
তোমার প্রতিভা দীপ্ত চিত্ত মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্ম্মের সাথে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি,
সেথা তুমি দীপ হস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয় রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী—
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে॥

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে.
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,

পেয়েছে সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বাসিয়া উঠিয়াছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্ম মাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথা সহস্র প্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যা-ক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়-সন্ধ্যাকালে
কবি হাতে বরমাল্য যে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করেনি সে তো জনতার সমর্থন তরে।
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।

আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথাপ্রসঙ্গে

একটা সময় ছিল যখন পাশ্চাত্য বণিকেরা বলত প্রাচ্যের মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবেই কেন না, এই যে বহু প্রায় ৬৫,৫০,০০,০০০ কোটি চীনে, ৩১,৯০,০০,০০০ কোটি ভারতবাসী আর ১৯,০০,০০,০০০ কোটি নিগ্রো এদের মানুষ করা চাই-ই। ইউরোপকে এদের অভিভাবক হয়ে থাকতেই হবে। এঁরা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের মানুষদের 'মানুষ' করে এসিয়া এবং আফ্রিকায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি পাশ্চাত্যের মঙ্গলের জন্য তাদের মস্তিষ্কটি আমাদের জয় করতেই হবে, নইলে তাঁদের বাঁচা একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু ক্ষুদ্র ইউরোপ এত বড় হল কি করে?—বিজ্ঞান সহায়ে। বিজ্ঞান কি খারাপ, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ত জ্ঞান লাভ?—তা হলেও অনেক উপাদেয় খাদ্য যেমন কোনও কোনও ধাতু পাত্রে রাখলে বিষের ক্রিয়া করে, সেইরূপ ইউরোপীর হাতে পড়ে বিজ্ঞানেরও ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি হয়েছে। ইমারসনের একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করলেই পাশ্চাত্যের অবস্থা কতকটা বোঝা যাবে।

"The motive of science was extension of man on all sides into Nature till his hands should touch the stars, his eyes see through the earth, his ears understand the language of beast and bird, and the sense of the wind; and, through his sympathies that is not our science. All our science lacks a human side, * * * Puts humanity to the door * * * The connection which is the test of genius. * * Science in England, in America is jealous of theory, hates the name of

Love and moral purpose. In the absence of the highest aims, of pure love of knowledge, and the surrender to nature, there is the suppression of the imagination, the priapism of the senses and the understanding; we have the factitious, instead of the natural, tasteless expense, art of comfort and the rewarding as an illustrious inventor whoever will contrive one impediment more to interpose between man and objects."

অর্থাৎ, বিজ্ঞান চেয়েছিল সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে—বিশ্বের মর্ম্ম-রহস্যের সন্ধান নিতে—বিহঙ্গের কাকলী, প্রভঞ্জনের অনুভূতি, ইতর প্রাণীর নীরব ভাষার তাৎপর্য্য নিরূপণ ও সহানুভূতি সহায়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের সঙ্গে সখ্যালাপ করতে। কিন্তু পথভ্রষ্ট ইউরোপ হৃদয়কে তার অঙ্গ থেকে ব্যবচ্ছেদ করে একটা নির্ম্মম পশু হয়ে উঠেছে। সে মনুষ্যত্বের কোন ধার-ই ধারে না, হৃদয়বত্তাকে সে তার পরীক্ষাগারের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয় না। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যে একটা সুদৃঢ় নাড়ীর বন্ধন রয়েছে বিজ্ঞানের তথাকথিত প্রতিভা তা আর দেখতে পায় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিজ্ঞান এখন দিব্য কল্পনার বিরোধী। প্রেম ও নীতিকে সে ঘৃণা করে—তাই তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহা ও আত্মভোলা প্রকৃতি-প্রেম ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। ফলে দাঁড়াচ্ছে—হৃদয়হীনতা ও ইন্দ্রিয় দেবতার উপাসনা, স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে কৃত্রিমতা, রুচিবিরুদ্ধ ব্যয়, ভোগে তৃপ্তি এবং জীবনের আদর্শ পথে নব নব অন্তরায়ের আবিষ্কর্ত্তাকে উপঢৌকন প্রদান।

এত গেল প্রাচীন ইমারসনের কথা; এখন নবীন রেঁামা রোলাঁর কথাটা তুলেও দেখাতে চাই। সেদিন একখানা চিঠি আমাদের লিখেছিলেন, তাতে স্পষ্ট ভাষায় ইউরোপের জন্য প্রাচীর সাহায্য প্রার্থনা তিনি করেছেন।

"Now we are in Europe and in the whole world at an hour of social tempest coming out from a tempest of action, still more formidable than the preceding one, in which millions of men are seeking for a direction. One must try and give it to them as clearly, as simply, and shortly as possible, and without waiting ; for, the cyclone will never wait. For which cause it is necessary to allow the entrance of the sun of truth, whose rays enlighten the road where these people will have marched. I am convinced that the Swami Vivekananda would have aided them powerfully if he had lived at the hour in which we live to-day."

"আমরা এখন ইউরোপে রইছি, আর এ সময় জগতে একটা প্রবল সামাজিক ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ, যেটার প্রবর্ত্তক হচ্ছে আর একটা বিরাট কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্ত্ত, যা গত ঝঞ্ঝা থেকে অনেক শক্তিশালী, যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজ লক্ষ লক্ষ লোক একজন নিপুণ কর্ণধার চায়। এখন এই রক্ষা নির্দ্দেশ করতে হবে স্পষ্ট সহজ এবং যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে। এর জন্য অপেক্ষা করবার সময় নেই, কারণ সেই প্রচণ্ড আবর্ত্ত কারও জন্যে দাঁড়াবে না।

"এখন অবশ্য কর্ত্তব্য হচ্ছে, যে রাস্তা দিয়ে আজ মানুষ এগোবে সে রাস্তাকে সত্য-সূর্য্যের আলোয় আলোকিত করতে হবে। আজ এই সন্ধিক্ষণে যদি স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকতেন, তা হলে মানুষ তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেত—এ আমার আন্তরিক বিশ্বাস।"

ভারত-ভারতীদের মধ্যে কারু-কারু ইউরোপী চাক্‌চিক্য দেখে স্বদেশের প্রতি একটা ঘৃণা এসেছে। তাঁরা বলেন, ভারতবর্ষে আর কিছু নেই, একেবারে ইউরোপের নকল করে নকল ইউরোপী হয়ে যাও। কিন্তু কবি খুশহালের একটা ছন্দ মনে পড়ে—

বর্ষায় বাড়িয়া বনলতা,
উচ্চে উঠে দেবদারু বাহি ;
"কত হল বয়ঃক্রম তব ?"
জিজ্ঞাসে তরুণ মুখ চাহি।
তরু কহে, "বর্ষ দুই শত,—
মাস ছয় এদিক ওদিক।"
লতা বলে, "এতে বৃদ্ধি এই !
সপ্তাহে যা হোল মোর ঠিক !"
তরু বলে, "বাঁচ আগে শীতের তুষারে,
আয়ু ও বৃদ্ধির কথা হবে তার পরে।"

বেনজামিন ডিসরাইলি একবার খেদ করে বলেছিলেন, "'দুর্ভাগা' এসিয়া ? তুমি কি এশিয়া মহাদেশকে দুর্ভাগা এশিয়া বলতে চাও ? পারমার্থিক ভাবরাজি ও আধ্যাত্মিক ভাবের লীলানিকেতনকে তুমি এই আখ্যা দেবে ? বিশ্বের অন্যান্য অংশের যাকে তুমি 'জাগরণ' বল, এশিয়ার এই 'ঘুমঘোর' তার চাইতে বেশী দরকার, কারণ প্রতিভাবান্ লোকের স্বপ্ন সাধারণ মনুষ্যের জাগরণ অপেক্ষা অনেক মূল্যবান। তবুও বলবে দুর্ভাগা' এশিয়া ? হায় ! ইউরোপের দুর্ভাগ্যের জন্যেই আমার দুঃখ হয় ?"

বিগত লড়ায়ের যিনি প্রধান পাণ্ডা—লয়েড জর্জ্জ তাঁকেও বলতে হয়েছে, "The conscience of peoples must be trained so as to abhor bloodshed as crime and churches must create the atmosphere." বিশ্বের বিভিন্ন জাতির বিবেক এরূপ জাগ্রত করতে হবে যেন রক্তপাতকে মানুষ গর্হিতজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করে—দেশের ধর্ম্মমন্দিরাদিকেই ঐরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে।

শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের ওপরও তিনি ধর্ম্মের প্রভাব আনতে চান। তিনি বলছেন, "There must be some less barbarous way of settling industrial disputes than

the war of starvation. Churches could engerminate a spirit of good will between classes with greater readiness to consider each others point of view."—শিল্প ও বাণিজ্যগত বিবাদ মেটাবার জন্য দেশাবরোধ প্রভৃতি বর্ব্বরোচিত উপায় অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্ট পন্থা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও পরস্পরের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখবার ভাব সমাজ-শরীরে ছড়াতে ধর্ম্মমন্দিরই সক্ষম হতে পারে।

বাস্তবিক আজ যদি ইউরোপকে বাঁচাতে হয় তা হলে ভেতর-কার কথা তাদের শোনাতে হবে। নিত্য কাল বাঁচতে হলে নিত্যের জ্ঞান দরকার। অনিত্য চিরকাল কাকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। সমস্ত ইউরোপের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইমারসান গুটিকতক শব্দে তা সংক্ষেপ করেছেন, "defining, result-loving, machine-making, surface-seeking, opera-going Europe." এই যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশী, ফলাকাঙ্ক্ষা, যন্ত্র-কুশলী, বহির্দ্দৃষ্টি, নাট্যামোদী ইউরোপ, এরা কি চিরকালই ভোগ বিলাসের পঙ্কিল আবিলতায় ডুবে থাকবে? মুক্তির অধিকারী কি এরাও নয়?

তবে, ধীরে ধীরে ইউরোপের মহামনস্বিগণ প্রাচ্য শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠছেন। পল্ ডুসেন এবং সোপেনহাওয়ার এখন ত জার্ম্মাণ বৈদান্তিক বলে পরিচিত। আঁকেতীই দুপের রের উপনিষদের অনুবাদ পড়ে সোপেনহাওয়ার বলেছিলেন, "Solace of my life" —আমার জীবনের সান্ত্বনা। আনাতোল ফ্রাঁস্, মুসি গুমের শ্রীবুদ্ধের মূর্ত্তির পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "I admit that I felt tempted to pray to him as to a god, and to demand the secret of the proper conduct of life, for which governments and peoples search in vain."—আমি স্বীকার করছি, সেই দেব বিগ্রহের সামনে সৎ জীবনের গুপ্ত-সত্য লাভ করবার জন্য প্রার্থনার লোভ ত্যাগ করতে পারিনি, আজ যা জানবার জন্য রাজনীতি ও জনসাধারণ বৃথা চেষ্টা করছে।

এদিকে আবার রোমা রোলা বলছেন, "I look upon Swami Vivekananda as a dynamo of spiritual force and Sri Ramakrishna as a river of love. Both of them reveal God and life Eternal. * * I wish to dedicate to them a book which would make them known to the great masses of the west."—স্বামী বিবেকানন্দকে দেখি, তিনি যেন অধ্যাত্ম শক্তির একটি বিদ্যুতাধার আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন একটি প্রেম-স্রোতস্বিনী। দুজনেই ঈশ্বর ও অনন্ত জীবনের আবিষ্কার করেছেন। * * আমি একখানা বই তাঁদের নামে উৎসর্গ করতে চাই যাতে পাশ্চাত্য সাধারণে তাঁদের চিনতে পারে।

হুইটম্যানের কবিতায় ভারতীয় প্রভাব এত বেশী যে, স্বামিজী তাঁকে "মার্কিন সন্ন্যাসী" বলতেন। আবার কবি জর্জ্জ রাসেলের ওপর ভারতীয় শাস্ত্রের প্রভাব কত বেশী তা তাঁর স্বীকারোক্তিতে বেশ প্রকাশ পেয়েছে,—"আমি ছেলে বেলা থেকে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শনের অনুরাগী। আমি সংস্কৃত জানিনা বটে, তবুও হিন্দুর চিকিৎসা, যোগ, ব্যাকরণ, বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষদের সমালোচনায় অনেক সময় কাটিয়েছি এবং তাতে অনেক উপকার পেয়েছি। এতে আমার চিন্তা ও আদর্শ এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে, যেন আমি হিন্দু। আমি যোগতত্ত্ব কিছু কিছু উপলব্ধি করেছি; তবে গুরুর অভাবে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। হিন্দুর অধ্যাত্ম বিদ্যা লোক ঠকানর জন্য নয়, এর সত্য আমি নিজ জীবনে উপলব্ধি করে লিখছি। যোগাসনে বসে আপনাদের কুণ্ডলিনী তত্ত্বের আভাষ পেয়েছি। আমার দৃঢ় ধারণা যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই ঋষিরা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছিলেন। জগৎ রহস্য সম্বন্ধে তাঁদের যথার্থ জ্ঞান ছিল।"

রাশিয়ার ঋষি কাউণ্ট টলষ্টয় স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" পড়ে তাঁর এক বন্ধুকে লেখেন,—

"Dear Sir, I received your letter and the book

(Raja-yoga of Swami Vivekananda) and thank you very much for both...the book is most remarkable and I have received much instruction from it. So far Humanity has frequently gone backwards from the true and lofty and clear conception of the principle of life but never surpassed it." প্রিয় মহাশয়, আপনার চিঠি ও তার সঙ্গে যে বইখানি (রাজযোগ) পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি এবং আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইখানি অদ্ভুত, অনেক উপদেশ এ থেকে আমি পেলুম। সত্যের, উচ্চভাবের সুস্পষ্ট ধারণা এর চাইতে মানুষ কখন করতে ত পারেই নি বরং ঐ আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে সে বারবার অধঃপতিত হয়েছে।

রোলাঁ বলেন যে, টলষ্টয়ের বন্ধু বিরুকফে্র (Birukoff) মত মনীষীও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। সোপেনহাওয়ার ইউরোপের প্রথম মুনি, তাঁর ধমনীতে ভারতীয় রক্তই বইত।

যে পুতুল পূজো নিয়ে আমাদের দেশে এতো মারামারি, যা বোঝাতে গেলে আমাদের দেশের বড় বড় মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের দরকার হয়ে থাকে, সেই মূর্ত্তি পূজার তাৎপর্য্য মোক্ষমূলর কি সুন্দর ভাবে বলছেন,—

"It is true that the Hindus worship idols. But in the Bhagavad Gita the supreme spirit is introduced as looking with pity on all these helpless childish customs, as saying with the sublimest and almost super divine unselfishness. 'Even those who worship idols, worship me.' Is not this the same thought St. Paul expressed so powerfully at Athens! 'Whom, therefore, ye ignorantly worship, Him declare I unto you,' and is not this the spirit in which missionaries might and ought to approach every religion."

স্বামিজীর চরিত্র ও ভাষা যে, দেশ-কাল এবং জাতিকে অতিক্রম করে তার প্রভাব বিস্তার করত, সে বাণী যে কত শক্তিশালী তা মার্কিন মহিলা কবি এলা হুইলার উইল্‌কক্সের কথায় বেশ সুস্পষ্ট ধরা যায়,—"এই লোকটি আমাকে পার্থিব বিষয় কর্ম্মের তুচ্ছ গণ্ডগোলের ঊর্দ্ধে নিয়ে যান, জীবনকে জড় ভাবে দেখা যে কত হেয়, প্রকৃত পক্ষে জীবন যে চৈতন্যময়, তা আমি এঁর প্রসাদে ও শক্তিতে উপলব্ধি করতে পারি; তখন আমি নব বলে বলীয়ান হয়ে আবার জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে পারি।"

পবিত্রতার আকর্ষণ যে কী, তা ইউরোপের বিখ্যাত গাইকা মাদাম কালভের স্বামিজী সম্বন্ধে উক্তিতে বেশ বোঝা যায়,—"স্বামী বিবেকানন্দ যীশুখৃষ্টের মত ছিলেন, যীশুর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল, যীশুর মত তাঁর জীবন প্রেমপূর্ণ সরল ছিল। * * তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মত পবিত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও লোকে পবিত্র হোত। ভগবৎ শক্তির প্রকাশমূর্ত্তি বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর কি প্রবল আকর্ষণ ছিল—সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও বোধ করিনি। কতদিন তাঁর কথা শুনতে শুনতে এত তন্ময় হয়ে গেছি যে, কখন আমার স্পেশাল ট্রেন এল—চলে গেল কিছু লক্ষ্য ছিল না। তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয় বহুবার আমাকে অর্থ দণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়, কি অদ্ভুত পবিত্রতা—কি মোহন আকর্ষণ—কি মর্ম্মস্পর্শী বাণী—কি বালসুলভ সরলতা—কি উন্নত উদার সঙ্গ—কি অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি—কি সুন্দর বিশাল আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু!"

প্রেগের (Prague) প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক দ্বরেফ্, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর যে প্রতিকৃতি এঁকেছেন, প্যারীর স্বনামধন্য মুদ্রাকৌশলী এম্ লিলাক, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে পদক প্রস্তুত করেছেন, ওয়াল্ডো ইমারসন ট্রাইন প্রভৃতি বহু মনীষীর যে শিল্প, সাহিত্য ও দর্শন, আজ প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের শ্রদ্ধা-নিবেদন ছাড়া আর কি?

স্বামী প্রেমানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গী শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ— আমাদের পরম প্রিয় বাবুরাম মহারাজের দেব-মানব চরিত্র সম্বন্ধে কত কথা কত ভক্তের নিকট সঞ্চিত হইয়া আছে। তাহার কতক সংগ্রহ করিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইবার আরও কয়েকটি নূতন ঘটনা—যাহা তৎসঙ্গ লাভে কৃতার্থম্মন্য ভক্তদের নিকট হইতে জানিতে পারা গিয়াছে,—পাঠকদিগকে উপহার দিবার চেষ্টা করিলাম।

এই নিত্যসিদ্ধ আপ্তকাম মহাপুরুষ অপার্থিব প্রেম, পবিত্রতা ও ঐশ্বরিক ভাব লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সংঘের মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন; এবং মায়েরও অধিক, অথচ সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধ-লেশ-হীন যত্ন ও ভালবাসায় পুত্রস্থানীয় সাধু ভক্তদের জীবন-গঠন ও সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধানে রত থাকিয়া নিজের বিন্দু বিন্দু শোণিত দান করিয়াছিলেন। চোখের জলে সেই সব কথার সাক্ষ্যদান করিতে এখনও বহু সাধুভক্ত বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ গঠনকার্য্যে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে, সে কথা বিচারের আমরা অধিকারী নহি। আমরা শুধু তাঁহার মহান্ চরিত্র স্মরণ করিয়া তৎপ্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতে পারিলেই নিজেরা ধন্য হইয়া যাইব।

প্রেম মানুষকে পবিত্র করে, দেবতা করে; প্রেমের চক্ষে সর্ব্বপ্রকার বাহিক ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; প্রেম ব্যতীত অন্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারা যায় না। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের সংসর্গে বহু মানুষ দেবতা হইয়াছে, নিজেদের অবস্থানুগত সর্ব্বপ্রকার হীনতা ভুলিয়াছে, এবং ঐশ্বরিক প্রেমের অধিকারী হইয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। একবার মাত্র যে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছে, তাঁহার মধুময় স্মৃতি তাহার অন্তরে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া

গিয়াছে; এবং বাকী জীবন সেই স্মৃতিরূপ সাশ্রুপুষ্পে তাঁহার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। বাবুরাম মহারাজ নিজে বলিয়াছিলেন, তিনি ভক্তদের বাহ্যিক দুর্ব্বলতাদি মোটেই লক্ষ্য করিতেন না; তাহাদের অন্তরের ভক্তিটুকু শুধু তাঁহার চোখে পড়িত, এবং সেইজন্যই ভক্তসেবার জন্য আকুল হইয়া পড়িতেন।

প্রেমের চক্ষে জাতিগত ধর্ম্মগত ভেদও লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার প্রেমের টানে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমানেরা সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করতঃ নৃত্য করিয়াছে, এরূপও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ-মুসলমান-সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতা, ঢাকার নবাব আসানুল্লা বাবুরাম মহারাজের প্রেম-পবিত্রতাময় জীবনে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; এবং স্বয়ং অভিনন্দিত করিয়া ধর্ম্মগুরুর প্রতি প্রযোজ্য সম্মাননার চূড়ান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহারা নিজেদের মুসলমান পীরের প্রতিও কখনও প্রদর্শন করেন নাই। এই মিলনের পরে যখনই ঢাকা মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারী কার্য্যোপলক্ষে নবাবের ভবনে উপস্থিত হইতেন, তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এমন কি, নবাব-পরিবারের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলমহিলারা পর্য্যন্ত বহির্ভ্রমণছলে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঢাকা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং বাবুরাম মহারাজের পদতলে ভক্তিভরে প্রণত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার উপদেশামৃত পান করতঃ তৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৯০১ খৃঃ হইতে প্রায় দশ বৎসর কাল মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভক্তসেবা, এবং সমাগত সাধু ভক্তদের জীবন গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্ম্মজীবনে কত হাঙ্গামা সর্ব্বদা পোয়াইতে হয়; বিভিন্ন সংস্কারবিশিষ্ট বহুলোকের একত্র সমাবেশে কর্ম্মক্ষেত্র বিসম্বাদ-পূর্ণ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যিনি কর্ত্তা হইবেন,

তাঁহাকে ধৈর্য্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে কিরূপ উচ্চ আধার হইতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মঠের কার্য্যাবলী পরিচালন বিষয়ে তিনি কিরূপ ভাবে নিত্য অগ্রসর হইতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ কেদার বাবাকে (শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ) একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, ধ্যান জপ করে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌তে নাব্‌তে ঠাকুরের এই মন্ত্রটি বার বার আবৃত্তি করি 'শ, ষ, স ; যে সয় সে রয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।' ঐরূপ আবৃত্তি করতে করতে ঐ ভাবের উপর চিত্তবৃত্তি-স্থির হলে তবে মঠের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে যাই।" কেদার বাবা বলেন, "বাস্তবিক এরূপ নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নাই। মঠে নূতন এসেছে, এমন কত ছেলে তাঁর আদেশ পালন না করে বরং উল্টো তাঁকে উপদেশ দিয়েছে; তিনি এতে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তার কথার মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাক্‌লে সেইটুকুই গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন।" "সখি, যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি",—এই কথাটি তিনি যেমন সর্ব্বদা বলিতেন, তেমনি সর্ব্বান্তঃকরণে নিজেও উহার অনুষ্ঠান করিতেন।

অসংখ্য সাধুভক্তের জীবন গঠন করিয়া ভগবদনুরাগী করিয়া দিলেও এই শক্তিশালী মহাপুরুষ নিজে একটিও মন্ত্রশিষ্য করিয়া যান নাই। শোনা যায়, স্বামিজী নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্, চেলা করিস্ না, চেলা করলে শেষকালে তোর চেলাতে আর রাখালের চেলাতে লাঠালাঠি করবে।" স্বামিজীর এই আদেশ তিনি আজীবন পালন করিয়াছিলেন। মন্ত্র নেওয়ার জন্য অসংখ্য ভক্ত বার বার তাঁহাকে জেদ্ করিয়া ধরিয়া বসিলে, শেষে না পারিয়া একবার ভাবিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লইয়া দীক্ষা দিতে আরম্ভ করি।' কিন্তু তাহা হইলে যে স্বামিজীর আদেশ রক্ষা করা হইবে না; তাই শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কেহ তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়া ধরিয়া বসিলে অনেক করিয়া বুঝাইয়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। একবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, জনৈক ভক্তকে দীক্ষা দেবার জন্য

মহারাজের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু দীক্ষা না দিলে কি হইবে, মঠের নূতন সাধু ভক্তেরা সকলেই যেন তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন। কেহ তাহাদিগকে কিছু বলিলে, তাঁহার বুকে লাগিত। মহারাজ কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিলে, পাছে তাহার অকল্যাণ হয়, এই ভাবিয়া তাহাকে মহারাজের কাছে টানিয়া লইয়া যাইতেন, এবং কাতর হইয়া বলিতেন, "মহারাজ, এ ভাল ছেলে, এর উপর রাগ কর্‌বেন না; আপনার হাত এর মাথায় একবার বুলাইয়া দিলেই যা একটু দোষ আছে, সেরে যাবে।" এই বলিয়া জোর করিয়া মহারাজের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইয়া লইতেন।

গুরুভ্রাতাদের উপর কি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসাই না তাঁহার ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ, পূজনীয় হরিমহারাজ প্রভৃতি মঠে আসিলে নূতন ছেলেদিগকে তাঁহাদের সেবা ও সঙ্গ করিয়া ধন্য হইতে উপদেশ দিতেন; এবং তদ্বিষয়ে কাহারও ভয় কিংবা অন্যবিধ বাধা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সযত্নে তাহা দূর করিয়া দিতেন। বলিতেন, "ভগবানের সঙ্গ করে করে এঁরা ভগবান্ হয়ে গেছেন; এঁরা সামান্য নন। এঁদের সেবা ও সঙ্গ করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবি।" শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সমাপন করিয়া বাবুরাম মহারাজ বারান্দায় নামিয়া আসিয়া পাইচারী করিতেছেন; এমন সময় পূজনীয় শরৎ মহারাজ মঠে গঙ্গাস্নান করিয়া ভিজা গামছা পরিহিত অবস্থায় আসিতে আসিতে বাবুরাম মহারাজকে দেখিতে পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; বাবুরাম মহারাজ 'আরে কর কি শরৎ' বলিয়া নিজেও ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রতি-নমস্কার করিলেন। বাবুরাম মহারাজ মাছ মাংস খাইতে ভালবাসিতেন না; শরৎ মহারাজ খাইতেন। সেইজন্য শরৎ মহারাজ মঠে আসিলেই তাঁহার জন্য মৎস্যাদির বন্দোবস্ত করিতেন। খাইতে বসিয়াই, শরৎ মহারাজ আগে নিজের পাত হইতে মাছের মুড়াটি উঠাইয়া লইয়া বাবুরাম মহারাজের পাতে ফেলিয়া দিতেন। বাবুরাম মহারাজ, "আরে কর কি, কর কি, অত খেতে পারি?"—এই বলিয়া

ভ্রাতৃস্নেহের মর্য্যাদা রক্ষার্থ এক আধটু মাত্র গ্রহণ করিয়াই অবশিষ্টাংশ ছেলেদের পাতে তুলিয়া দিতেন। একবার মঠে বাঁকুড়া অঞ্চলে রিলিফ্ কার্য্য হইতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাগত জনৈক সাধুকে শরৎ মহারাজ পুনরায় রিলিফ্ কার্য্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। সেই সাধুটি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া, শরৎ মহারাজ হাতযোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এসব ঠাকুরের কাজ, তোমরা না করলে আর কে করবে!" শরৎ মহারাজকে হাতযোড় করিতে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই উঠিয়া গিয়া সেই সাধুটিকে গালাগাল করিতে লাগিলেন এবং শরৎ মহারাজকে বলিলেন, "শরৎ, তুমি কি একটা কেউ কেটা লোক যে এদের কাছে হাতযোড় করবে? আমায় পাঠাও, আমি যাব।"

শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্ত্তিস্বরূপা মাতৃজাতির প্রতি কি অপূর্ব্ব সম্মান প্রদর্শন করিতেই-না তাঁহাকে দেখা গিয়াছে! স্ত্রীভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতেন; এবং তাঁহাদের বসিবার সুবন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত তিনি নিজে কখনও বসিতেন না। ঢাকা মঠে অবস্থান কালে, স্ত্রীভক্তেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিতে পাইলে তিনি গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে অনেকটা রাস্তা অতিক্রম করিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইতেন। 'বলরাম মন্দিরে' অসুখের সময় অবস্থান কালে একদিন জনৈক ভক্তের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। "বাবুরাম কেমন আছ?"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিতেছেন; বাবুরাম মহারাজ শরীরের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং একখানি মোটা কম্বল দিয়া সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া দিতে সেবককে বলিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলে সেবক তাঁহাকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "স্ত্রীলোকের সাম্‌নে খালি গায়ে থাক্‌তে নেই।" একবার অসুখের সময় বাগ্‌বাজারে শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে অবস্থান

করিতেছেন। একদিন অসুখের যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, "আর কেন, এবার গেলে হয়।" পূজনীয়া যোগীন মা সেই কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "অমন কথা বল্‌তে নেই। তোমরা দেহ মন প্রাণ সর্ব্বস্ব ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছ; নিজের বল্‌তে কিছু রাখনি। তবে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কি করে নিজের বলে প্রকাশ করছ?" বাবুরাম মহারাজ হাতযোড় করিয়া সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "হাঁ মা, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে। আর কখনও এমন কথা মুখে আন্‌ব না।"

সর্ব্বভাব-ঘন-মূর্ত্তি ঠাকুরের উদার সর্ব্বগ্রাসী সমন্বয়ভাব প্রচারেই জগতের যথার্থ কল্যাণ, এবং জন্মোৎসবাদি উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান ও ভক্তদিগকে লইয়া আনন্দ করা, ঐ ভাব প্রচারের অন্যতম অভিনব পন্থা,—বুঝিতে পারিয়া, তিনি মঠে ও মঠের বাহিরে উৎসবাদি সম্পন্ন করিতে নিজ দেহ বিস্মৃত হইয়া মগ্ন হইতেন। ঐ উৎসব উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ববাংলা পবিত্র করিতে একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। শেষবার ঐরূপ উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য ময়মনসিংহ জেলায় ঘারিন্দা গ্রামে গমন করেন। সেই সময় হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে অভিনব ভাবে মত্ত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও অনেকের অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এইখানেই তিনি জনৈক অজ্ঞ মুসলমানের পরীক্ষামূলক জেদ রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে তাহাকে কোল দিয়াছিলেন, এবং পরে তাহার হস্তে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে যে তাঁহাকে কি ভক্তির চক্ষেই দেখিত, কতদূর আপন জ্ঞান করিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। ঐখানে একদিন, সমাজ যাহাদিগকে নিম্নজাতীয় বলিয়া অবজ্ঞা করে, ঐ শ্রেণীর জনৈক স্ত্রীলোক নিজ বাড়ীর আম গাছ হইতে একটি ছোট পাকা আম মাটিতে পড়িয়াছে দেখিয়া কুড়াইয়া লন; এবং উহা হাতে করিয়া বাবুরাম মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "এটি আমার গাছের নূতন ফল, আপনার জন্য এনেছি।" সভক্তি স্নেহে স্ত্রীভক্তটি এমনই আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, একটি ছোট আম যে কত তুচ্ছ জিনিষ,

তাহা ভাবিবারও অবসর পান নাই। আর একদিন বিকাল বেলা রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনৈক গরীব গৃহস্থের বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। লোকটি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "আমার মত লোকের বাড়ীর কাছে ইঁহারও আগমন সম্ভব!"—এই ভাবিয়া ব্যগ্রভরে ছুটিয়া আসে; এবং যখন এতই নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন যাহাতে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া উহা পবিত্র করিয়া দেন, তাহার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে বাবুরাম মহারাজ যখন তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সে যে কি করিবে, কোথায় তাঁহাকে বসাইবে, খুঁজিয়া পাইল না। গরীব লোকের বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং মৃত্তিকা-প্রলেপে তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে দেখিয়া আনন্দ সহকারে মহারাজ মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন; এবং এক টুক্রা সুপারি চাহিয়া লইয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন। গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার কি করুণাই না চিরকাল দেখা যাইত!

খারিন্দার উৎসব সম্পন্ন করিয়া বাবুরাম মহারাজ নেত্রকোণায় অন্য উৎসবে যোগদান করিতে আগমন করেন। সেই উৎসবও সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এবার ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; সঙ্গে পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী ধীরানন্দ) এবং আরও জনকয়েক সাধু। কৃষ্ণলাল মহারাজের জন্য পাল্কী এবং অন্যান্য সাধুদের জন্য গাড়ী আসিয়া পড়ায় তাঁহারা প্রথমেই রওয়ানা হইলেন। বাবুরাম মহারাজের জন্য পাল্কী আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। রাস্তায় একটি বাংলোতে পৌঁছিয়া রান্না বাড়া করিয়া খাওয়ার কথা। সাধুরা বাংলোতে পৌঁছিয়া বাবুরাম মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পরে মহারাজের পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ পাল্কী হইতে কতকগুলি কচি জামরুল ও লিচু বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন; খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত কতকগুলি কচি ফল মহারাজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া সকলে যারপর নাই বিস্মিত

হইলেন। বাবুরাম মহারাজ বালকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ, এগুলি ভক্তেরা দিয়েছে!" "এমন জিনিষও ভক্ত দেয়!"—এই কথা সকলেরই মনে উঠিতে লাগিল। তখন বাবুরাম মহারাজের কথায় জানা গেল,—বিলম্বে পাল্কী আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি নেত্রকোণা হইতে যাত্রা করেন। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিতেই পাড়াগাঁয়ের কয়েকটি লোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে তাঁহার গতিরোধ করে; এবং যখন তাহাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তখন যাহাতে তাহাদের গ্রামের অন্যান্য সকলকেও সেইরূপ করেন, তদ্বিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। মহারাজের পাল্কী থামিলে তাহারা দৌড়াইয়া গ্রামে ছুটিয়া যায়, এবং স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলকে ডাকিয়া আনে। তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে গ্রামবাসীরা এতই বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, কি দিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া—গরীব তাহারা—নিজেদের গাছে যে অপরিপক্ক জামরুল ও লিচু ছিল, তাহাই দিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছে! এই উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাবুরাম মহারাজ যখন 'বলরাম-মন্দিরে' রোগশয্যায় শায়িত তখন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' লেখক পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় তাঁহার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া পূর্ব্ববঙ্গের এই সমস্ত উৎসবকাহিনী শ্রবণ করিতেন। সেবকেরা বলিয়া যাইতেন, কোথাও ভুল হইলে বা বাদ পড়িলে বাবুরাম মহারাজ সংশোধন অথবা সংযোগ করিয়া দিতেন। পরমাত্মীয় জ্ঞানে গরীব গ্রামবাসীদের ঐরূপ উপহার প্রদানের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় যান, তখন ব্রজের গোপীরা যেমন বিহ্বল হয়ে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব দানেও তৃপ্ত হতে না পেরে, যে যা পেয়েছিল, তাই উপহার দিয়ে তাঁর তৃপ্তি সাধন কর-বার চেষ্টা করেছিল,—এও যেন ঠিক তেমনি।"

পূজ্যপাদ শশী মহারাজ (শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অন্তিম অসুখের সময় কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আছেন; দুই তিন জন সেবা করিতেছেন। বাবুরাম মহারাজ মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া

যাইতেন। একদিন সকালবেলা আসিয়া আলাপাদি করিয়া, কি কি করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সেবকদিগকে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার কোন কথায় শশী মহারাজ কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহা কি বাবুরাম মহারাজ, কি সেবকেরা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। বাবুরাম মহারাজ ত চলিয়া গেলেন, কিন্তু শশী মহারাজ গম্ভীর হইয়া শুইয়া রহিলেন। কোন কথা বলেন না, আহারাদিও করেন না। একে ক্ষয়রোগ, তাহাতে আবার অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে,—সেবকেরা প্রমাদ গণিলেন। শশী মহারাজ নিরাশ্রয় বালকের মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে সেবকদের পীড়াপীড়িতে বলিলেন, "যা, বাবুরাম মহারাজকে ডেকে আন্।" তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজকে ডাকিয়া আনিতে 'বলরাম-মন্দিরে' সেবক ছুটিয়া গেলেন। বাবুরাম মহারাজ ব্যস্ত হইয়া আবার আসিলে শশী মহারাজ তাঁহার চরণোপরি মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "কি হয়েছে ভাই, বল না।"—বার বার জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর দিলেন, "আমার ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, আমার মুখে লাথী মার।" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আর কেউ যদি বল্‌তেন যে, তাঁর ঠাকুরে অবিশ্বাস হয়েছে, সে কথা বরং কতকটা মেনে নিতে পারতুম। কিন্তু শশীর ঠাকুরে অবিশ্বাস, এযে কল্পনাতীত।" উত্তর শুনিয়া শশী মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বাবুরাম মহারাজ! ছেলেদের ফাঁকি দিতে পার, তাদের চক্ষে ধূলো দিতে পার, কিন্তু তুমি যে কি বস্তু, তা ঠাকুর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই তোমাকেই যখন কটু কথা বল্‌তে পারলাম, তখন আর ঠাকুরে অবিশ্বাসের বাকী রইল কি?" বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "কই, তুমি ত আমায় কোন কটু কথা বলনি। তথাপি বল্‌ছি, না বলা সত্ত্বেও যদি তোমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করছি। ভাই, তুমি খাও, শরীর যে একেবারে খারাপ হয়ে পড়বে।" তথাপি শশী মহারাজ ছাড়েন না। "যদি সত্য সত্যই ক্ষমা করে থাক, তবে প্রসাদ

করে দাও।" ফলাদি আনীত হইলে বাবুরাম মহারাজ প্রত্যেকটির অর্দ্ধেক নিজে খাইয়া এক একটি করিয়া শশী মহারাজকে দিতে লাগিলেন, এবং শশী মহারাজ সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেন। এই বাস্তব চিত্রের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা সেবক বলেন, "বাবুরাম মহারাজের এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আর কখনো দেখিনি। গৌরবর্ণ উজ্জ্বল হয়ে তপ্ত কাঞ্চনের রং ফুটে বেরুচ্ছিল,—তিনি যেন পূর্ব্ব মানুষটিই নন, যেন কোন এক দেবতা আমাদের চোখের সম্মুখে অবস্থান করছিলেন!"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কথোপকথন

স্থান—শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম—কাশী, ১৪ই জুলাই, ১৯২০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ আজ এই বলে কথা আরম্ভ করলেন—

একবার স্বামিজী কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"তোমরা যেখানে যাবে সেখানেই একটা কেন্দ্র গড়ে উঠবে"—তাতো দেখতেই পাচ্ছ। তখন আমার মিসেস্ হুইলারের চিঠির কথা মনে পড়ল। আমি লণ্ডনে থাকতে মিসেস্ হুইলার আমাকে তাঁর ওখানে গিয়ে থাকবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আমি স্বামিজীকে সেকথা বলাতে স্বামিজী বললেন, "বেশ তো, ভাল কথা।" তারপর দিনকতক মিসেস্ হুইলারের বাড়ীতে ক্লাস ট্লাস হল। আমি তাদের বলতুম, "এই যে বেদান্ত পড়ছ, এ শুধু পড়লে হয় না, এর জন্য সাধন চাই, তার উপযুক্ত স্থান চাই।" বেশ নির্জ্জন নিভৃত জায়গাও পাওয়া গেল। বোঝ না—ঠাকুর আগে থাকতেই সব গড়ে তুলছেন! একটি মেয়ে আড়াইশো একার জমি দিতে চাইলে। আমি বললুম, "আমি কি করে নি?"—কে সেকথা জানালুম। সে তখন বক্তৃতা দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত।

—বল্লে, "দাঁড়াও আমি আসছি।" এসে বল্লে, "আরে রাম! ওকি নিতে আছে?" আমি কিন্তু বল্লুম, "আমার মনে হচ্ছে এ ছাড়া উচিত নয়।" স্বামিজীকে 'তার' করা হল। স্বামিজী তখন কালিফোর্নিয়ায়। স্বামিজী ওখানে 'তারে' জবাব করলেন—"জমি নিয়ে নাও।" জানই তো, স্বামিজী কোন সুযোগ ছাড়তেন না। জমি বন্দোবস্ত হল। স্বামিজী আমাকে লিখে পাঠালেন, "তুমি এখানে এসো।" কিন্তু—আগে থাকতেই, "আমি ক্লাস করব" বলে, সাধারণকে জানিয়ে রেখেছিল, কাজেই আমার তখন যাওয়া হল না। স্বামিজী এলেন। তারপর স্বামিজীর সঙ্গে আমরা গেলাম। স্বামিজী মাঝ রাস্তায় চিকাগোর কাছে নেবে গেলেন—সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। যাওয়ার সময় 'নমো নমঃ' করলেন—সে কথা আজও আমার কাণে বাজছে।

* * * * *

সব Hypnotism (হিপ্‌নোটিজম্)—মায়ার খেলা। তুমি হিপ্‌নোটিজম্ করা দেখেছ? ডাঙ্গায় সাঁতার কাটতে বল্লে সাঁতার কাটে। মহামায়া আমাদের সব মায়ামুগ্ধ করে রেখেছেন। বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া—দুটোই হিপ্‌নোটিজম্, একটা দিয়ে অপরটা নাশ করতে হয়। বিদ্যা, অবিদ্যার বিরোধী কিনা। স্বামিজীর গল্প জান ত? এক মুসলমানের খাবার শেয়ালে খেয়েছিল। ওরা শেয়ালকে বড় অশুচি বলে মানে। মুসলমান মোল্লার কাছে গিয়ে ব্যবস্থা চাইলে। মোল্লা বল্লেন, "কুকুর হচ্ছে শেয়ালের শত্রু। কুকুর দিয়ে যদি খাবারটা আবার খাইয়ে নিতে পার, তবে সেটা শুদ্ধ হয়ে গেল।" (হাস্য) বিদ্যা দিয়ে অবিদ্যাকে নাশ করতে হয়।

ভক্ত। বিদ্যাকে নাশ করবার জন্য অপর কিছুর দরকার হয় কি?

স্বামী—। না। বিদ্যা, বস্তুতে পৌঁছে দিয়ে আপনিই নিরস্ত হন। ঠাকুরের সেই তিন চোরের গল্প মনে আছে তো?*

---

* একটি লোক বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে তাকে তিনজন ডাকাতে এসে ধরলে। তারা তার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে। একজন

১৫ই জুলাই, ১৯২০। সময়—অপরাহ্ণ ৩টা।

আজ কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন,—

উত্তরায়ণের কথা মহাভারতে আছে। ভীষ্ম উত্তরায়ণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এদ্বারা নির্দিষ্ট কালের কথা বোঝাচ্ছে না—ভীষ্মের যে ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি ছিল, তাই দেখাচ্ছেন। শাস্ত্র উত্তরায়ণের কথা বলে কালের কথা বুঝাচ্ছেন না—তৎকালাভিমানিনী দেবতা বুঝাচ্ছেন। এত বেশ বুঝা যায়। বড়লোকদের অভ্যর্থনা করবার জন্য লোকজন যায়, সেই রকম ভিন্ন ভিন্ন দেবতারা ব্রহ্মলোকগামী জীবাত্মাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

—বাবুর বাপের অসুখ। খবর পেয়ে বাপের কাছে পৌঁছাবার

চোর বল্লে—আর এ লোকটাকে রেখে কি হবে? এই কথা বলে খাঁড়া দিয়ে কাটতে এলো। তখন আর একজন চোর বল্লে—না হে কেটে কি হবে, একে হাত পা বেঁধে এখানে ফেলে যাও। তখন তাকে হাত পা বেঁধে ঐখানে রেখে চোরেরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বল্লে—আহা তোমার কি লেগেছে? এসো আমি তোমার বন্ধন খুলে দি। তার বন্ধন খুলে দিয়ে চোরটি বল্লে—আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো, তোমায় সদর রাস্তায় তুলে দিচ্ছি। অনেকক্ষণ পরে সদর রাস্তায় এসে বল্লে—এই রাস্তা ধরে যাও—ঐ তোমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। তখন লোকটি চোরকে বল্লে—মশায় আমার অনেক উপকার করলেন, এখন আপনিও আসুন, আমার বাড়ী পর্য্যন্ত যাবেন। চোর বল্লে—না, আমার ওখানে যাবার যো নেই, পুলিসে টের পাবে। সংসারই অরণ্য। এই বনে সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন গুণ ডাকাত। জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে নেয়। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়, রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে, কিন্তু সত্ত্বগুণ রজস্তমঃ থেকে বাঁচায়। সত্ত্বগুণের আশ্রয় পেলে কাম ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা হয়। সত্ত্বগুণ আবার জীবের সংসার বন্ধন মোচন করে। কিন্তু সত্ত্বগুণও চোর—তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না, কিন্তু সেই পরমধামে যাবার পথে তুলে দেয়; দিয়ে বলে ঐ দেখ—ঐ তোমার বাড়ী দেখা যায়। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান, সেখান থেকে সত্ত্বগুণও অনেক দূরে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথম ভাগ।

পূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন —এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তিনি আমাকে চিঠি দিলেন—তাঁর বাপ তাঁকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতেও পারেন। কিন্তু থপ্ করে মনে পড়ে গেল—কোন অভিমানিনী দেবতা হতে পারেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন।—বাবু ত মিথ্যা কিছু বলবেন না,—তেমন লোকই নন। আর গীতাতেও বলেছেন—

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥"

অর্থাৎ—দেহত্যাগ করে পরলোক গমন কালে, দেহে অবস্থিতির সময় অথবা গুণসমন্বিত হয়ে ভোগ করবার সময়, মোহগ্রস্ত লোকেরা কোন সময়েই জীবাত্মাকে দেখ্‌তে পান না, শুধু জ্ঞানচক্ষু ব্যক্তিগণ দেখ্‌তে পান। এসব কথা বুঝতে পারি। স্বামিজী বল্‌তেন, যে একটা ভূতযোনিও দেখেছে সেও বই পড়া পণ্ডিত থেকে অনেক বড়। ওর যে পরকালের সম্বন্ধে একটা ধারণা হবার সুবিধা হয়েছে।

১৬ই জুলাই, ১৯২০। শুক্রবার। সময়—অপরাহ্ণ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ বল্‌ছিলেন,—

আজ যখনই খাই তখনই বুঝলুম রুটী খাওয়া ভাল হবে না, কিন্তু খেতে খেতে খেয়ে ফেল্‌লুম। বোঝ একবার কাণ্ড—আমরা জানছি এ করা অন্যায় কিন্তু তাই করে ফেলছি! মহামায়ার এমনি মায়া! আবার খেতে খেতে ভালও লেগে যায়। একটা গল্প শোন নি?—ঐ যে "খেতে খেতে বেশ লাগছে।" চাকুরে ছেলে খেতে বসেছে—বুড়ো মা ভয়ে ভয়ে রেঁধে দিয়েছে। ছেলে বল্‌ছে— "ওমা, কী রেঁধেছ? অ্যাঃ ছিঃ ছিঃ—এ যে মুখে দেওয়া যায় না।" গিন্নী অমনি বের হয়ে বল্‌ছে—"তুমি কি বলছ? এ যে আমি রেঁধেছি।" "অ্যাঁ—তুমি রেঁধেছ?" কতক্ষণ পরে বলছে—"খেতে খেতে বেশ লাগছে।" (হাস্য)

কিছুতেই কিছু হয় না—তুমিও যেমন, কেবল আশায় আশায় লোক ঘুরে ঘুরে পাগল আর কি? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যৎকান্তাশাং পরিত্যজ্য সুখং সুষাপ পিঙ্গলা ॥"

অর্থাৎ—আশাই পরম দুঃখ ও আশা ত্যাগই পরম সুখ, পিঙ্গলা নামক বেশ্যা কান্ত-আশা ত্যাগ করে পরম সুখে ঘুমিয়েছিল।

জনকের রাজত্বে এক বেশ্যা থাকত। সে একদিন রেতের বেলা তার লোকের অপেক্ষায় ঘর বার করছে। রাত যখন দুটো বেজে গ্যালো তখনও কেউ এলো না দেখে সে আশা ছেড়ে দিলে। বলতে লাগল—"আমার মত হতভাগিনী সমস্ত রাজ্যের মধ্যেও কেউ নেই। হায়, আশায় আশায় কি কষ্টই না পেলাম। যাক্, আর না, এখন গিয়ে ঘুমোই।" এই বলে শুয়ে পড়ল। নিকটেই অবধূত ছিলেন। তিনি এসে বল্লেন—"তুমি সমস্ত আশা ত্যাগ করে সুখে নিদ্রিত হয়েছ—আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমার গুরু-স্থানীয়া।" এই বলে চলে গেলেন। মধুসূদন 'আশা'র সম্বন্ধে লিখেছেন, বেশ চমৎকার—

"আশার-ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
　　তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
　　ফিরাবো কেমনে ॥
দিন দিন আয়ু হীন, ক্ষীণ বল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায় ॥
রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি
　　জাগিবিরে কবে।
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি
　　কত কাল রবে ॥"

কাগজে দেখলুম মেষ্টন সাহেব বড় গোলে পড়ে গেছে। সে বলছে, হিন্দু-সমাজের উপর দিয়ে এত বড় ঝঞ্ঝা গেল, তার মধ্যেও কি করে সব নিজের ভেতর মিশিয়ে নিয়ে নিজত্ব বজায় রাখলে।

এত জীবনী শক্তি কোত্থেকে এল? মুসলমানরা তরবারির বলে প্রচার করেছে, তবুও কিছু করতে পারলে না।

আমাদের ব্রহ্মকে নিয়ে সম্বন্ধ। আমাদের জীবনী শক্তি থাকবে না? বলছে—হিন্দুরা গণতন্ত্র শাসনও নিজেদের অঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নেবে। ওরা ভেবেছিল ওতে বুঝি হিন্দু-সমাজ অনেকটা শিথিল হয়ে যাবে। তাকি হবার জো আছে?

ভক্ত। ওরা বলছে—যদিও আমরা খাতাপত্রে খৃষ্টান করতে পার্চ্ছিনা, কিন্তু ওদের ভিতরে খৃষ্টানভাব ঢুকিয়ে দিয়েছি।

স্বামী।—ওদের জাতীয় ভাবটা এত প্রবল হয়ে যাচ্ছে যে, কবে এসিয়াবাসী বলে যীশুখ্রীষ্টকেও বাতিল করে দেবে! ওদের এখন দার্শনিক ধারণা দাঁড়িয়েছে—কিসে কাইজারের মত Superman (অতি-মানুষ) উৎপন্ন হতে পারে। এই Supermanএর চোটে কি হল দেখলে ত!

—বাবুর পত্র পেয়েছি। আমার কাছে পত্র দেন তাঁর ছেলে মারা যাবার পরে। গীতায় যে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলেছিলেন, "যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়ানাং" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের শোষনকারী শোক—এটা তাঁর পত্র পড়ে বেশ মনে হচ্ছিল। আজকাল তন্ত্র পড়ছেন। উপনিষৎ যা তত্ত্বাকারে বলেছে তন্ত্রে সেটা ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছে। তন্ত্র অনেক অনেক অংশে উপনিষদেরও উপরে চলে যায়। তন্ত্রে ঐ উপাসনা। ভারি চমৎকার। শক্তি মানে নি এমন কি কেউ আছে? ঠাকুর বলতেন—অবতারাদি পর্য্যন্ত শক্তির উপাসনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন, তারপরে ধর্ম্মপ্রচার করেন।

শংকরও খুব শক্তি মানতেন। শক্তির কত স্তবস্তুতি লিখে গেছেন। এক গল্প আছে—জান না? একবার শংকর গঙ্গায় স্নান করে আসছিলেন। তিনি তখন বড় একটা শক্তি মানতেন না। শক্তি ত এক বুড়ীর বেশে তাঁর পথের উপর পড়ে রইলেন। শংকর আসতে নিজের দুঃখ জানালেন। শংকর তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র তাঁর সব শক্তি চলে গেল। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে ঐ শক্তি।

তখন স্তব করতে লাগলেন। ঐ হচ্ছে আনন্দলহরীর উৎপত্তি। স্তবে শক্তিকে সন্তুষ্ট করে শক্তি ফিরে পেলেন।

মহিম্ন-স্তোত্র সকল স্তোত্রের শ্রেষ্ঠ। আমি কনখল থাকতে নিত্য পড়তুম। আনন্দগিরির টীকাও তখন পড়েছিলুম। পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব ছিল। শিব-নির্ম্মাল্য মাড়িয়ে সে যখন বন্দী হয়ে পড়ল তখন মহিম্ন-স্তোত্র পাঠ করে খেচরত্ব আবার ফিরে পেল। ভারি চমৎকার স্তব।

১৯ জুলাই, ১৯২০।

একজন এসে বল্‌লেন—চামেলী পুরী দেহরক্ষা করেছেন।

স্বামী। কখন?

ভক্ত। কাল বিকেলে।

স্বামী। আর কোন খবর কেউ জান না? বয়সও কম হয়নি, ১০৮ বৎসর হয়েছিল। ঐ বাগানেই ৬০ বৎসর বাস করেছিলেন। কি তেজই তাঁর ছিল! লেঙ্গটবন্ধ্ ছিলেন কিনা। আমি একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম; শুনলুম বলছেন—'শিউ কেদার' 'শিউ কেদার'। কি জোরের ডাক! ওঁদের মৃত্যু যেমন পাকা ফল গাছ থেকে সহজে ধপ্ করে পড়ে যায়, সেই রকম। কষ্ট হয় না। আমার যে ৫৮ বৎসর বয়স হল, জগৎটাকে কত যেন পুরাণো পুরাণো ঠেকছে—মনে হয় যেন কত পুরাণো। আর ওঁর দেখ ১০৮—প্রায় ডবল বয়স—জগৎটা কত পুরাতনই না তাঁর মনে হোত! কাশীর কত পুরাতন তত্ত্বই-না জানতেন।—বাবু প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ তাঁর সেবা করছিলেন। আমাকে —বাবু বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে যান—তখন তিনি বল্‌লেন, "আজ সারে দিন ভূখা হুঁ—মা নে তুম্‌হারে সাথ ক্যা ভেজা হৈ দো খাউঙ্গা।" তারপর থেকেই তিনি ওঁর আহার জুটিয়ে আসছেন। —বাবুর সহকারী —পণ্ডিতও ওঁর ওখানে যেতেন। পণ্ডিতের নাকটা খুব লম্বা। লম্বা নাক কিসের লক্ষণ বলতে পার? নেপোলিয়ানের জীবন-চরিতে পড়নি? নেপোলিয়ান বলছেন, "যদি লম্বা নাকওয়ালা

গোটাকতক মানুষ পেতুম তাহলে আমি সব করতে পারতুম।” লম্বা নাক খুব অনুগত বিশ্বাসী লোকের চিহ্ন।

এখানে অসিঘাটের কাছে মগ্নী বাবা বলে আর একজন সাধু আছেন। তাঁর বয়সও খুব হয়েছে। অনেক কাল কাশী আছেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। বেশ পণ্ডিত লোক, তবে কি-না পুরানো ধাঁজের। তাঁর বিদ্বৎসন্ন্যাস হয়েছে—রক্তের তেজ খুব। খুব শক্ত শক্ত ব্যামো হয়, কিন্তু সেরে ওঠেন। একবার খুব অসুখ করায় ব্রহ্মচারীর সব ক্রিয়া কলাপ করার অসুবিধা হয়ে পড়ে। তখন গঙ্গা-তীরে গিয়ে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজে নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমি কয়েকবার ওঁকে দেখেছি। সর্ব্বদাই ভাবে মগ্ন থাকতেন। সম্ভবতঃ তারই জন্য ওঁর নাম হয়েছে মগ্নীবাবা। পুরানো ধাঁজের গুণও আছে, দোষও অনেক। আগে—বাবু ওঁকে গুরুবুদ্ধি করেন, গুরুপূর্ণিমায় পূজো করতে গিছলেন। দীক্ষা প্রভৃতি ওঁকে কিছু দেন নিই।

আজ হীরানন্দের জীবনী পড়ছিলুম—চমৎকার লাগল। সেও ঠাকুরের শিষ্য ছিল কি-না, ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। ঠাকুরের অসুখের সময় সিন্ধু দেশ থেকে হীরানন্দ এসেছিল—মেঠাই আর ঠাকুরের জন্য ঢিলে পাজামা নিয়ে এসেছিল। ঠাকুর একদিন পরেছিলেন। একবার স্বামিজীর সঙ্গে ওকে তর্কে লাগিয়েছিলেন। স্বামিজী জ্ঞানের দিক দিয়ে বল্‌লেন—হীরানন্দও বেশ বল্‌ল ভক্তির দিক দিয়ে। তর্ক করলে না। হীরানন্দ কেশববাবুরও শিষ্য ছিল।

সামনের মাঠে পাখীরা খাবারের খোঁজে বেড়াচ্ছিল দেখে, মহারাজ বল্‌লেন—এখন বাচ্চা হয়েছে কি-না তাই খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি কাণ্ড দেখ না! নিজে না খেয়ে বাচ্চার জন্য নিয়ে যাবে। আবার বাচ্চা একটু বড় হলে অমনি তাকে ঠুক্‌রে বের করে দেবে। মহামায়ার কাজ করে যাচ্ছে। দেখ, কি করে তাঁর কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।

“তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।”

ওদের হচ্ছে ভোগের শরীর। ওদের ক্রিয়মান কিছু নেই। এ

শরীর শেষ হয়ে গেলে আবার সঞ্চিত থেকে কিছু নিয়ে এসে ভোগ-শরীর ধারণ করবে। ওদের ভালমন্দ বোধ নেই কি-না, তাই পাপপুণ্য ওদের নেই। বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যন্ত ওদের বেশ আছে। মানুষেরই কেবল ক্রিয়মান আছে, তার একটা ভাল মন্দ বোধ আছে কি-না। তারই বন্ধনের বোধটা আছে, অন্য জীবের তা নেই। বন্ধনের বোধ হলেই তার ঠিক ঠিক মুক্তির চেষ্টা হতে পারে। দেখ না, জেলে পুরে রাখলে একটা লোক মুক্তি পাবার জন্য কত চেষ্টা করে। জগৎটা একটা বন্ধনের কারণ এই বোধ হলেই ত মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে। এ বুঝতে না পেরেই ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে থাকে।

ঠাকুর হোমা পাখীর গল্প বলতেন—জান ত? যেই চোখ ফুটে জ্ঞান হল, দেখলে মাটীতে পড়ছে, অমনি চোঁচা উপরের দিকে দৌড়। এ হলেই রক্ষে। অনেক লোকও পাওয়া যায় যারা চৈতন্য হওয়া মাত্রই উপরের দিকে চল্‌ল।

ঠাকুর বলতেন, "বুড়ী খেলতে ভালবাসে।" আমি বলেছিলাম, "খেলতে ভালবাসেন, তাতে কি? আমি কেন খেলি?" অমনি ধমক দিয়ে বল্‌লেন, "সে কিরে—কি বলছিস্ তুই? ভারি স্বার্থপর কথা বলছিস্ যে। খেলেই ত সুখ। যে কেবল বুড়ীর কাছে ঘোরে তাকে বুড়ী ভালবাসে না। যে অনেক দান খেলে তাকে ছুঁতে আসে, তার জন্য যে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশা খেলায় দেখিস্‌নি, পাকা খেলোয়াড় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে, আবার যেই চায় অমনি দান ফেলছে—'কচে বার'—আবার উঠে গেল।"

আমি বলেছিলাম, "এমন কি হয় মশাই?" তিনি বল্‌লেন, "হবে না কেন? হয় রে, অমন হয়। লোকে ঈশ্বর মানবে না! যে মানুষ গলায় কাঁটা ফুটলে বেড়ালের পা ধরে, খেজুর গাছকে প্রণাম করে—সে ঈশ্বর বিশ্বাস করবে না! বলিস্ কিরে? 'জ্ঞান' 'জ্ঞান' যে করিস্ এমন ঘুমটি দিয়ে রেখেছেন যে, সে সময়ে কুকুরে মুখে মুতে দিলেও অজ্ঞান যায় না।"

কি চমৎকার বলতেন। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

বিগত শতাব্দীর ধর্মের ক্রমবিকাশ

'উন্নতি'র অর্থ- 'অগ্রসর হওয়া।' ইহা কিন্তু ঐতিহাসিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কেন না, ধর্ম্মের যখন গ্লানি হয়, তখন সংস্কারকেরা ইহার মূল নীতি সমূহকে উহাদের পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন মাত্র। খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্ম যথাক্রমে যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীবুদ্ধ ও মহম্মদের জীবনী ও উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী কোন সংস্কারকই তাঁহাদের উপদেশ সমূহকে অতিক্রম করেন নাই। যখন ধর্ম্মের অবনতি হয় এবং সংস্কারকেরা উহার পুনরুদ্ধার করেন, তখন ইহাকে এক প্রকার উন্নতি বলা যাইতে পারে। হিন্দুগণের সনাতন ধর্ম্মে এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্ম কোন ব্যক্তির দ্বারা বা কোন গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ঋষি বা দ্রষ্টাগণের হৃদয়কন্দরে যে সকল শাশ্বত নিয়ম বিকশিত হইয়াছিল, ইহা তদুপরি প্রতিষ্ঠিত। সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টিলব্ধ এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল সনাতন নিয়ম সমূহের প্রকৃত অর্থ মধ্যে মধ্যে বিকৃত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশংকরাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি অবতারগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উহাদের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্ম এইরূপ তমসাচ্ছন্ন সময়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই সময়টাই আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম তমোময় বলিয়া বোধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ পরিদৃষ্ট হইল; ইহারাই ভাবী প্রবল তরঙ্গের অগ্রদূত। কোন গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে উহার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকটিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য দুইটি বিষয় কার্য্য করিয়াছিল। প্রথম বিষয়টি এই যে, ইহার অবনতির সময় যে

জীবনীশক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল উহার পুনঃ জাগরণ। আর দ্বিতীয় কল্যাণকর বিষয়টি এই—গ্রেটব্রিটনের সহিত ভারতের সংযোগ। ইহা সঞ্জীবনী ক্রিয়া পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

গবেষণা, সমালোচনা, স্বাধীন চিন্তা, কার্য্য ও ভাব এবং প্রাচীন মতের প্রতি অশ্রদ্ধা—এই সকল উনবিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য। লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, সত্য এমন কোন কিছু জিনিষ নহে যে উহা প্রাচীনগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যাইতে পারে; পরন্তু উহা স্বাধীন ও মৌলিক গবেষণা-লভ্য। এই সময় সর্ব্বত্রই এক ভীষণ আক্রমণকারী ভাবের উদ্রেক পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ অধিকারের অব্যবহিত পরেই যে সকল খ্রীষ্টান মিশনারী শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দুগণের ধর্ম্মভাব ও সনাতন প্রথা সমূহকে আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিবার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। নূতন ধর্ম্ম ও নূতন সভ্যতার প্রচারকরূপে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের মনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ জাতীয় বিজয়ের গতি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। ডিরোজিওর মত স্বাধীন চিন্তাশীলগণের নেতৃত্বে বাঙ্গালী যুবকের দল হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করিল এবং হিন্দুদিগের সামাজিক প্রথা সকল অশ্রদ্ধা করিতে আনন্দ বোধ করিতে লাগিল। শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশ সমূহ ছিন্ন ও পরিত্যক্ত কাগজ স্তূপের মধ্যে স্থান পাইল। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও বিদেশী সমাজের প্রতি আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল। তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে এরূপ ঘটনা সংঘটিত না হইয়াই পারে না। ঐ সময়ের ধর্ম্মেতিহাস হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর ঘৃণ্য দ্বেষ-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। পবিত্রপ্রেমের বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং মাতৃপূজার তান্ত্রিক ধর্ম্ম ব্যভিচার ও অ-পবিত্রতায় পর্য্যবসিত হইল। সামাজিক জঘন্য আচার সমূহ সর্ব্বত্রই লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইতে লাগিল। সেইজন্যই খ্রীষ্টান মিশনারীরা তাঁহাদের সম্মুখে যাহা কিছু পাইলেন তাহাই বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

তৎকালীন প্রধান স স্কারক ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। তিনি ঐ সময়ের কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কি শিক্ষা সম্বন্ধীয়—প্রায় সব্ব বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দিলেন। তিনি বেদান্তদর্শনের এরূপ বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তদ্দ্বারা সকলেই হিন্দু ঋষিগণের বিজ্ঞতার পরিচয় পাইল। তাহাতেই খ্রীষ্টান মিশনারীগণের অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে আনয়ন করা কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। ঐ সকল বিদ্বেষভাবাপন্ন বিভিন্ন শাখার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনেব নিমিত্ত তিনি বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বের সাহায্য লইয়াছিলেন। বেদান্ত-ব্যাখ্যায় তিনি সাধারণতঃ শংকরকেই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু সন্ন্যাসধর্ম্মকে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নৈতিক ধর্ম্মের দিক হইতে তিনি বাইবেলকে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষাও উচ্চস্থান দিতেন। উচ্চ ধর্ম্মাদর্শের সহিত প্রতিমা পূজার সামঞ্জস্য বিধান করা যায়না মনে করিয়া তিনি উহার নিন্দা করিতেন। রাজা বেদান্তের অদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করিতেন। তাঁহার সময়ের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্মে'র উপর মুসলমানদিগের একেশ্বরবাদ ও খ্রীষ্টানদিগের নৈতিক ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধে রাজার ধারণা অতি অল্পই ছিল; পুরাণ সমূহে ভক্তিতত্ত্বের চরম বিকাশ কিরূপ হইয়াছিল—তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য তিনি প্রভূত আগ্রহ ও স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সম্মিলনে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সার্ রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে হিন্দুদিগের গোঁড়ামী রাজা রামমোহন রায়ের উদার নীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর খ্রীষ্টান মিশনারীগণ অধিকতর উদ্যমের সহিত কাজে নামিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের কার্য্যভার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর পতিত হইল। তিনি দার্শনিক অপেক্ষা কবি ও ভক্ত বলিয়াই অধিকতর পরি-

চিত্ত। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার মত রামমোহন অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ছিল। তিনি নূতন মতকে কতক অংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহাকে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই নামে অভিহিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজার অদ্বৈতবাদকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দ্বৈতবাদে পরিণত করিয়াছিলেন। উপনিষদ সমূহ মহর্ষির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু বাইবেলের প্রতি তাঁহার সেরূপ অনুরাগ ছিল না। শেষ জীবনে তিনি বেদের অভ্রান্তত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচার ও অনুভূতির উপর অধিকতর জোর দিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মভাব বিস্তারের সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্র হইয়া উঠে। তিনি অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিকতর উদ্যমী একদলের নেতা হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহকারী ছিলেন। রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্মকে রাজা এবং মহর্ষি অপেক্ষাও ব্রহ্মানন্দ অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎকার কেশবের জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সেই সময় হইতে কেশবের ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। পরে আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থাংশের ব্রাহ্মধর্ম্মান্দোলনের দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম গতিশীল ও উদার হয় এবং ইহার গোঁড়ামিও অনেকাংশে চলিয়া যায়। একথা সত্য যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু ইহার কার্য্যাবলী সমূহ দেশের অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃত হইয়া প্রত্যেক স্থানেই ধর্ম্মের উচ্চ ও উদারভাব ধারণা করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

যেমন প্রোটেষ্টাণ্টগণের উদ্ভব সময়ে ক্যাথলিকগণ ইঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেইরূপ রক্ষণশীল হিন্দুগণও ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুদর্শন সমূহের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-ধর্ম্মের—বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন। হিন্দুগণ যাহাতে তাহাদের সনাতন রীতি নীতির অনুসরণ করিয়া চলে ভূদেববাবু তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের চেষ্টায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তান্ত্রিকধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইল। যৌগিক ক্রিয়াসমূহও একদল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। ব্রাহ্ম আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ এতদূর অগ্রসর হইল যে, হিন্দু সমাজের অনেকে রীতি নীতি ও ক্রিয়াকর্ম্মের অযথা ও যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়া উহাদের সমর্থন করিতে লাগিলেন। থিওজফী,—খ্রীষ্টানধর্ম্মের স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। উহা আর্য্য-সমাজের মত হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করিল। হিন্দুদিগের স্বর্গাদি লোক, দেবদেবী ও ঋষিদিগের সম্বন্ধে ইহা অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। আর্য্যসমাজ ভারতবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্র—বিশেষতঃ গীতা ও উপনিষদ্—পড়িবার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিল। ইহার প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ বেদের আস্তিক্য-পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া তদীয় অনুচরবর্গকে গার্হস্থ্য পঞ্চযজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিতে আদেশ করেন। বেদ—শ্রীভগবানের বাণী বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, এবং ইহার অধ্যয়নের উপর বিশেষ জোর দিতেন। আর্য্যসমাজ, প্রতিমা পূজা ও শ্রাদ্ধক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং সমাজ সংস্কারের অনুকূলে প্রভৃত চেষ্টা করেন। এইরূপে গোঁড়া ও উদার আদর্শের সংঘর্ষের ফলে হিন্দুধর্ম্মের নবজন্মলাভ হইল। কিন্তু, ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ তখনও তমসাবৃত হইয়া রহিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থাংশে অনেক সংস্কারের কথা উত্থাপিত হইলেও, তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র কার্য্যে পরিণত হয়। এইরূপে যাহা করা হইল তাহা হিন্দুধর্ম্মের আংশিক সংস্কার। বিভিন্ন সম্প্রদায়

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিল। রক্ষণশীলেরা উপরের খোসা লইয়া মারামারি করিতে লাগিল এবং উদারপন্থীরা ভিতরের শস্য-কণা লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল। উহাদের মধ্যে কেহই ভাবিয়া দেখিল না—শুধু খোসা বা শুধু শস্যকণায় চারাগাছ জন্মাইতে পারে না। বীজটি খোসার দ্বারা সংরক্ষিত না হইলে ইহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বিদেশী সংস্পর্শে এদেশে যে সকল নূতন ভাব ও আদর্শ আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গ্রহণ করা হিন্দু জাতির প্রয়োজন হইয়াছিল। অধিকন্তু. এই সময়ে এরূপ অভাবও বোধ হইতে-ছিল যে,—ধর্ম্ম জীবনে হিন্দুধর্ম্মের পুরাণ, উপপুরাণ, ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি সকলেরই মূল্য আছে, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন শাখা-গুলিকে একত্র করিবার চেষ্টা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই অভাব দূর করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি ত্যাগ ও পবিত্রতার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। যাঁহাকে জানিলে সব জানা যায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি বাল্যকালেই মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। করুণ প্রার্থনা, অহৈতুকী ভক্তি ও জগজ্জননীকে দেখিবার জন্য বালকসুলভ ব্যাকুলতা—এই সকল উপায়ে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। গন্তব্য পথে ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ধর্ম্মের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সাধকদিগের পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের নিকট উহাদের আবশ্যকতা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্মের নানা প্রকার কঠোরতার মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের নীতি সমূহের অনুসরণ ও বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যেক সাধনের শেষে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একই অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন। এইরূপে পরমহংসদেব বৈদিক ঋষি-বাক্যের সমর্থন করিয়াছিলেন—"একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" —সত্য এক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ঋষি উহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। তাঁহার অনুভূতির মূল-নীতিগুলি সংক্ষেপে এইরূপে বলা

যাইতে পারে—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত, ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা; প্রত্যেক সাধককেই ইহাদের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। অদ্বৈত শেষ অবস্থা; এই অবস্থায় জীব, ভগবানের সহিত একত্ব বোধ করে। মহাপুরুষেরা ইচ্ছা ও স্পর্শ শক্তির দ্বারা ধর্ম্ম অপরকে দিতে পারেন। বেদান্তের সনাতন ধর্ম্মে জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মের শাশ্বত নিয়মগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই তাঁহার স্বকীয় ধর্ম্মাদর্শ অনুসরণ করিবেন এবং অন্যান্য ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই সত্যকে প্রতিপন্ন করিতেছে বলিয়া মনে করিবেন। যদি একটি ধর্ম্ম সত্য হয়, তাহা হইলে সকলগুলিই সত্য হইবে। সকল ধর্ম্ম হইতেই ঋষি ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল সত্য হিন্দুগণের নিকট নূতন নহে; বেদ, উপনিষদ্ ও গীতাতে এই সত্য সমূহ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব না বলিলেও উহাদের সত্যতা অক্ষুণ্ণ থাকিত; কিন্তু যিনি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া উহাদের মধ্যে যে শক্তি আসিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহা আসিত না। উহারা পণ্ডিতদিগের তর্কের বিষয় হইয়া থাকিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্ম্ম ও অন্যান্য সকল ধর্ম্মের এই সত্য প্রতিপাদন করিলেন যে,—ভগবান্‌ই নিত্য, আর যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য। তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার উপায়—'কাম-কাঞ্চনের' পূর্ণ ত্যাগ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের অদ্ভুত ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন; তিনি ইহাদের সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, এরূপ উচ্চ অবস্থায় তিনি পৌঁছিয়াছিলেন যেখানে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সমূহ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ হইল। কেশববাবু তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার জীবনে ভগবানের মাতৃভাব পরিপক্ক

করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ভাবও পরিস্ফুট হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সহিত যাঁহারা কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পৃথক হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে পর, কেশবচন্দ্রের দল নববিধান নামে পরিচিত হইল। এই নববিধানে ঐ সকল ভাবের আংশিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম স্থাপন করাই নববিধানের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার নীতি 'উদার' ছিল। প্রধানতঃ ইহা হিন্দুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, বাইবেলের উপদেশ, স্কটল্যাণ্ডবাসী হ্যামিল্টন ও রীডের চিন্তা সমূহ এবং পাশ্চাত্য দেশীয় অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তির ভাবধারা অনুসরণে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। 'উদার' ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মের যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিয়া একত্র সমাবেশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বোধ হয় এরূপ ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না, কারণ, ইহা স্বাভাবিক নহে এবং ইহার প্রচলনও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য ইহাকে সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বলা চলে না। শীঘ্রই হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। একদল হিন্দু তদানীন্তন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংসর্গে আসিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের ভাব বিশেষভাবে গ্রহণ করেন। সিন্ধুদেশের হীরানন্দ, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের একজন অনুচর ; তিনি পরমহংসদেবের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তদীয় ভাব নিজদেশে প্রচার করেন।

পরমহংসদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রচারের ভার তদীয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর পতিত হয়। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মৃত অস্থিতে নবজীবনের সঞ্চার করেন ; নূতন মহাদেশে প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়া তথায় ইহার প্রতিনিধি স্বরূপে দণ্ডায়মান হন। "বৌদ্ধধর্ম্ম এই হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রোহী সন্তান এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম দূরবর্ত্তী প্রতিধ্বনি মাত্র।" তিনি তথায় এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করেন যে, নরনারীসমূহ নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে পৌছিবার জন্য বিভিন্ন অবস্থা ও অন্যান্য

সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়া এই ধর্ম্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি জগতের সমক্ষে একেশ্বরবাদ ও মানবজাতির একত্ব প্রচার করেন। তিনি চিকাগো মহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের মূল নীতিসমূহ প্রকাশ করেন। মানুষ মিথ্যা হইতে সত্যে যায় না, পরন্তু এক সত্য হইতে অন্য সত্যে উপনীত হয়, নিম্নের সত্য হইতে উচ্চ সত্যে উপস্থিত হয়। তিনি পাপবাদ দূর করিয়া দিয়া মানবের স্বাভাবিক দেবত্বে বিশেষ জোর দেন। পাপের চিন্তা করিয়া কেহ কখনও ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তিনি সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতের ধারণা পরিস্ফুট করিয়া দিয়া বলেন যে, ইহা অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে অন্যতম ধর্ম্ম নহে; পরন্তু ইহা ধর্ম্মের স্বরূপ, ইহা নিরপেক্ষ ধর্ম্ম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ যে, বেদান্ত তত্ত্বের প্রতিধ্বনি-মাত্র সেই সর্ব্বোচ্চ বেদান্ত-দর্শন হইতে সর্ব্বনিম্নস্থ পুরাণ উপপুরাণযুক্ত পৌত্তলিকতা, বৌদ্ধদিগের নিরীশ্বরবাদ, জৈনদিগের নাস্তিকতা—হিন্দুধর্ম্মে ইহাদের সকলেরই স্থান আছে। ইষ্টোপাসনা এই হিন্দুধর্ম্মের একটি বৈশিষ্ট্য; ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ও নিজ নিজ পন্থানুযায়ী ভগবদারাধনা করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, জগতের সর্ব্বত্রই বিশেষ বিশেষ লোকের জন্য প্রতিমাপূজার আবশ্যকতা আছে। যদিও পারমার্থিক সত্য নামরূপের অতীত, তাহা হইলেও তাঁহাকেই বিভিন্ন ধর্ম্মে, ক্রুশ, কাবা, গীর্জ্জা, মসজিদ, প্রতিমা, পুস্তক, পারাবত, সিন্দুক—এই সকল বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। দেশবিশেষে ও সময়বিশেষে কেহ কেহ প্রতিমাপূজার নিন্দা করিলেও ইহার আধ্যাত্মিক মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। অধিকন্তু প্রতীকরূপে না গ্রহণ করিলেও উপাসকদিগের নিকট প্রতিমার যে এক অমূল্য আধ্যাত্মিক সত্তা আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় উদার সংস্কারকবৃন্দ হিন্দুধর্ম্মের নীতিসমূহই সামাজিক অবনতির কারণ মনে করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, হিন্দুধর্ম্মের নীতিসমূহকে যথাযথ রাখিয়াই অবনত সমাজকে পুনরুন্নত করিবার উপায়স্বরূপ নির্দ্ধারণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া কর্ম্মযোগের

বিশদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া জোরের সহিত বলেন, "যদি জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা ভগবান্ লাভ করা যায়, তাহা হইলে 'জীবকে শিবজ্ঞানে' সেবারূপ কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেই একই তত্ত্বে পৌছান যায়। যদি একই সত্য এক ও বহু হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শুধু যে সর্ব্বপ্রকার উপাসনার দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে—এরূপ নহে, পরন্তু সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কার্য্যের দ্বারাই ঐ উপলব্ধি সাধিত হইতে পারে। পরিশ্রম করাই—প্রার্থনা করা।" সিষ্টার নিবেদিতার কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—তাঁহার নিকট কর্ম্মশালা, অধ্যয়নাগার, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি স্থান সমূহ সন্ন্যাসীর গহ্বর ও মন্দিরের মতই ভগবদ্দর্শনের উপযুক্ত স্থান। স্বামিজী বলিয়াছেন, "শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম একই সত্যকে উপলব্ধি করিবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পথ।—কিন্তু এই কথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে অদ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।"

জগতের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী নূতন আশা, উচ্চ আকাংক্ষা, সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারত বিশ বৎসরের মধ্যে শতাব্দীর পথ অতিক্রম করিয়াছে। গোঁড়ামির স্থানে উদারতা দেখা দিয়াছে। বাহাগণ, আহ্মদীয়া এবং পূজ্যপাদ আগা খাঁএর অনুচরবৃন্দ মুসলমান ধর্ম্মের ভাব উদার করিয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নীতিসমূহ ইহার জন্মভূমিতে লোকের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান ও বিচার বিগত শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মকে সাধারণের আদর্শের আরও উপযোগী করিয়া দিয়াছে। আধুনিক সংস্কার সমন্বিত শিখধর্ম্ম পাঞ্জাবে একটি শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী ধ্বনির স্থানে এখন নূতন ধ্বনি উঠিতেছে,—"হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া চল।" এখন আর পাশ্চাত্য ভাবসমূহের অন্ধ অনুকরণ না করিয়া, লোকে আর্য্য ঋষির জ্ঞান এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেষণা—এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। যে ধর্ম্ম সমাজ হইতে তিরস্কৃত হইয়া অরণ্য অথবা কীটদষ্ট পুস্তকের মধ্যে লুকাইত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে দ্রুত ব্যবহারিক জীবনে আবির্ভূত হইতেছে। জ্যাকোবের মইয়ের (ladder) মত ইহা এক্ষণে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সংযোগ বিধান করিয়াছে।

সমস্ত কার্য্যেই নেতৃত্বের পরীক্ষা হইতেছে ত্যাগে ও পবিত্রতায়। ধর্ম্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের উপর নির্ভর করে—এই বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ় হইতেছে। তত্ত্বোপলব্ধি ও তদনুযায়ী চরিত্র গঠনই হইতেছে ধর্ম্মের কষ্টি পাথর। একদল শিক্ষিত লোক সন্ন্যাসাদর্শে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছেন। প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের উপলব্ধি আবশ্যক একথা আধুনিক দার্শনিকগণের মনে হইতেছে। আজকাল ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের মধ্যে এই একটা ভাব জাগিয়াছে যে, তাঁহারা কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট উপদেশ লইতেছেন। এইরূপে সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই উভয় প্রকার জাতীয় জীবনেই নূতন রকম ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আধুনিক ধর্ম্মচিন্তার ধারা কিরূপ? জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "আত্মার একত্ব নাই কি? সর্ব্ব-ব্যাপী ভগবান্ নাই কি? লোকে কি বলিয়া বেড়াইবে—কোন্ দেবতার জন্য হোম করিব?" প্রত্যেক ধর্ম্মই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম হইতে চায়। কিন্তু সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের কি কি লক্ষণ থাকা চাই? এরূপ ধর্ম্ম একজন লোকের জীবনী বা একখানা গ্রন্থের উপর মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে চলিবে না। ক্রিয়াকর্ম্ম, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আবশ্যক—একথা স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগ—ইহারা সকলেই সমানভাবে পরম সত্যে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ। জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিলেও পারমার্থিক সত্তার সন্ধান চাই; এই নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্তাই দর্শনসমূহের ভিত্তিভূমি। এই ধর্ম্ম মানবের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইবে এবং আশা, বিশ্বাস, শক্তি ও নির্ভীকতার উৎসস্বরূপ হইবে। ইহা আকাশের মত প্রশস্ত এবং সমুদ্রের মত গভীর হইবে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন ভিন্ন মতামত সকলেরই স্থান হইবে। সমস্ত ধর্ম্মই স্ব স্ব আচারানুষ্ঠানের সহিত সেই একই সত্যস্বরূপে পৌঁছাইয়া দেয়। মনীষিগণ বেদান্তের ধর্ম্মকেই

সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছেন। ইহা ইতিমধ্যেই ধীর পদবিক্ষেপে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মৃদু শিশির বিন্দুর ন্যায় ইহা সমুজ্জ্বল প্রভাতের আভাস দিতেছে। ইহাই ঠিক-ঠিক আমাদিগকে 'নিজের মুক্তি ও জগতের হিত'রূপ পরম কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত করিবে;—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে শান্তি ও শুভেচ্ছা এই মহতী সভাতে সকলের প্রতি বিঘোষিত হউক।

নিখিলানন্দ

---

* ব্রাহ্মধর্ম্মের শতবার্ষিকীতে পঠিত।

জীবনের হিসাব নিকাশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন বিকৃত মস্তিষ্ক বা ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলভ্রমে অগ্নি গ্রহণ করে তাহার পিপাসা ত মিটিবেই না, অধিকন্তু সে দুঃসহ জ্বালায় অস্থির হইবে; সেইরূপ শীতার্ত্ত ব্যক্তি উষ্ণ পদার্থ ভ্রমে যদি বরফরাশি গ্রহণ করে তাহার শীত ত দূর হইবেই না, অধিকন্তু শৈত্যের আধিক্যে সে মৃতপ্রায় হইবে। কেন-না বুদ্ধির ভ্রান্তিবশতঃ সে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেইরূপ মানবও সুখ পাইবে বলিয়া প্রকৃত সুখদ বস্তুর সংসর্গ কামনা করে কিন্তু তাহার যদি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-জনিত চিত্তশুদ্ধি না ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে প্রকৃত সুখদ বস্তু কি তাহা তাহার চিত্তে বা বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইবে না; অসত্য অবস্তুর লাভ হইয়া তাহার বিপরীত ফল হইবে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শান্তি হইতেই সুখ। একথা কেবল একস্থলে নহে বহু স্থানে বহু ভাবে বিবৃত হইয়াছে—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥"

সমস্ত নদনদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গভীর সমুদ্র যেমন বর্ষার বারিধারা প্রবেশ করিলেও বিক্ষুব্ধ হয় না, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল যে পুরুষে প্রবিষ্ট হইলেও বিক্ষোভ উৎপাদন করে না, সেই মহাত্মাই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াভিলাষী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি সুদুর্লভ।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক স্পৃহাশূন্য, মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিচরণ করেন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন।

"জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।"

জ্ঞান অর্থে আত্মজ্ঞান। পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে শ্রেষ্ঠ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে—

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥"

যুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, অযুক্ত বা কামনাসক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—

"সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।"

সর্ব্বভূতের সুহৃদ আমাকে জানিয়া শান্তিলাভ করেন। এখানে সন্দেহ হইতে পারে, এতক্ষণ আত্মাকে জানার কথাই হইতেছিল তবে "আমাকে জানিয়া" একথা উত্থিত হইল কেন? তাহার কারণ এই যে ভগবান নারায়ণই সকলের আত্মা।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" ১।২।১১

তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। স্ব স্ব মতানুসারে সেই তত্ত্বের অনেক নাম আছে, যথা—উপনিষদে তাঁহাকে ব্রহ্ম ও হিরণ্যগর্ভ, উপাসকেরা তাঁহাকে পরমাত্মা, আর ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও একস্থলে বলিতেছেন—

"নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনাং আত্মনি।" ১০।১৪।১৪

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিতেছেন, হে অধীশ্বর! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আপনিই নারায়ণ। কারণ আপনি দেহীদিগের আত্মা।

তাই ভগবান বলিতেছেন 'আমাকে' জানিয়া শান্তিলাভ করিবে।

নারায়ণই সর্ব্বজীবের আত্মা সুতরাং আত্মাকে জানিলেই জীব শান্তির অধিকারী হয়।

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬।১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥" ৬।১৫

প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যাপরায়ণ, নিগৃহীতমনা, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগী আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তিলাভ করিয়া থাকেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥" ১৬।২৩

যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া বিচরণ করে সে ব্যক্তি সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি লাভ করিতে পারে না।

গীতা হইতে এই সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখিতে পাইলাম শান্তিই সুখ; কামনাবর্জ্জনে ও ইন্দ্রিয়নিরোধে শান্তি। শুধু গীতায় কেন, অন্যত্রও এই উপদেশ পাওয়া যায়।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহির্যবং হিরণ্যং পশবস্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥"

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না; ঘৃত কাষ্ঠাদির দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বৰ্দ্ধিত হয়। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি যবাদি অন্ন সুবর্ণাদি ধন, গো অশ্বাদি পশু, পরমাসুন্দরী স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না। তবে তাহাদের ভোগে কিরূপে শান্তি হইবে? এতদ্বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক। 'গীতার্থ সন্দীপনী' ১৫৩ পৃঃ।

আমরা এতক্ষণে বুঝিলাম সুখ কোথায়? সুখ—ত্যাগে, সুখ—ভোগে

নহে। সুখ—নিবৃত্তিতে, প্রবৃত্তিতে নহে; "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। ব্যক্তিগত জীবনে এ শিক্ষা আমরা হারাইয়াছি, সমাজগত জীবনে এ শিক্ষা আমরা হারাইয়াছি, জাতিগত ও রাষ্ট্রগত জীবনে এ শিক্ষা হারাইয়াছি, তাই এই দুর্দ্দশা। Rank materialism—অদম্য ভোগ-লিপ্সা—ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত অনর্থের ও সর্ব্বনাশের মূল। তাই এই বিকট জ্বালা, এই বিভীষিকা, এই বিশ্বব্যাপী দ্বেষ হিংসা, ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জীবধ্বংসী সংগ্রাম, আর্ত্তনাদ ও হাহাকার। যেন মূর্ত্তিমান খণ্ড প্রলয় উপস্থিত।

ভগবান মানবের হৃদয়ে উপরোক্ত শিক্ষা বদ্ধমূল করিবার জন্য দুই এক স্থানে দুই এক প্রকার উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি অন্যস্থলে ও অন্যপ্রকারে সুখের প্রকৃত উপায় কি তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং বিষয়ের গুরুত্ব বোধে আমি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন। তৎপরে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখলাভ করেন। হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়-বিষয়-সমুৎপন্ন ভোগ সুখে আসক্ত হন না। কেন না তত্তাবৎ দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী। যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কাম ক্রোধাদির বেগ বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ।

এইরূপ যুক্ত ও সুখী পুরুষের অবস্থা কি?

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥"

"আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত
সর্ব্বত্র সমানদর্শী যোগী করে অনুভূত ॥
যে আমাকে দেখে সর্ব্বে, সর্ব্বত্র আমাতে আর
হয় না অদৃশ্য মম, না হই অদৃশ্য তার ॥
সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন
সুখে দুঃখে—মম মতে সে জন যোগী পরম ॥"

(নবীনবাবুর অনুবাদ)

সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিলে, আত্মায় সর্ব্বভূত দর্শন করিলে, সর্ব্বত্র সমদর্শন হইলে, আপনাতে ও ব্রহ্মে অভিন্ন বোধ করিলে—জীব শান্তি-লাভ করে, প্রকৃত সুখের অধিকারী হয়।

উপনিষদেও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥" ঈষ—৭

যাঁহার সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি হইয়াছে সেই একদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির শোক বা মোহ হয় না।

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥"

কঠ ২।২।১৩

যে বিবেকী পুরুষগণ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই আত্মাকে দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ বা শান্তি লাভ হয়।

"তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥"

শ্বেতাশ্বতর ৪।১১

সেই নিয়ন্তা, বরদ, পূজ্য দেবতাকে দর্শন করিয়া সাধক চিরকালের মধ্যে এই (অর্থাৎ অপরোক্ষানুভবগ্রাহ্য) শান্তি লাভ করেন।

"বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥"

শ্বেতাশ্বতর ৪।১৪

বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা মঙ্গলস্বরূপকে জানিয়া সাধক চিরকালের জন্য শান্তি লাভ করেন।

এই সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন প্রহ্লাদের হইয়াছিল; জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তিনি তাঁহার প্রাণের প্রাণ হরিকে দেখিয়াছিলেন; অগ্নিতে, হস্তিপদতলে, উৎকট বিষে, স্তম্ভে প্রাণারাম হরির উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তিনি দুঃখকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বালক নচিকেতার এই দর্শন হইয়াছিল। হরিদাস ঠাকুরের এই দর্শন হইয়াছিল। আপনারা জানেন, হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। হরিদাস ঠাকুরের এই বৈষ্ণবাচরণ দেখিয়া কাজী তাঁহার নামে রাজার নিকট অভিযোগ করেন ও বিচারার্থ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ হয়। বলা বাহুল্য, অনুচরগণ কর্ত্তৃক বর্ণে বর্ণে এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল। কিন্তু হরিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি সর্ব্বভূতে আপন ইষ্টদেবের দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হরিনাম পরিত্যাগ করেন নাই। ভগবান বুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, পরমহংসদেব, শ্রীযীশু ইহাঁদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিলাম না, কেন না ইহাঁরা ভগবানের অবতার; ভগবানই তাঁহাদের রূপে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

ব্যাধিও বুঝিলাম, ঔষধও বুঝিলাম। অবশীকৃত ইন্দ্রিয়ের দাস

হইয়া ভোগলোলুপ ও বাসনাপরায়ণ হইয়া ক্ষুদ্র বিষয়ের অনুধ্যান করিয়া আমাদের দুঃখ, ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়া, ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করতঃ শ্রবণমনন নিদিধ্যাসন সহকারে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইবে—সুখ পাইতে হইবে ইহাও বুঝিলাম। ইহা ত সহজ ব্যাপার নয়, একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অর্জ্জুনেরও এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল।

"যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

হে মধুসূদন! আপনি সমতারূপ যোগের কথা বলিলেন, কিন্তু মনের চঞ্চলতা বশতঃ তাহার স্থায়িত্ব দেখিতেছি না। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, প্রমথনশীল, বলবান ও দৃঢ়; বায়ুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, মনকেও সেইরূপ নিগ্রহ করা যায় না।

ভগবান উত্তর দিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে। পাতঞ্জল দর্শনেও তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়। পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা নিত্যানিত্যবস্তু বিচার করিয়া হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা এক করিয়া মনকে বশীভূত করিতে হইবে। আমরা সামান্য বৈষয়িক ব্যাপারে কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত অভ্যাস, কত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই ও করিয়া থাকি কিন্তু হৃদয়ের হৃদয়, অন্তরের অন্তর, পরম সখা, পরাৎপর, সাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু নারায়ণের জন্য কি করিয়া থাকি? পরমহংসদেব বলিতেন, মানুষ

স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য একঘটি চোখের জল ফেলিতে পারে, আর ভগবানের জন্য এক ফোঁটা জলও পড়ে না। "ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকৃতে পারে"। ভগবানের পদতলে আপনাকে বিলাইয়া দিলে তবে শক্তিলাভ হইবে। দিবারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে—"হে জগদীশ, হে দীনবন্ধু! হে অগতির গতি, হে দুর্ব্বলের বল, আমায় বল দাও আমার দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দাও, আমাকে সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত কর", তবে তিনি তোমাকে সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেব অনুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥"

যাঁহারা একাগ্রচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। আমিই অনুগ্রহ করিয়া দীপ্তিশালী জ্ঞানরূপ প্রদীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞান জনিত অন্ধকার দূর করিয়া থাকি। ভগবান তাঁহাতে সতত যুক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সত্যবস্তু নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। "The soul of man is the lamp of God." ভগবানের নাম করিতেছি এই বলিয়া, আত্মবঞ্চনা করিলে লাভ নাই। তাহাতে নিজেরই সর্ব্বনাশ হইবে।

এই কথা শুনিয়া আশঙ্কা হইতে পারে—তবে কি সংসার উৎসন্ন যাইবে, সকলকেই বৈরাগ্য গ্রহণ করিতে হইবে? প্রথম উত্তর এই যে, সকলে বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে সংসার উৎসন্ন যাইবে না পরন্তু এই সংসার ভূস্বর্গে পরিণত হইবে। উহা বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার এ সময় নয়। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, সকলের বৈরাগ্য গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। এ সংসার ত আজিকার নহে, শাস্ত্রও অনাদি সুতরাং শাস্ত্রের অনুশাসনও অনাদিকাল হইতে প্রচলিত

আছে। মহাপুরুষগণও মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন কিন্তু কৈ সকলে ত বৈরাগ্য প্রয়াস করেন নাই।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেৰ্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তিভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥"

জ্ঞানবান ব্যক্তিগণও নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত; শাসন তাহাদের কি করিতে পারে? কেন না স্বভাবই বলবান। তবে আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কাশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করে তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে।

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি।" অতএব বৈরাগ্যের দ্বারা সংসার উৎসন্ন যাইবার অমূলক আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। বরং প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, সংযমের অভাবে, বিলাসিতার স্রোতে, দ্বন্দ্ব কলহে, অধর্ম্মের প্রভাবেই সংসার উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আর তাহারই প্রতীকার কল্পে আজ কাল নানা প্রকার ব্যর্থ চেষ্টার আয়োজন হইতেছে। জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে Arbitration Courts, League of Nation, Pact স্থাপিত হইতেছে, মুখে Universal Brotherhood, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বের উচ্চারণ ও প্রচার করা হইতেছে কিন্তু কোন স্থায়ী সুফল লাভ হইতেছে না। Patch work বা expediency হিসাবে তাহাদের কিছু উপকারিতা থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে মূল রোগের প্রতিষেধ হইবে না। কারণ যে জ্ঞান হইতে এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিতে পারে তাহার ভিত্তি এখনও সুদৃঢ় ভাবে পত্তন হয় নাই। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি মানুষ যখন আত্মপর ভেদ জ্ঞান দূর করিতে পারিবে, সম্পূর্ণভাবে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও পারিবে, যখন সর্ব্বভূতে

ভগবান আছেন বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে, "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" বলিয়া জ্ঞান হইবে তখনই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আসিবে, তখনই কলহের মূল আত্মপর ভেদ-জ্ঞান বিনষ্ট হওয়া হেতু জগতে শান্তির পথ প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগৎ ও জীব সুখের পথে অগ্রসর হইবে।

সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের রচিত "স্বরাজের 'স্ব'" প্রবন্ধ হইতে আমার মতের পোষক কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

"যে ব্যক্তি বা জাতি Immanence of God and Solidarity of man—ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা অনুভব করিতে পারে, তার মন থেকে গণ্ডি ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণতা দূর হয়—একটি উদাত্ত সুর তার চিত্ত বীণায় নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতে থাকে; সে দ্বৈপায়ণ (insular) থাকতে পারে না, বিশ্বায়ত (universal) হয়; জাতীয়তা বা nationalismএ তার হৃদয় ভরে না, সে আন্তর্জ্জাতিকতা বা internationalism এর জন্য উৎসুক হয়। এবং চরমে এভাব বদ্ধমূল হলে বিশ্বজনীনতায় বিভোর হয়ে বল্‌তে থাকে।

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
ভ্রাতরো অনুজাঃ সর্ব্বে স্বদেশো ভুবন ত্রয়ং॥"

হিন্দু জাতির এ ভাব হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন,—

"পাশ্চাত্য জাতিদিগের জীবন যদি সমঞ্জস করতে হয়, তা হলে যে আদর্শ প্রাচীনকালে ঋষিরা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যতদিন সেই বর্ণাশ্রম আদর্শ ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন তাদের মঙ্গল হবে না। ভাববেন না সে আদর্শ আমরা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পেরেছি; পারি নাই বলেই আমাদের অধঃপতন হয়েছে।"   (ব্রহ্মবিদ্যা ১৩৩২ সাল)

আমার হিসাব নিকাশ শেষ হইল। "রেওয়া মিল" করিয়া দেখিলাম —জমার ঘরে শূন্য, খরচের ঘর ভারী। দুনিয়ায় আসিয়া দেউলিয়া (bankrupt) হইয়া চলিলাম! যদি কখনও ব্যবসায় বুদ্ধির পরিবর্ত্তন করিতে পারি, শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া ভগবানের সেবা করা

ভাবে ব্যবসায় করিতে শিখি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতে পারি এবং ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি, তবেই "রেওয়া মিলে" জমার দিকে কিছু দাঁড়াইবে নতুবা বৃথা ব্যবসায়। এ জন্মে তাহা হইল না এ দুঃখ কম দুঃখ নয়।

শ্রীহরিপ্রসাদ বসু

শিক্ষকদিগের প্রতি অভিভাষণ*

বর্দ্ধমানের শিক্ষক সঙ্ঘের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার নিমন্ত্রণ আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ শুধু ইহাই নহে যে, এই সভায় আমার পুরাতন শিক্ষক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপস্থিত, যিনি আমার নবলব্ধ পক্ষরাজিকে অজানা জ্ঞানাকাশে সঞ্চালন করিতে যত্নের সহিত সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার আরও কারণ এই যে, আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষকদিগের এইরূপ মিলন এবং পরস্পর আলোচনা মঙ্গলজনক। আমরা সকলেই দৈনিক কাজে ব্যস্ত থাকি। কাজ করিয়া কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর আমাদের সকলেরই সঙ্কীর্ণ। সমস্ত দিন কাজের পর যখন অবসর হয়, তখন কাজের কথা ভুলিতে চেষ্টা করাই আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু তাহা হইলেও মাঝে মাঝে অবসর করিয়া লইয়া কার্য্যের সম্বন্ধে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। যে কার্য্যটি আমরা জীবনে পছন্দ করিয়া লইয়াছি সেটি কি ভাবে করা হইতেছে এবং তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া করা যায় কিনা; সংসারের মধ্যে, ভগবানের রাজ্যে (subspecie aeternitatis) সে কার্য্যের স্থান কোথায় এবং সে স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে কিনা; ইত্যাকার চিন্তার রোমন্থন সময়ে সময়ে আবশ্যক। নৌকা চালাইবার সময় মাঝে মাঝে দাঁড় উঠাইয়া লইয়া দিক নির্ণয় করা চাই, নতুবা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এই যে চিন্তার রোমন্থন ইহা

---

* বর্দ্ধমান টাউন স্কুলে ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে পঠিত।

সংসারের সমস্ত কাজের লোকেরই প্রয়োজন, শুধু দার্শনিকদিগের নহে। অর্থাৎ ইহা যুক্তি-সঙ্গত নহে যে, একদল লোক কেবল কাজই করিয়া যাইবে, আর অন্যদলের লোক সেই কাজ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া তথ্য আবিষ্কার করিবে। তাহা হইলে কাজও ঠিক হয় না এবং তথ্যও ঠিক আবিষ্কার হয় না। কাজও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তথ্যও "হাওয়ার" উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যাং উপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমঃ য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
Percepts without Concepts are blind.
Concepts without percepts are lame.

শিক্ষকদিগের এই সভাতে আমার মত অব্যবসায়ীরও স্থান আছে, কারণ শিক্ষকদিগের যে-কার্য্য তাহার ফল এত ব্যাপক যে, শিক্ষাকার্য্যে দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির, সমস্ত পিতামাতার—সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ আছে। শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করিতে হইলে দেশের লোকমতের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। এবং কাজের ক্ষেত্রেও আপনারা অনেক সময় অনুভব করেন যে, লোকমতের অজ্ঞানতার জন্য আপনারা যাহা ঠিক উচিত, তাহা করিতে পারিতেছেন না। আবার সাধারণের মধ্যে কেহ কেহ দুঃখ করেন যে, শিক্ষক সমাজের অজ্ঞানতার জন্য তাঁহারা, যতটা সুফল আশা করা যাইত, ততটা কার্য্যে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। কাজেই শিক্ষক এবং চিন্তাশীল সাধারণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান বাঞ্ছনীয়। আরও কথা আছে যে, যাহারা জুতা পায়ে দেয় তাহারাই জুতায় কাঁটা কোথায় তাহা ঠিক জানিতে পারে। শিক্ষকেরা তো বালককে সংসারের চৌমোহানায় আনিয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেন—সংসারের, সমাজের লোকেরাই বুঝিতে পারিবেন কোন্‌খানে কাঁটা ফুটিতেছে।

(২)

বাংলাদেশে আজিকার দিনে কাঁটা কোথায় ফুটিতেছে? শিক্ষা হইতে আমরা কি আশা করি, আর কি পাইতেছি না? পিতামাতারা

শিক্ষা হইতে কি চান? "ছেলেরা মানুষ হোক"। কি রকম মানুষ? স্বাস্থ্যবান্, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপরায়ণ মানুষ হোক্, এইটাই বোধ হয় সকল পিতা মাতার আশা ও আকাঙ্ক্ষা। এই চারের মধ্যে প্রধান কি, যদি এ সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমি বলি প্রথমটি ও শেষটি। স্বাস্থ্যবান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র যদি পান তবে পিতামাত্রই নিজেকে ভাগ্যবান্ এবং কৃতার্থ মনে করিবেন, বিদ্যা বুদ্ধি যতটা হোক্ কিম্বা নাই হোক্। কিন্তু আপনারা অবশ্য এই দুইয়ের অনুশীলনেই ব্যাপৃত আছেন। কাজেই স্বাস্থ্য এবং ন্যায়পরতা সম্বন্ধে অনুযোগ উত্থাপন করা আপনাদের নিকট কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবুও এ কথাটুকু আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতে চাই যে "মানুষ করা" যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে শরীর, হৃদয় এবং মন এই তিনের কথাই আমাদের চিন্তার বিষয়, এবং এই তিনের মধ্যে মানসিক শিক্ষা অপর দুইয়ের অপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয়। যাহা হউক মানসিক শিক্ষা কার্য্যেই যখন আপনাদের চেষ্টা মুখ্যতঃ নিয়োজিত, তখন সেখানে কোথায় কাঁটা ফুটিতেছে সেই কথাই আমি আপনাদের কাছে উত্থাপন করিব।

(৩)

কোথায় কাঁটা? বাংলা দেশে—ভারতবর্ষে, মানসিক ক্ষেত্রে প্রধান অভাব কি? উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাধীন চিন্তার অভাব। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি সেই অভাবই ক্রমাগত চক্ষুকে, মনকে পীড়া দেয়। বিজ্ঞানের রাজ্যে, মনোরাজ্যে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা পরমুখাপেক্ষী। সারা পৃথিবীতে মানুষ চিন্তা করিয়া, বুদ্ধির ব্যবহার করিয়া নিজেদের কর্ম্ম এবং পথ বাহির করিয়া লইতেছে, আর আমরা কেবল অন্ধ বিশ্বাসের বশে তাহাদের নকল করিয়া যাইতেছি। দুনিয়ার লোকেরা যখন মোটরকার তৈয়ারী করে আমরা তখন মোটর চড়ি; পৃথিবীর নানাদেশের সহস্র সহস্র লোক motor car সম্বন্ধে ছোট বড় উদ্ভাবন করিয়া লাভবান হইতেছে, আর আমরা কেবল অর্থক্ষয় করিয়া বাবু-গিরি করিতেছি। দুনিয়াতে যখন wireless উদ্ভাবিত হয়, আমরা

তখন ঘরে বসিয়া wirelessএর গান শুনি। দুনিয়াতে যখন aeroplane হইবে তখন aeroplaneও আমরা চড়িব। এইরূপ, দর্শনের ক্ষেত্রে যখন Hegelianism এর fashion হয়, তখন Hegelianism আমরা পড়িয়া লই, যখন Realism fashion হয় তখন Realism শিখিয়া লই।

"যাহা দেখে তারা তাই ফেলি শিখে।"

বাঙ্গালীর বুদ্ধি এই যে দাগাবুলানতে পর্য্যবসিত হইতেছে এইখানেই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কাঁটা ফুটিতেছে। সমস্ত পৃথিবীর লোক চিন্তা করিয়া জ্ঞানের রাজ্যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, আবিষ্কার করিবে, আর আমরা কি চিরদিন তাহাদের পায়ের কাছে বসিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়া যাইব? পরিবর্ত্তে কিছুই দিব না? তাহাদের আর্ষঋণ শোধ করিব না?

"দিন আগত ঐ
ভারত তবু কই?
সে কি রহিবে লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।"

শুধু তাই নয়, শুধু যে সবার সাথে মিলিয়া বিশ্বকর্ম্মভার লওয়ার প্রয়োজন তাহা নয়। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের, বিশেষ বিশেষ সমস্যা দিনের পর দিন উদয় হইতেছে, সে সকল সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করিতে হয় নচেৎ সমস্যার সমাধান হয় না। রাজনীতিক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিত্য নূতন সমস্যার উদয় হইতেছে। আমাদের সমস্ত সমস্যা বিদেশের লোকেরা চিন্তা করিয়া সমাধান করিয়া দিবে, কবে Germanyর নদীতে water hyacinth জন্মাইবে তবে আমাদের নদীর কচুরিপানা দূর হইবে, এইরূপ জ্ঞানরাজ্যের চিন্তারাজ্যের parasitism বা আগাছাবৃত্তি, শুধু যে লজ্জাজনক তাহা নহে, পরন্তু নানাপ্রকারে সমূহ বিপজ্জনক।

কিন্তু ইহাই কি আমাদের অবস্থা নয়? "ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ" মন্ত্র জপ চলিতেছে, কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষণ হইতেছে কই?

বিদ্যাশিক্ষাতেই আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তি নিয়োজিত হইতেছে, বুদ্ধি প্রস্ফুটিত করিবার চেষ্টা হইতেছে কোথায়? আর যে বিদ্যাশিক্ষা করা হইতেছে তাহাও পরের generationএর লোকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া ছাড়া সে বিদ্যার প্রয়োগ হইতেছে কি? বিজ্ঞান পড়িয়া বিজ্ঞানের শিক্ষক তৈয়ারী হইতেছে, বৈজ্ঞানিক কয়জন হইতেছে? দর্শন পড়িয়া দর্শনের Professor তৈয়ারী হইতেছে, দার্শনিক হইতেছে কৈ? সাহিত্য পড়া ও পড়ান হইতেছে—সাহিত্যের সৃষ্টি কোথায়? উল্লেখযোগ্য সমালোচনাই বা দেশে বৎসরের মধ্যে কয়টা বাহির হইতেছে? এ যেন সেই দেবযানীর অভিশাপ—

"বিদ্যার ভারবাহী মাত্র হবে
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।"

এই অভিশাপের কারণ কি? কারণ যে অনেক পরিমাণে আমাদের শিক্ষাপ্রণালী---এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

বিদ্যা এবং বুদ্ধি এই দুইয়ের মধ্যে বুদ্ধি অপেক্ষা বিদ্যার আদর মধ্যযুগে সর্ব্বত্রই অধিক ছিল। সমাজ যখন statusএর দ্বারায় আড়ষ্ট ছিল তখন বুদ্ধি প্রয়োগের স্থান অল্প ছিল এবং আর এক কথা, বুদ্ধি অপেক্ষা বিদ্যার আড়ম্বর চিরকালই বেশী। লেখাপড়া যখন এত বিস্তৃত ছিল না, ছাপাখানা যখন সৃষ্ট হয় নাই, তখন শুধু পূর্ব্বেকার শাস্ত্র কণ্ঠস্থ বা পুস্তকস্থ করিয়া পরবর্ত্তী পুরুষে পঁহুছাইয়া দেওয়াই একটা সামাজিক উপকার বলিয়া গণ্য হইত। কাজেই বুদ্ধিহীন পাণ্ডিত্য, অসাধারণত্ব এবং পরার্থপরতার নিদর্শন হিসাবে, ভক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। ছাপাখানার উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ barren scholarshipএর—অর্থাৎ যে পাণ্ডিত্য কোন নূতন জ্ঞানের আবিষ্কারে বা কোন পুরাতন জ্ঞানকে নবালোকে উদ্ভাসিত করাতে ফলপ্রসূ না হয়, সে পাণ্ডিত্যের সামাজিক মূল্য অতি সামান্য হইয়া পড়িয়াছে।

অপর দিকে জীবনযাত্রা আজকাল অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িতেছে। সমাজে, রাষ্ট্রে, গতানুগতিকতা অসম্ভব হইয়াছে। জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে—ব্যক্তির পক্ষেও রাষ্ট্রের পক্ষেও।

স্বাধীনতার মূল্য যে, শুধু সর্ব্বদা জাগরিত থাকা তাহা নহে, সর্ব্বদা বুদ্ধি প্রয়োগও বটে।

কাজেই enterprise, initiative, inventiveness উদ্‌যোগিতার, উদ্ভাবনী শক্তির, স্বাবলম্বনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। তাছাড়া এটাও ঠিক যে মানুষের জীবনের প্রধান আনন্দ সৃষ্টিতে, উদ্ভাবনে এবং আবিষ্কারে। কাব্য সৃষ্টিই হউক, আর একটা নূতন রকমের ইস্ক্রুপ সৃষ্টিই হউক; একটি নূতন তারার আবিষ্কারই হউক, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কারই হউক্ বা মানুষের একটি নূতন প্রয়োজন আবিষ্কারই হউক। এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত স্রষ্টা রহিয়াছেন তাঁহাকে জাগরিত করা; barren scholarship নহে।

কাজেই বুদ্ধি জাগরিত করা আর বিদ্যা দান, এই দুই লক্ষ্যের পার্থক্য অত্যন্ত মারাত্মক। একদিকে instruction, অপর দিকে education, একদিকে তোলা খাওয়ান, অন্যদিকে আহার খুঁজিয়া লওয়া; একদিকে জড়তা বা ইতর প্রাণীর মত "ধরে খাওয়া", অন্যদিকে মানুষের মত "করে খাওয়া"।

আপনারা নিজেরাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনাদের শিক্ষা-প্রণালী এই দুয়ের কোন উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আমি স্বীকার করিতেছি যে, আপনাদের কার্য্য অত্যন্ত দুরূহ এবং অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বিষয়গুলি matriculation পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিখাইয়া দিতে আপনারা বাধ্য হন। তা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের এবং অভিভাবকদিগের অতি মাত্র পরীক্ষাপ্রীতির তাড়নায় বাৎসরিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, দৈনিক পরীক্ষা অনেক সময় অন-ইচ্ছাসত্ত্বেও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমি এই সভায়—যেখানে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং অভিভাবকদিগের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত আছেন—এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং মনোবিজ্ঞানের তথ্যগুলি

সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে, শিক্ষাপ্রণালীর অনেকটা সংস্কার সাধিত হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের প্রধানতঃ দুইটি তথ্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আজ সময় আছে।

(ক্রমশঃ) শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই-সি-এস

চতুর্থ সত্তা

"For is not man a compound being, a combination of reason, emotion and will?" Swami Saradananda.

আমাদের জ্ঞান তিন ভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মাপিতে পারি। মনে করুন, এক প্রকার জীব আছে, যাহার জ্ঞান কেবল এক দিকেই সীমাবদ্ধ—উহা কেবল দৈর্ঘ্যই মাপিতে পারে। এই প্রকার জীবের নিকটে এই বিশ্বজগৎ একটি সরলরেখা বলিয়া মনে হইবে। উহা সম্মুখে কোন বাধা পাইলে, ঐ বাধাকেই জগতের শেষ বলিয়া মনে করিবে, উহা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবার কথা মনে হইবে না।

আবার মনে করুন, এই পৃথিবীতে এক প্রকার পোকা আছে—তাহাদের জ্ঞান দুই দিকে সীমাবদ্ধ,—তাহারা কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিতে পারে কিন্তু উচ্চতা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। আমরা ঐ পোকাকে খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিব এবং ভাবিব, উহা ইউক্লিডের জ্যামিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। এই পোকার নিকটে বিশ্বজগৎ সমতল বলিয়া মনে হইবে। মনে করুন, ঐ পোকাটি পৃথিবীর এক চতুষ্কোণ সমকোণ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দুইটি কোণের দূরত্ব মাপিতে যাইয়া দেখিতে পাইল—দুইটি দূরত্বের মধ্যে প্রভেদ হইতেছে। এখন পোকার মনে সন্দেহ হইল, সে বিশ্ব-জগতে যাহা ধারণা করিয়াছে তাহা কি ঠিক? অসীম অধ্যবসায়

সহকারে পোকা উচ্চতা সম্বন্ধে অস্ফুট ধারণা করিতে সক্ষম হইল এবং স্থির করিল দুইটি দূরত্বের পার্থক্য পৃথিবীর বক্রতার জন্য হইয়াছে। ঐ পোকার মস্তিষ্ক এই ভাবে গঠিত যে, উহা কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপিতে পারে, কিন্তু উচ্চতা মাপিতে পারে না; কিন্তু প্রগাঢ় চিন্তা সহায়ে উহার অস্ফুট ধারণা করিতে পারে।

আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা; আমরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মাপিতে পারি। যখন আমরা বলি, চতুর্থ সত্তা কি তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, তখন আমরা চতুর্থ সত্তা সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাই সত্য করিয়া বলি। কিন্তু উহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। এই সুনিশ্চিত অজানা জিনিষ আমরা একদিন নিশ্চয়ই জানিতে পারিব।

আমরা সময়ের উচ্চতা বা গভীরতা মাপিতে পারি না, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় সকল সীমাবদ্ধ। আমরা কি তিনটি সত্তাই মাপিতে পারি? কিন্তু ইহা কি নির্ভুল সত্য? দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা মাপিতে হইলে একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিন্দুর আবশ্যক যাহা হইতে আমরা ঐ তিনটি জিনিষ মাপিতে পারিব। কিন্তু এই বিশাল জগতের আদিও নাই, অন্তও নাই এবং এই অসীমের মধ্যে স্থির বিন্দু পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই অনন্ত কালস্রোতের মধ্যে কোন জিনিষ স্থির হইয়া নাই। ভগবানে বিশ্বাস এই সমুদ্রে ভেলাস্বরূপ এবং এই বিশ্ব পরিমাণ করিতে হইলে ভগবানকে জানিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে সামবেদের একটি কথা আমাদের মনে হইতেছে—"আমিই তিনি—যাহারা তাঁহাকে জানেন তাহাদের নিকটে তিনি দুর্ব্বোধ্য এবং যাহারা তাঁহাকে জানেন না, তাহাদের নিকটেই তিনি বোধ্য।"

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, এম-এ; বি-এসসি

পরীক্ষান্তে

আমার অযথা অভিমান
তোমারে কি করেছিল বেদনা প্রদান ?
হে আমার অন্তর দেবতা !
সন্দেহ কি করেছিনু করুণায় তব ?
—অসম্ভব কথা !
শুধু ক্ষণিকের
সে উন্মাদ অধীরতা আহত মনের
মুহূর্ত্তে জনমি লভিয়াছে,—
মুহূর্ত্তেই চির নিরবাণ।
নিমেষের অসহ যন্ত্রণা
নয়নে বহায়েছিল অশ্রুস্থলে রুধিরের কণা,
নৈরাশ্যের সন্ধিক্ষণে
বিষবাষ্প উদ্গীরণে
পদাহতা ফণিনীর সমুদ্যত ফণা
বুঝিবার ভুলে,
দংশিয়া ঢালিল বিষ নিজ মর্ম্ম-মূলে,
আত্মঘাতী নারকীর শুনিয়া মন্ত্রণা,
হে প্রিয় আমার !
তোমারি ছলনা এতো পরীক্ষা তোমার।
প্রথমে বুদ্ধির ভ্রমে বুঝিনি তা, ফুটে ক্রমে
অন্ধ আঁখি, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার।
হে অচিন্ত্য ! প্রেমসিন্ধু প্রণমি তোমায়,
নিজেরে নিজের চোখে পরিস্ফুট দিবালোকে
স্থাপিয়াছ কি অম্লান দীপ্ত গরিমায়।
মোহ ধ্বান্ত নাশ ভানু নমি তব পায়।
বুঝেছি কি নিধি মম, তুমি হে আমার,
পূজিত, প্রার্থিত, প্রিয়, হৃদাসনে বরণীয়,

আধার, আধেয়, সর্ব্ব সুখ আকাঙ্ক্ষার,
তোমারি কল্যাণকরে, জ্ঞান-শলাকায়,
উন্মীলি তৃতীয় নেত্র, আপন অন্তর ক্ষেত্র,
এ আত্মবিস্মৃত আজি দেখিবারে পায়,
অনল আখরে লেখা, মরমের পটে,
হেমজ্যোতি ঝলমল, শত সূর্য্য সমুজ্জ্বল,
প্রদীপ্ত বিমল একি আলেখ্য প্রকটে !
মিটেছে সংগ্রাম তৃষ্ণা পরাজিত মন,
নিয়ে গর্ব্ব, সুখ, লাজ,
করে অভিষেক আজ
তোমারে নূতন করে চির পুরাতন !

শ্রীনীহারিকা দেবী

পুস্তক পরিচয়

Nirvana—জি, সি ঘোষ প্রণীত নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় একটি বৃহৎ ইংরাজী কবিতা। ভাষা ও ভাব অতি সুললিত। মূল্য এক টাকা।

শ্রুতি-স্মৃতি—পলাশী যুদ্ধকাল হইতে বাঙ্গলা দেশে যে সকল মহাত্মারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রথম ভাগ—৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন বিরচিত। মূল্য এক টাকা।

কালীকৃষ্ণ কথা—শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সুপরিচিত ভক্ত শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্যতম পুত্রের মৃত্যুতে হস্ত লিখিত "সংঘ" পত্রিকায় (সপ্তম-বর্ষ) কালীকৃষ্ণ-স্মৃতি-সংখ্যা বর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত।

গোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দাশ মজুমদার প্রণীত—নিম্ন জাতির অভ্যুত্থান ও সার্ব্বজনীন হিন্দু মন্দির সম্বন্ধীয়

সামাজিক উপন্যাস। এ সময় এ রকম উপন্যাস খুব দরকার। মূল্য আট আনা।

আমার মা—নববিধান আশ্রম হইতে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবের নিবেদন আমরা পেয়েছি।

সংঘ-বার্ত্তা

প্রচার বিভাগ

১৯২৮ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে ভারত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের কর্ম্মিগণ যে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো 'হিন্দুটেম্পলে' নিয়মিতরূপে গীতা ক্লাস ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লা-ক্রীসেণ্টার প্রচার কার্য্যের মধ্যেই স্বামী পরমানন্দ প্যাসাডেনায় (লস্‌এঞ্জেলস্) একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। বৎসরের প্রারম্ভে সামফনি-হলে তিনি তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে—তাঁহাব ভারতাগমনকালে সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, পেনাঙ্গ ও রেঙ্গুনে তিনি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সিঙ্গাপুরে বারটি এবং রেঙ্গুনে একদিনেই তিনটি বক্তৃতা তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল।

স্বামী প্রভবানন্দ আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেণ্টলুই নামক স্থানে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে তিনি কতকগুলি বক্তৃতা ও ক্লাস করিয়াছিলেন।

নিউইয়র্কে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের সাহায্যে স্বামী বোধানন্দ প্রতি রবিবার প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার উপাসনা ক্লাস করেন। মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বক্তৃতা করা ছাড়াও প্রতি শুক্রবার তাঁহারা নিয়মিতরূপে সংস্কৃত ক্লাস করিতেছেন।

আমেরিকায় রোড দ্বীপে স্বামী অখিলানন্দ একটি নূতন কেন্দ্র খুলিয়া তথায় প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরে স্বামী আত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বর্ত্তমানে তত্রস্থ মিশন-গৃহে প্রতি রবিবারে সান্ধ্যসমিতিতে তিনি বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

সিংহলে স্বামী বিপুলানন্দ ও স্বামী অবিনাশানন্দ সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনার দ্বারা সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে আগষ্ট স্বামী নিখিলানন্দ কালিকাতা ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন ও বিগত শতাব্দীর ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কলিকাতা ও সহরতলীতে স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী বিজয়ানন্দ ও স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ বিভিন্ন স্থানে নিয়মিতরূপে সপ্তাহে প্রত্যেকে চার পাঁচটি স্থানে, শ্রীমদ্ভাগবৎ, উপনিষৎ, গীতা, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যাপন করিতেছেন। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ বঙ্গদেশের বহু স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-প্রচারে প্রয়োজনানুযায়ী প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বালিয়াটি শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি সেবক-সভার অধিবেশন হয়। তথায় শিক্ষা, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (বরিশাল) "ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ" শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থলাভিসিক্তকে যথাক্রমে একটি পদক ও কতিপয় পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

ফ্রান্সের "ইউরোপ" নামক মাসিক পত্রিকায় সুবিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক মাসিয়ে রোমাঁরোলা লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন চরিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (বৃন্দাবন) ১৯২৭ খৃঃ কার্য্যতালিকা আমরা পাইলাম। আলোচ্যবর্ষে ১৯৫৮৬ পুরাতন ও ৮৪১০ নূতন, মোট ২৭৯৯৬ জন বাহিরে এবং ২৬৯ জন রোগী ভিতরে থাকিয়া সেবাশ্রমের কর্ম্মিবৃন্দের দ্বারা চিকিৎসালাভ করিয়াছেন। ভিতরের রোগীদিগের মধ্যে ২২২ আরোগ্য লাভ ও ৩৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছেন। অবশিষ্ট ৫ জন চলিয়া গিয়াছেন ও ৮ জন চিকিৎসাধীন আছেন। মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে বেশীর ভাগ লোকমুখে সংবাদ পাইয়া আশ্রমস্থ কর্ম্মিবৃন্দের দ্বারা শেষ অবস্থায় কুড়াইয়া আনা। প্রারম্ভ ১৯০৭ খৃঃ হইতে ১৯২৭ খৃঃ পর্য্যন্ত আশ্রমের রোগী সংখ্যা মোট ৫০১৩৬৯। আশ্রম অন্যান্য প্রকারেও দুঃস্থ লোকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে আয় চাঁদা প্রভৃতি সংগ্রহ মোট ৪৫০৬৮৶১৫, গতবর্ষের তহবিল ৪৬৯/১৫, গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে দান ২১০০৲ এবং স্থায়ী তহবিল ২৬৫০০৲ একুনে ৩৩৫৭৬/১০ ব্যয় রোগীদের পথ্যাদি প্রভৃতি সাধারণ খরচ বাবদ ৩৪৫০॥১৫, গৃহ নির্ম্মাণ ১২৪২৮/১৫, বক্রী জমা গৃহ নির্ম্মাণ খাতে ৮৫৭৶১৫, সাধারণ তহবিল ১৫২৫॥১৫ এবং স্থায়ী তহবিলে ২৬৫০০৲ মোট ৩৩৫৭৬/১০। আশ্রমের বর্ত্তমান অভাব—রোগীদিগের জন্য ঔষধ বিতরণালয় নির্ম্মাণ ন্যূন কল্পে—১০০,০০০৲, সাধারণ রুগ্নাগার নির্ম্মাণ ৭,০০০৲, দুইটি পৃথক সংক্রামক রুগ্নাগার নির্ম্মাণ ৮,০০০৲, অতিথিশালা নির্ম্মাণ ৬,০০০৲ এবং ১৯২৪ খৃঃ বন্যায় বিনষ্ট আশ্রম সংলগ্ন যমুনার বাঁধ ও তদুপরি একটি পাকা বেষ্টনী প্রাচীর আশ্রম রক্ষা কল্পে পুনর্নির্ম্মাণ ১০,০০০৲। এই আশ্রম যাহাতে ইহার আরব্ধ লোকহিতকর বহু সদনুষ্ঠানগুলি নিয়মিত রূপে পরিচালন করিতে সক্ষম হন তজ্জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট ইহার অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য আমরা অনুরোধ করি।

বিগত ৺বিজয়া দশমীর দিন বাঁটরা অনাথ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা নিষ্কামকর্ম্মী শ্রীনিতাইচন্দ্র মিত্র এবং বিগত ১৬ই নবেম্বর ভবানীপুর 'গদাধর আশ্রম' বাটীর দাতা ও তপস্বী শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেহ রক্ষা করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের বাঁকুড়া ও বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষ কার্য্য শেষ হইয়াছে।

আগামী ১৮ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী বুধবার শুভা কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি পূজোৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-ভক্তেরা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে এবং পুরুষ-ভক্তেরা বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র

(দুই খণ্ড) প্রতিখণ্ডের মূল্য ৸৵০ আনা

এই পত্রগুলি একদিকে যেমন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও উদ্দীপনাময় অপরদিকে তেমনি ভক্তি, বিশ্বাস ও কোমলতাপূর্ণ। ইহা পাঠে দুর্ব্বলে বলের এবং নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া জীবন মধুময় করিয়া তুলিবে। কর্ম্মী, তত্ত্বান্বেষী, সাধক, সেবাব্রতী— সকলেই চিঠিগুলি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ, সাধকভাব,
পূর্ব্বকথা ও বাল্য-জীবন এবং দিব্যভাব
ও নরেন্দ্রনাথ।

স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত

১ম খণ্ড (গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ) মূল্য ১৷৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶৹। ২য় খণ্ড গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ ১৷৹ ; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹। ৩য় খণ্ড, সাধকভাব ১৷৹, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৶৹। চতুর্থ খণ্ড, পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন মূল্য ১৵৹, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১৲। ৫ম খণ্ড দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ ১৷৵৹, উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে ১৷৹।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে উদার সার্ব্বজনীন আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

নূতন সংস্করণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরিতামৃত

৩য় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত (উৎকৃষ্ট বাঁধাই)

সংসারের শোক তাপের পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি সুধাস্বরূপ। এই গ্রন্থে সরল, ওজস্বী, সুললিত পয়ার-ছন্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য চরিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় এই গ্রন্থও বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার উপভোগ ও শিক্ষাপ্রদ। মূল্য ৪৲ টাকা, গ্রাহকপক্ষে ৩৸৹ আনা।

বিবেকানন্দ চরিত—পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। আনন্দবাজার পত্রিকার লব্ধ প্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৷৹ টাকা মাত্র। পুস্তকখানি সাহিত্য-

REGISTERED NO............C295.

এলিফেণ্ট

ভারজিনিয়া সিগারেটের ধূম
পান করুন।

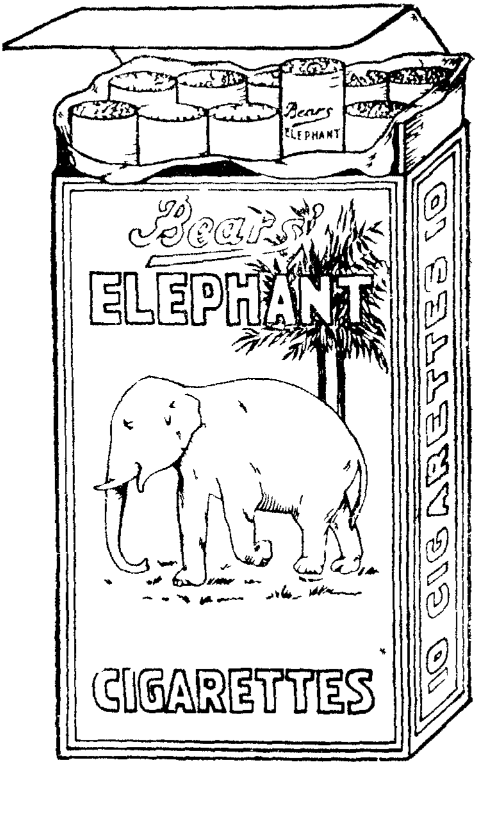

Printed by MANMATHA NATH DASS,
SRI GOURANGA PRESS, 71/1, Mirzapur Street, Calcutta
Published by BRAHMACHARI KAPILA,